ইন্দিরা দেবী

শোভনা দেবী

সুষমা দেবী

ভূমিকা

ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের নিয়ে এখনও অনেক কৌতূহল আমাদের মনে জমে
াছে। বাংলার নারীজাগরণের কথা ভালোভাবে জানতে গিয়ে দেখলুম
ধিকাংশক্ষেত্রেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। একক
সম্মিলিত উভয়ভাবেই তাঁরা এসেছেন অন্ধকার ঘরে হঠাৎ প্রদীপ জ্বেলে
ার মতো। পুরনো কাগজপত্র নেড়েচেড়ে দেখা যাচ্ছে, ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের
ন্ধে এখনও অনেক কিছুই আমরা জানি না, অথচ ছড়ানো-ছিটোনো হলেও
থ্যের অভাব নেই। তাই এখানে বাংলার সংস্কৃতি জগতে তাঁদের যথার্থ ভূমিকা
র্ণয় করার একটা প্রাথমিক চেষ্টা করা হলো।

আলোচ্য বিষয়টি গুরুগম্ভীর ও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও আমরা কিছুটা গল্প
ার চেষ্টা করেছি যাতে সব ধরণের পাঠকই তা উপভোগ করতে পারেন।
খাটি প্রথমে সংক্ষিপ্ত আকারে বার্ষিক সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত
তখন অনেকের আগ্রহ ও অভিনন্দনে উৎসাহিত হয়ে বিষয়টিকে আরো
াজ করার ইচ্ছে জাগে। বর্তমান গ্রন্থ তারই ফসল।

এই গ্রন্থ পরিকল্পনার কথা সর্বপ্রথম শ্রীরমাপদ চৌধুরীকে জানালে তিনি
ামাকে উৎসাহিত করে ব্যাপক অনুসন্ধানের নির্দেশ দান করেন। তাঁর আগ্রহ,
ক্রিয় সাহায্য ও প্রয়োজনীয় উপদেশ না পেলে কোনদিনই এ গ্রন্থ লেখা সম্ভব
:তা না।

কাজে নেমে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি, যাঁদের নিয়ে লিখছি তাঁদের
বং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে। গ্রন্থের শেষে তাঁদের নাম উল্লেখ
রেছি বলে এখানে আর পুনরুক্তি করা হলো না। তাঁদের কাছে আমার
তজ্ঞতার শেষ নেই। তাঁরা এত অকৃপণভাবে সাহায্য না করলে বাংলার
রীজাগরণের এই ইতিহাস অলিখিত থেকে যেত। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে

সুদক্ষিণা দেবী

হিরন্ময়ী দেবী

সুশীলা দেবী (চট্টোপাধ্যায়)

সুপ্রভা দেবী

অবস্থিত প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র ব্যবহার করবার অনুমতি দান করেছেন উপাচার্য সুরজিৎ সিংহ মহাশয়। বহু মূল্যবান সাহায্য ও উপদেশ পেয়েছি শ্রীকল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল, ডঃ অরুণ বসু, শ্রীসুভাষ চৌধুরী, শ্রীসময় ভৌমিক, শ্রীপান্থ ও শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। এঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার চেষ্টা করেছেন শ্রীবিপুল গুহ, শ্রীসঞ্জয় ও আরো অনেকে। তাঁদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও যে গ্রন্থটিতে কিছু ত্রুটি গেল তার জন্যে আমিই দায়ী, কারণ কোনদিনই আমি ভালো প্রুফ পাঠি নই। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তথ্য ও মুদ্রণ প্রমাদের কথা এখানে জানিয়ে রাখি। ৪৮ পৃষ্ঠার 'medioticrity' হবে 'mediocrity'। ৯৯ পৃষ্ঠা 'প্রস্ফুরমিব' ও 'ত্বমীশ্বরানাং' হবে 'প্রস্ফুরন্নিব' ও 'ত্বমীশ্বরাণাং'। ১২৭ পৃষ্ঠা লালবিহারী দে-র পরিবর্তে হবে 'রেভারেণ্ড লঙ'। ১৩১ পৃষ্ঠায় 'বেঙ্গল কো টেল্‌স্' হবে 'বেঙ্গল ফেয়ারি টেল্‌স্'। ১৩৭ পৃষ্ঠায় কল্পনা দত্ত হয়ে গেছেন কল্পনা দাস। ১৪০ পৃষ্ঠায় হয়েছে 'or woman' হবে 'on woman'. ১৫২ পৃষ্ঠা সরলা দেবীর লেখা প্রথম প্রবন্ধটির নাম 'পিতামাতার প্রতি কি ব্যবহার ক কর্তব্য'। ২০৫ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে দ্বারিকানাথ হবে দ্বারকানাথ। ২১৩ পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছে 'দুই বোন' হবে 'তিন বোন'। ২১৮ পৃষ্ঠায় 'কুলদাপ্রসাদ সেনে' পরিবর্তে হবে 'কুলপ্রসাদ সেন'। ২২২ পৃষ্ঠায় ২৪ পংক্তিতে হবে "goes on step farther. The world"। ২৩৬ পৃষ্ঠায় 'গাড চিলের ডানা'র লেখকে নাম শচীনন্দন বয়া।

গ্রন্থশেষে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির একটি বংশলতিকা দেওয়া হয়েছে দীর্ঘ ও বিস্তৃত বংশলতিকা নির্মাণে সক্রিয় সাহায্য করেছেন ঠাকুরবাড়ির সকলেই বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছি শ্রীকল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে যথাসম্ভব চেষ্টা সত্ত্বেও সমস্ত নাম সংগ্রহ করতে না পারায় বর্তমান সংস্করণে কি কিছু অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল। আশা রাখি, পরবর্তীকালে সেই ত্রুটি সংশো করে নেওয়া সম্ভব হবে।

সরলা দেবী

ভোরের আলো আকাশের সীমা ছাড়িয়ে সবে নেমে এসে পড়েছে বাড়ির ছাদে, অন্ধকারের আবছা ওড়নাটা তখনও একেবারে সরে যায়নি, এমন সময় শিশিরভেজা ঘাস মাড়িয়ে রুক্ষ পথের বুকে এসে নামে দুটো আরবী ঘোড়া। সদর ছাড়িয়ে জোর কদমে এগিয়ে চলে গড়ের মাঠের দিকে। দারোয়ান কাজ ভুলে যায়। প্রতিবেশীরা হতভম্ব। রাজপথের লোকেরা অবাক। এ কী কাণ্ড? বিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে তাকালে একে অপরের দিকে। সবাই চেয়ে আছে। কিন্তু সেদিকে তাকাবার সময় কই আরোহীদের। না, ভুল বলা হলো বুঝি। দুজন আরোহী কোথায়? একজন যে আরোহিনী! আরোহিনী? চোখের ভুল নয়তো? কলকাতার রাস্তায় ঘোড়ায় চড়া মেয়ে? তাও মেমসাহেব নয়, বাঙালী। পথিকরা থমকে দাঁড়ায়। চোখ কপালে ওঠে পড়শিনীর। না, আর কোন ভুল নেই। ঐ তো আঁটসাঁট পোষাকে দৃপ্ত ভঙ্গীতে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন কাদম্বরী, ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে চলেছেন স্বামীর সঙ্গে ময়দানের দিকে।

আজও মনে হয়, যেন গল্প শুনছি। তবু গল্প নয়, একেবারে সত্যি ঘটনা। চার দেওয়ালের গণ্ডি ছাড়িয়ে সব কিছুতে বড়ো হয়ে ওঠা এক আশ্চর্য মায়াপুরীর কথা। বড়োবাজারের কর্কশ হৈ হট্টগোলের মাঝখানে প্রায় হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট একটা গলির শেষে যে সেকেলে মস্ত বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, বাইরে থেকে তাকে বিশেষত্বহীন মনে হলেও বাংলার নবযুগের গোড়াপত্তন হয়েছিল এই ঠাকুরবাড়িতেই। ঝিমিয়ে পড়া সমাজের বুকে একটার পর একটা আঘাত হেনে যাঁরা তার জড়তা ঘোচাতে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের অনেকেরই স্থায়ী ঠিকানা ছিল সেদিনকার জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ি। পুরনো দিনের দু-চারটে পুঁথি-পত্র, পাঁচালী কবিগান আর বিকৃত বাবুকালচারের সংকীর্ণ খাতে দেশের শিল্প সাহিত্য যখন কোনরকমে নিজেদের টিঁকিয়ে রেখে চলছে সেই সময়কার কথা। পশ্চিম

বিনয়িনী দেবী

মাধুরীলতা দেবী

রেণুকা দেবী

মীরা দেবী

দিগন্তের একটুখানি আলো এসে পড়লো পুবের আকাশে। সেই নবজাগরণ। লজ্জার মতো গোলাপী আভাটাই শেষে আগুন হয়ে উঠলো একদিন। তার আকস্মিক উত্তেজনায় যখন অনেকে দিগভ্রান্ত, কেউ-বা পথচ্যুত কিংবা বিদ্রোহী তখন প্রথম উষার সবটুকু লালিমা নিজের গায়ে মেখে এই ঠাকুরবাড়িই সারা দেশের ঘুম ভাঙাবার ভার নিয়েছিল। তারই সামান্যতম নজির ওপরের ঐ গল্পের মতো ঘটনাটা।

কাগজপত্রের খুঁটিনাটি বিবরণের মধ্যে না গিয়ে রেনেসাঁসের সমসাময়িক ঘটনাগুলোর ওপর হালকা নজর বুলিয়ে নিলে দেখা যাবে তখনও তেমন কোন সমবেত চেষ্টা শুরু হয়নি। সর্বত্র শুধু তামসী রাতের গাঢ় ছায়া। তারই মধ্যে এখানে সেখানে দু-একটি প্রদীপ সবে জ্বলেছে, কোথাও বা সলতে পাকাবার আয়োজন চলছে। কিন্তু একটার সঙ্গে আরেকটার মধ্যে কোন যোগ নেই। নবজাগরণের পটভূমি থেকে ঠাকুরবাড়িকে সরিয়ে নিলে এই হবে সেকালের বাংলাদেশের খাঁটি ছবি। এইরকম দু একটা প্রদীপের আলো সম্বল করে আমাদের জীবনে নব্য রেনেসাঁস কি আজকের রূপ নিয়ে আসতো, না চৈতন্য রেনেসাঁসের মতো স্মৃতি হয়ে থাকতো কে জানে? সেইসব দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে মাথাব্যথা করে লাভ নেই। আমরা শুধু বলতে চাই যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবসংঘাতের যুগে ঠাকুরবাড়িতেই প্রথম একটা সহিষ্ণু সমবায়িতার ক্ষেত্র গড়ে ওঠে। তাই সহজেই এবাড়ির প্রতিটি মানুষের কল্পনায় ঢেউ তুলেছে পশ্চিমের সমুদ্র, ভাবনা ছুঁয়েছে হিমালয়ের শিখর। আধুনিক বাংলার সুরুচি ও সৌন্দর্য-বোধের প্রায় সবটাই তো ঠাকুরবাড়ির দান। ছোট্ট একটা প্রশ্ন এসে পড়েই—ঠাকুরবাড়ির এই স্পর্শমণিটি কি রবীন্দ্রনাথ? স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে তাঁর কথা। শুধু ঠাকুরবাড়িকে কেন, সারা বাংলাদেশকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে যিনি একাই যথেষ্ট। তবু একথাও তো সত্যি, ঠাকুরবাড়ি কোনদিনই আর পাঁচটা সাধারণ বাড়ির মতো আটপৌরে ধরণের ছিল না। অনেকদিন, সম্ভবতঃ দ্বারকানাথের আমল থেকেই এ বাড়িতে জীবনযাত্রার নিজস্ব একটা সংস্কার গড়ে উঠেছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কোন অনুভূতি কোন চিন্তাই সেখানে বাধা

সুনয়নী দেবী

পারেনি। তাই একই পরিবারে ব্রহ্মবিদ মহর্ষির সঙ্গে সিভিলিয়ান অফিসারের সহাবস্থান যেমন বেমানান হয়নি তেমনি কবি-সঙ্গীতজ্ঞ-নাট্যকার-শিল্পরসিক-দার্শনিক-চিন্তাবিদের একত্র সমাবেশ সম্ভব হয়েছিল।

এই সোনালি-সফল পর্বে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা আবছা পর্দার আড়ালে অস্পষ্ট আভাস হয়ে থাকেননি। নবযুগের ভিত গড়বার কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। কখনও প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনও পরোক্ষে—পুরুষের প্রতিভার প্রদীপে তেল-সলতে যোগানোর দায়িত্ব নিয়ে। অবশ্য যত সহজে লিখলুম ঘটনাটা তত সহজে ঘটেনি। মনুর বিধান এবং মুসলমানী আবরু রক্ষার তাগিদ অনেকদিন থেকেই মেয়েদের একেবারে ঘরের আসবাবপত্রে পরিণত করেছিল। ঠাকুরবাড়িতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। অন্দরমহলে নিঃসম্পর্কিত পুরুষ প্রবেশ করতেন না, বাইরে বেরোতে হলে মেয়েরা চাপতেন ঘেরাটোপ ঢাকা পালকি। হাতে সোনার কাঁকন, কানে মোটা মাকড়ি, গায়ে লাল রঙের হাতকাটা মেরজাই-পরা বেহারার দল কাঁধে করে নিয়ে যেত। সঙ্গে সঙ্গে ছুটতো দারোয়ান, হাতে লাঠি নিয়ে। ঘেরাটোপের রঙ দেখে শুধু বোঝা যেত কোন্ বাড়ির পালকি যাচ্ছে। জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ির পালকির ঘেরাটোপ ছিল টকটকে লাল আর পাড়টা গাঢ় হলুদ। পাথুরেঘাটা-ঠাকুরবাড়িরটা ঘোর নীল আর ধবধবে সাদা পাড়। আর পাঁচটা বনেদি বাড়িরও এরকম পালকি ছিল।

যাক সে কথা, মেয়েরা পালকি তো চাপতেন কিন্তু যেতেন কোথায়? কালে-ভদ্রে গঙ্গা স্নানে যাবার অনুমতি পেলে বেহারারা তো একেবারে পালকিশুদ্ধু জলে চুবিয়ে আনত। এটাই ছিল সেকেলে দস্তুর। এছাড়া তাঁরা মাঝে মাঝে যেতেন আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়িতে বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন-শ্রাদ্ধের মতো সামাজিক অনুষ্ঠানে। তখন পালকি একেবারে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতো। জোড়াসাঁকোর পাঁচ নম্বর এবং ছ নম্বর বাড়ির মধ্যে দূরত্ব আর কতটুকু, তবু সেখানেও এবাড়ি-ওবাড়ি যেতে হলে মেয়েদের পালকি চাপতে হতো। সুতরাং অসংখ্য বাধা-নিষেধের গণ্ডি পার হয়েই মেয়েদের এমনকি ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছিল। সহজে হয়নি। প্রথমদিকে এ বাড়ির মেয়ে এবং বৌয়েদের

সুশীলা দেবী

সাহানা দেবী

সংজ্ঞা দেবী

কমলা দেবী

আকারের আন্দোলন তুলে বাঙালী মেয়েদের লজ্জাভীরু মনে সাহস জোগাবা
জন্যেও এর দরকার ছিল। শুধু তাই নয় কিশোর রবীন্দ্রনাথের জন্যে বাড়ির মধে
একটা সাহিত্যিক আবহাওয়া গড়ে তুলতেও তাঁর দিদি-বৌদিদিরা দাদাদের চে:
কোন অংশে কম সাহায্য করেননি। আবার পরিণত বয়সে নৃত্য-গীত-অভিনয়-
সংক্রান্ত নিজস্ব ভাবনাকে রূপায়িত করবার সময়েও তিনি বারবার ডাক দিয়েছে
বাড়ির মেয়েদের। শুধু এই জন্যেও ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের, কখনো কখনো সামা
ভূমিকা থাকলেও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে একটা আশ্চর্য ঘটনা চোে
পড়ে, প্রায় কাকতালীয়ের মতোই ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের পূর্ণ আত্মবিকাশে
ক্ষেত্রটা যেন সমস্ত রবীন্দ্রজীবনের সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেছে ; অথচ রবীন্দ্রনাথ সর্ব
প্রাধান্য বিস্তার করেছেন তা নয়। স্বর্ণকুমারী-জ্ঞানদানন্দিনীর অভ্যুত্থান পবে
রবীন্দ্রনাথ কিশোর আর এখনও যাঁরা জরাকম্পিত হাতে নিবু-নিবু ঐতিহ্য প্রদীপে
শিখাটিকে জ্বেলে রেখেছেন তাঁরা পেয়েছেন অস্ত-রবির শেষ আশীর্বাদ !

একটু আগেই বলেছি যে, ঠাকুরবাড়িতে সমাজের প্রত্যক্ষ বাধা খুব বেশি
ছিল না। কিন্তু কি সেই বাধা, যা এবাড়ির মেয়েদের অচল করে তোলেনি
সেকালে মেয়েদের জীবন কেমন করেই-বা কাটতো ? তখনকার দিনে মেয়েদে
জীবন বিশেষ সুখে কাটতো না। কয়েকশো বছরের 'পুঁথিপ্রমাণ' আর দলিল
দস্তাবেজের বস্তাপচা পুরনো সাক্ষীসাবুদ জড়ো না করেও এটুকু বুঝতে অসুবিধে
হয় না যে, আমাদের সমাজে নারীসম্পর্কিত মূল্যবোধের প্রচণ্ড অবনতি হয়েছিল
পুরুষের কাছে সেদিন নারী ছিল জীবন্ত সম্পত্তি, শুধু ভাত-কাপড় দিয়ে পোষ
বিনা মাইনের দাসীমাত্র। ইচ্ছের হাড়িকাঠে তাদের যতবার খুশি বলি দেওয়া
চলতো। সমাজের সমস্ত নিয়ম-শৃংখলা নারীর অঙ্গে পাকে পাকে জড়ানে
শৃংখল হয়ে উঠেছিল খুব সহজে, কারণ সকল অনর্থের মূল অর্থ এবং অর্থোপার্জনের
যাবতীয় উপায় ছিল পুরুষের হাতে। পিতার ধনে বা পতির ধনেও নারী
অধিকার স্বীকৃত হয়নি। মেয়েদের এই নিরুপায়তার সুযোগ নিয়েই পুরুষের
অধিকারের নামে অবাধে স্বেচ্ছাচার করে গেছেন। তাই দেখা যাবে উনিশ শতকে
সমাজ-সংস্কারের প্রধান কথাই ছিল নারীমুক্তি—আধুনিক অর্থে নয়, তখন নারী-

হেমলতা দেবী

শিক্ষা, নারীর অধিকার এবং নারী প্রগতির দিকেই মনীষীদের দৃষ্টি পড়েছিল।

আসলে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, অসমবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি গোটা কতক বড়ো বড়ো সামাজিক অত্যাচার ছাড়াও ছোটখাটো অগুণ্তি বাধা মেয়েদের পায়ে বেড়ির মতো চেপে বসেছিল। তার মধ্যে লেখাপড়া শেখা, জামা জুতো পরা, বাইরে বেরোনো, গান গাওয়া, গাড়ি চড়া, অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে কথা বলা সবই পড়ে। আজ মনে হয় মেয়েরা তাহলে সারাদিন কি করতো? ঘর সংসার? সে তো এখনও করে। তবে? 'খাওয়ার পরে রাঁধা আর রাঁধার পরে খাওয়া' নিয়েই কি জীবন কেটে যেত? বইয়ের পাতায় উদাহরণ খুঁজলে দেখা যাবে নিখাদ-নিনাদে একটা কথাই বাজছে 'না-না-না'। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের সরলতা বলেছিল, "রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই" কেননা পাঁচজন সঙ্গিনী নিয়ে বাগানে যাওয়া, শহরে বেড়াতে যাওয়া মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের জন্যে কলেজ নেই, কাছারি নেই, সভাসমিতি নেই, ব্রাহ্মসমাজ নেই—বলতে গেলে কিছুই নেই। একেবারে 'নেই' রাজ্যের বাসিন্দাদের দিনগুলো কাটতো কেমন করে? খুব যে কষ্ট হতো তা নয়, সয়ে গিয়েছিল সবই। হঠাৎ ঠাকুরবাড়ি থেকে বয়ে আসা এক ঝলক সঞ্জীবনী হাওয়া এসে তাদের দুলিয়ে না দিলে হয়ত আরো অনেকদিন এমনি করেই কাটতো, শুধু অবকাশ পেলে মাঝে মাঝে গুমরে উঠতো ফাঁকা মন।

তবু খুব নিশ্চিত হতে না পারলেও মনে হয় মেয়েরা সর্বত্র সমানভাবে নিশ্চেষ্ট জীবন যাপন করছিল না; তা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়, হলে একটিমাত্র বাড়ির মেয়েদের প্রভাবে সার্বিক জাগরণ কিছুতেই সম্ভব হতো না। সলতে পাকাবার আয়োজন চলছিলই, ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা এনে দিলেন নবজাগরণের প্রদীপশিখাটিকে। একটু আগে যে অগুণ্তি বাধার কথা বললুম তার অনেক-গুলোই ঠাকুরবাড়িতে মেনে চলা হতো, তবে লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে এ বাড়ির কর্তাব্যক্তিরা প্রথম থেকেই উদার ছিলেন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় তাঁরা বাধা তো দেনইনি বরং উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তার সুফল পাওয়া গেল অচিরেই। এ বাড়ির পুরুষদের মতো মেয়েরাও বাংলা-

প্রতিমা দেবী

দেশের সমস্ত মেয়ের কাছে আদর্শ হয়ে রইলেন চিবকালের জন্যে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পূর্বকথা আজ আর কারুর অজানা নেই রূপকথার মায়াপুরীর মতো রহস্যঘেরা বাড়িটি তো বহুদিন ধরেই সমস্ত বাঙালীর কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। পাঁজি-পুঁথি খুলে হয়তো আজ অনেকেই বলে দিতে পারবেন, সেই কবে পুরুষোত্তমের বংশধর পঞ্চানন এসেছিলেন কলকাতায় ভাগ্য ফেরাতে কিংবা তাঁব নাতি নীলমণি কোন্ শুভক্ষণে কলকাতার একপ্রান্তে বসবাস শুরু করলেন। আমাদের প্রধান লক্ষ্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ি। গৃহবিবাদ আর মন কষাকষির ফলে মূল কুশারী বা ঠাকুর পরিবার ক্রমেই নানা শরিকে ভাগ হযে যেতে শুরু করেছিল বেশ কিছুদিন ধরে। পাকা-পোক্তভাবে পৈত্রিক বাড়ি ছেড়ে ১৭৮৪ সালের জুন মাস নাগাদ নীলমণি সপরিবারে চলে আসেন জোড়াসাঁকোতে। তখন এ অঞ্চল মেছুয়াবাজার নামে পরিচিত। নীলমণির ভাই দর্পনাবায়ণ থেকে গেলেন পাথুরেঘাটার সাবেকী বাড়িতেই। অবশ্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে আরো কয়েক বছর পরে, প্রিন্স দ্বারকানাথের আমলে। ঠাকুরবাড়ির ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তি-আড়ম্বর-শিল্পরুচি সব কিছুর মূলেই তিনি। অপরিমিত ধন সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন পুব-পশ্চিমের মিলন ঘটাতে; সফল হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, না হলে অন্য ধনীদের সম্বন্ধে যেমন বলবার কিছু থাকে না তাঁর সম্বন্ধেও সেইরকম কিছু বলার থাকতো না। কিন্তু তাঁর কথা থাক আমরা অন্দর মহলের কথায় ফিরে আসি।

সেযুগে ঠাকুরবাড়ির মতো ধনী এবং অভিজাত বাড়ি বা পরিবার আরো অনেক ছিল। খুব কম করেও আমরা আরো ত্রিশটি পরিবারের উল্লেখ করতে পারি যাঁরা ধনে-মানে ঠাকুরবংশের চেয়ে কোন অংশে হীন তো ছিলেনই না বরং আরো খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এইসব পরিবারও নানাভাবে শিল্পরুচি কিংবা প্রতিপত্তির পরিচয় দিয়েছেন। তবু এতগুলি বাড়ির মধ্যে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের বেছে নেবার প্রধান কারণ প্রথম পর্বে এই বাড়িই ছিল

নন্দিতা দেবী

বার পুরোবর্তিনী। অবশ্য পাথুরেঘাটার মেয়ে-বৌরাও যে ছিলেন না তা নয় কিন্তু তাঁরা স্থায়ী প্রভাব রেখে যেতে পারেননি।

ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী ও জ্ঞানদানন্দিনীর নাম সকলেই জানে। তবু ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকে, তাই তাঁদের পিতামহী দিগম্বরীকেও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। সূর্যোদয়ের অনেক আগে যেমন উষার আলো ফুটে ওঠে, দিগম্বরীর ধর্মনিষ্ঠা এবং নির্ভীক তেজস্বিতার মধ্যেও তেমনি ঠাকুরবাড়ির নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার ছাপটুকু চোখে পড়ে। যে যুগে মেয়েদের 'স্বামী বই গতি' ছিল না সেই সময়ে দিগম্বরী কুলধর্মত্যাগী স্বামীকে ত্যাগ করা উচিত কি উচিত নয় জানতে চেয়েছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের কাছে। সেই পুরুষশাসিত সমাজে তাঁর একক প্রতিবাদ—তবু তিনি নিন্দায় জর্জরিত হননি। বরং হিন্দু সমাজ তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিল।

কিন্তু তিনিই-বা হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞদের কাছে এমন একটা বিধান জানতে চেয়েছিলেন কেন? তিনি কি মুক্তি চেয়েছিলেন সাত-পাকে-বাঁধা বিবাহ বন্ধন থেকে, না, স্বামীর অবহেলা তাঁর তীব্র অভিমানকে বড়ো বেশি আঘাত করেছিল? এই 'কেন'র উত্তর খুঁজতে হলে বাস্তবে-অবাস্তবে মেশা দিগম্বরীর অলৌকিক জীবনের কথা জানতে হয়।

লোকে বলে, অপরূপ লাবণ্যময়ী দিগম্বরী এসেছিলেন ঠাকুরবাড়ির লক্ষ্মীশ্রী হয়ে। যশোরের নরেন্দ্রপুরে তাঁর জন্ম। মাত্র ছ বছর বয়সে দ্বারকানাথের ধর্মপত্নী হয়ে তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে পা দিলে ঠাকুরবাড়ির শ্রীবৃদ্ধি হতে শুরু করে। দিগম্বরীর রূপ এখন প্রবাদে পরিণত হয়েছে। বোধহয় তখন থেকেই ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের রূপের খ্যাতি। শোনা যায়, দিগম্বরীর মুখের আদলেই ঠাকুরবাড়িতে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গড়া হতো। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁকে বলতেন "সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী"। বলবে নাই বা কেন? দুধে-আলতা মেশা গায়ের উজ্জ্বল রঙ, পিঠে একঢাল কোঁকড়া কালো চুল, চাঁপাকলির মতো হাতের আঙুল, দেবী প্রতিমার পায়ের মতো দুখানি পা—মৃত্যুর পরে তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় অনেকে তাঁর পা দুটি থেকে এক অপূর্ব জ্যোতি বেরোতে দেখেছিল। অতুলনীয়

মঞ্জুশ্রী দেবী

জয়শ্রী দেবী

রমা দেবী

চিত্রা দেবী

রূপের সঙ্গে দিগম্বরীর ছিল প্রচণ্ড তেজ। শাশুড়ী অলকাসুন্দরীও এই ব্যক্তিত্বময়ী বৌটিকে সমীহ করে চলতেন।

আর দ্বারকানাথ?

স্ত্রীকে তিনি সত্যিই ভালোবাসতেন। কিন্তু এ তো গল্প। গল্পই তো। গল্পই তো জীবন। তারই টানাপোড়েনে বোনা হয়েছে অন্দরমহলের বালুচরী আঁচলার নক্সা, গৌরবময় নারীজাগরণের ইতিহাস।

তখনকার দিনে এঁরা ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব। পাথুরেঘাটার ঠাকুররা ব্যঙ্গ করে বলতেন 'মেছুয়াবাজারের গোঁড়া'। পেঁয়াজ ঢুকতো না বাড়িতে। মাছ মাংসের তো কথাই নেই। পাছে কুটনো-কোটা বললে হিংস্র মনোভাব জেগে ওঠে তাই বলা হতো 'তরকারি বানানো'। গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের নিত্যসেবা নিজের হাতে করতেন দ্বারকানাথ। পূজোর উপকরণ হয়ত যুগিয়ে দিতেন দিগম্বরী। নীলাম্বরী শাড়ির আঁচল-ঘেরা দুধে-আলতা মেশা সুন্দর মুখে ভক্তির আবেশ মাখা—যে দেখত শ্রদ্ধায় আপনিই নুইয়ে পড়তো। না, সেদিন কোথাও বিরোধের কালো মেঘ বাষ্প হয়েও দেখা দেয়নি।

হঠাৎ ঝড় উঠলো, কেঁপে উঠলো যুগলের সংসার। ফাটল ধরলো সনাতন হিঁদুয়ানীর ভিতে। মালক্ষ্মীর পদ্মের অনেকগুলো পাপড়ি উড়ে এসে পড়লো দ্বারকানাথের ঘরে। আর ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতা ও বাবুয়ানীর ছদ্মবেশ পরে নবযুগের ভাবনা বাসা বাঁধলো দ্বারকানাথের মনে। হিন্দু শাস্ত্রে বলা হয়েছে বিধর্মীর সংস্পর্শে এলে দেহ অপবিত্র হয়। সেই নিয়ম অনুযায়ী দ্বারকানাথ যখন সাহেবসুবোর সঙ্গে মেলামেশা শুরু করলেন তখন থেকে তাঁকে নিজের হাতে পূজো-করা ছাড়তে হলো। নিত্য পূজো ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্মের জন্যে তিনি আঠারোজন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণকে মাইনে দিয়ে সেই কাজে নিযুক্ত করলেন। শুধু তাই নয় তিনি নিজে এর পরে রাজা রামমোহন রায়ের অনুসরণে মাংস এবং 'শেরি' খাওয়া অভ্যেস করলেন। দিগম্বরী ও দ্বারকানাথ বয়ে চললেন ভিন্ন খাতে।

প্রথম প্রথম দ্বারকানাথ বেপরোয়া খুশির প্রমোদে গা ঢেলে দেননি।

সুনন্দিনী দেবী

পূর্ণিমা দেবী (চট্টোপাধ্যায়)

সুজাতা দেবী

মাধবিকা দেবী

দিও তাঁর মনটি ছিল সেযুগের বিলাসী বাবুদের মতোই দিলদরিয়া। সেই সঙ্গে
স শিল্পরুচি। তাঁর বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে ছিল নানারকম প্রমোদের
রাজন। এক প্রহরের আমোদে কত যে ঐশ্বর্য নষ্ট হয়েছে তার সীমা নেই।
জের মনের মতো জীবন যাপন করবার জন্যে এবার বসতবাড়ির লাগোয়া
মিতে বৈঠকখানা বাড়ি তৈরি করে নিলেন দ্বারকানাথ। কী তার কারুকাজ!
ফোয়ারা-রঙীন টালি ঘেরা বাগান-ঝাড়লণ্ঠন-বিলিতি আসবাবে নিজের রুচিমতো
াজালেন। তাঁর নতুন 'গৃহসঞ্চার'-এর কথা ঘটাপটা করে ছাপাও হলো
দিনকার কাগজে। প্রকাণ্ড ভোজ, নাচ-গান, বিলিতি ব্যাণ্ডের সঙ্গে ভাঁড়ের
ংএরও আয়োজন হযেছিল, তার মধ্যে "একজন গোবেশ ধারণ পূর্বক ঘাস
র্ণাদি করিল।' সুতরাং দ্বারকানাথের বিলাসিতায় সেযুগের বাবুয়ানীর ছাপ
রোমাত্রায় বজায় ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

নতুন বাড়িটি তৈরি হয় ১৮২৩ সালে। এসময় দ্বারকানাথ গভর্ণমেন্টের
ওয়ান, পরে আরো উন্নতি হয়। প্রথমদিকে দিগম্বরীর চোখে এত পরিবর্তন
রা পড়েনি। নিজের জপ-তপ ঠাকুরসেবা নিয়ে তিনি সদাব্যস্ত। ভরা
ংসার। বড়ো ছেলে দেবেন্দ্রের সবে বিয়ে হয়েছে। ছেলের বৌ সারদাও
সেছেন যশোর থেকে। ওখানে যে পিরালীবংশের অনেকেই থাকেন। ছ
ছরের মেয়ে সারদা এসেছেন দক্ষিণডিহি থেকে। অন্য দিকে তাকাবার সময়
ই? ভোর চারটে থেকে দিগম্বরীর পূজো শুরু হতো। লক্ষ হরিনামের মালা
প ছাড়াও তিনি নিয়মিতভাবে পড়তেন ভাগবত-রাসপঞ্চাধ্যায়ের বাংলা পুঁথি।

মাঝে মাঝে শোনেন অনেক কথা। অনেকে অনেককিছু বলে। কিছু
ানেন কিছু মনে থাকে না, মালা জপতে জপতে ভুলে যান। মন বলে, এ
বই অহেতুক রটনা। কৃতি পুরুষের গায়ে কালি ছিটোবার সুযোগ কে না
াজে? কিন্তু খুব বেশি দিন নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা সম্ভব হলো না। বাগান-
ড়িতে নয়, বৈঠকখানাতেও পানভোজন হাসিহল্লা চলে নিয়মিত। গুজব
ায়। শেষে সবই শুনলেন দিগম্বরী, শুনলেন দ্বারকনাথের ভোজসভায় মদের
াত বয়ে যাচ্ছে। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি তবু নিঃসংশয় হবার জন্যে দিগম্বরী স্থির

সুরমা দেবী

পারুল দেবী

পূর্ণিমা দেবী

অপর্ণা দেবী

করলেন তিনি স্বয়ং যাবেন সেই ম্লেচ্ছ ভোজসভায়। স্বচক্ষে দেখে আসবেন কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যে। পতিব্রতা দিগম্বরীর এই অতর্কিত অভিযান চিরস্মরণীয়। বিপথগামী স্বামীকে ফেরাবার জন্যে তিনি নিজেই গেলেন, সঙ্গে রইল ভীতা-ত্রস্তা তরুণী সারদা ও আরো কয়েকজন আত্মীয়া। মনে ক্ষীণ আশা যা শুনেছেন তা ভুল। এতদিনের চেনা মানুষ কি এভাবে বদলে যেতে পারে?

অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এসে বৈঠকখানায় প্রবেশ করতে গিয়ে দিগম্বরী কেঁপে উঠেছিলেন কিনা কে জানে। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে কেউ কোন-ভাবে ধরে রাখেনি। চোখের সামনে দেখলেন আলো ঝলমলে ঘরে সাহেব-বিবিদের সঙ্গে একাসনে পানাহারে মত্ত তাঁর স্বামী। এ কি দুঃস্বপ্ন! তাহলে যা শুনেছেন সব সত্যি! বুকটা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। তবু কর্তব্য ভোলেননি। বিপথগামী স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্যে অনেক চেষ্টা অনেক কাকুতি মিনতি করেছিলেন। কর্ণপাত করেননি দ্বারকানাথ।

অন্য মেয়ে হলে এ সময় কি করতেন? হয় কেঁদে-কেঁদে নিঃশেষে হারিয়ে যেতেন, নয়তো থাকতেন আপনমনে। যেমন থাকতো সেকালের অধিকাংশ ধনী গৃহিণীরা। দিগম্বরী এর কোনটাই বেছে নিলেন না। তাঁর কাছে ধর্ম আর কর্তব্য সবার আগে। তাই মনের দুঃখ মনে চেপে তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতামত চেয়ে পাঠালেন। কি করবেন তিনি? স্বামীকে ত্যাগ করে কুলধর্ম বজায় রাখবেন, না স্বামীর সহধর্মিনী হয়ে কুলধর্ম ত্যাগ করবেন? দ্বারকানাথ অবশ্য ধর্মত্যাগী নন কিন্তু ম্লেচ্ছদের সঙ্গে যে একত্রে খানা খায় তার আর ধর্মত্যাগের বাকী কি আছে? পণ্ডিতরা ভালো করেই বিচার করলেন। বহু বিতর্কের পর উত্তর এলো, "স্বামীকে ভক্তি ও তাঁহার সেবা করা অবশ্য কর্তব্য তবে তাঁহার সহিত একত্র সহবাস প্রভৃতি কার্য অকর্তব্য।"

পণ্ডিতদের রায় শুনে দিগম্বরী নিজের কর্তব্য স্থির করে নিলেন। শুধু সেবা ছাড়া আর সব ব্যাপারে তিনি স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। অবশ্য বাইরের কেউ কিছু জানতে পারলো না। দ্বারকানাথ সম্পূর্ণ নির্বিকার।

উমা দেবী

স্বরূপা দেবী

বাণী দেবী

অনুভা দেবী

'বষয়িক ব্যাপারে কিংবা অন্য কারুর প্রয়োজনে দিগম্বরী যখনই স্বামীর সঙ্গে কথা :লতে বাধ্য হতেন তারপরই সাত ঘড়া গঙ্গাজলে স্নান করে নিজেকে শুদ্ধ করে নিতেন। দিনরাতের বিচার ছিল না। দুঃসহ অত্যাচারেব ফলে কয়েকদিনের রবিকাবে নিবে গেল দিগম্বরীর জীবনদীপ। তাঁর জ্যোতির্ময়ী মূর্তিটি শুধু মম্লান হয়ে রইল মহর্ষিপুত্রের আধ্যাত্মিক ধ্যান-স্মৃতিতে। দ্বারকানাথেরও কি :নে পড়েনি তেজস্বিনী দিগম্বরীকে? স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তিনি বারবার অনুভব :রেছেন গৃহলক্ষ্মীর অভাব; তাই তো যেদিন কার-টেগোর কোম্পানীর একটি ল্যবান জাহাজ অকূল সাগরে ডুবে গেল সেদিন দ্বাবকানাথের বুকভাঙ্গা নিঃশ্বাসের সঙ্গে শুধু বেরিয়ে এলো দুটি কথা, "লক্ষ্মী চলিষা গিয়াছেন অলক্ষ্মীকে এখন আটকাইবে কে?"

সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে দিগম্বরী যে সাহস দেখিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর ছেলের বৌয়েদের মধ্যে সেই তেজ দেখা যায়নি। দেবেন্দ্রনাথেব স্ত্রী সাবদাব সমস্ত :াজকর্মই ছিল স্বামীকেন্দ্রিক। বরং গিরীন্দ্রনাথের স্ত্রী যোগমাযাব মধ্যে াশুড়ীর সনাতন ধর্মনিষ্ঠার অনেকটাই লক্ষ্য করা গেছে। দেবেন্দ্রনাথের ছোট াই নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী ত্রিপুবাসুন্দবী, তিনি এসেছিলেন অনেক পরে।

সারদা এবং যোগমায়াব প্রসঙ্গে আবো একটা কথা বলা চলে যে তাঁবা কিছু লখাপড়াও শিখেছিলেন। মনে হয়, তখনও ধনী স্বচ্ছল পরিবারেব মেয়েরা নিয়মিত লেখাপড়া শিখতেন। মাইনে করা বৈষ্ণবী এসে শিশুবোধক, চাণক্য-শ্লাক, রামাযণ-মহাভারত পড়াতো। আর কলাপাতায় চিঠি লেখা মক্সো :রাতো। এ নিয়ম যে শুধু ঠাকুরবাড়িতে ছিল তা নয়, অনেক বাড়িতেই ছিল। ারদা এবং যোগমাযাও পড়তে পারতেন, শুধু তাঁরা নন বাড়ির অন্যান্য মেযেবাও লখাপড়া জানতেন। বই পড়লে বিধবা হবার ভয় কোনদিনই তাঁদের ছিল না। ম্ভবতঃ গ্রামাঞ্চলে এই জাতীয় বিধিনিষেধ চলতো।

সারদা অবসর সময়ে প্রায়ই একটা না একটা বই খুলে বসতেন। রামায়ণ-হাভারত পড়ে শোনাবার জন্যে মাঝে মাঝে ডাক পড়তো ছেলেদের। হাতের

শ্রীমতী দেবী

অমিয়া দেবী

অমিতা দেবী

মেনকা দেবী

কাছে অন্য কোন বই না থাকলে অভিধানখানাই খুলে বসতেন। যোগমায়া
নানারকম বই পড়তেন। মালিনী আসতো বটতলা থেকে ছাপা বইয়ের পসর
নিয়ে। সেখান থেকে বেছে বেছে বই কিনতেন মেয়েরা। নবনারী, লয়লা-মজনু
হাতিমতাই, আরব্য উপন্যাসের গল্প, ল্যাম্বস টেল, পল ভার্জিনিয়ার অনুবাদ—
সবই জোগাড় করেছিলেন যোগমায়া। তাঁর স্বামীর লেখা কাব্যোপন্যা
'কামিনীকুমার'ও থাকতো মালিনীর পসরায়। আর থাকতো মানভঞ্জন, প্রভা
মিলন, কোকিল দূত, অন্নদামঙ্গল, গোলেবকাওলী, বাসবদত্তার মতো কিছু বই
যোগমায়া বেশ ভালো বাংলা জানতেন। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি ছিলে
"আমাদের একপ্রকার শিক্ষয়িত্রী"।

সারদা এবং যোগমায়া দুজনের কথাই জানতে ইচ্ছে করে কিন্তু জানার খু
সুবিধে নেই। ধর্মশীলা বৌ দুটির জীবন বয়েছিল দুটি খাতে। সরলপ্রাণ
কোমলহৃদয়া সারদা মহর্ষি স্বামীর সহধর্মিনী হবারই চেষ্টা করেছিলেন যদি
ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ বা আসক্তি ছিল বলে মনে হয় না। আমর
তাঁকে যে রূপে দেখি সেটি সতী সাধ্বী পতিব্রতার সনাতন রূপ। ব্রহ্মোপাসন
এবং হিন্দুমতে পূজার্চনা কোনটিতেই তাঁর আপত্তি ছিল না।

সত্যি কথা বলতে কি, ঠাকুরবাড়িতে সারদার ছবিটি খুব স্পষ্ট ন
কিন্তু বড়ো স্নিগ্ধ। ভাবতে ভালো লাগে, তিন তলায় পঙ্খের কাজ করা একটি
ঘরে, মেঝেতে কার্পেট পাতা, সেই ঘরে বসে আছেন সারদা বালুচর শাড়ি পরে
ঘরের কোণে জ্বলছে একটি প্রদীপ, সেই আলোয় জ্বলজ্বল করছে সাদা চুলে
মাঝে টকটকে লাল সিঁদুর। কত লোক আসছে যাচ্ছে প্রশংসা করছে তাঁ
জ্ঞানী গুণী ছেলেমেয়েদের, মায়ের লজ্জারুণ মুখে গভীর সুখের আবেশ কি
পাছে কেউ দেখে, দেখে ভাবে গরবিণী তাই ছেলেমেয়েদের প্রশংসা শুনলে
মাথাটি নীচু করে নিচ্ছেন কুণ্ঠাভরে।

যোগমায়ার ছবিটিও কম সুন্দর নয়। তাঁকে আমরা শুধু পুরনো কথা
মধ্য দিয়ে পেয়েছি। তাঁর গায়ের রঙ ছিল সোনার মতো আর "পাশ দিয়ে
চলে গেলে গা দিয়ে যেন পদ্ম গন্ধ ছড়াতো।" দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করা

পরে বাড়িতে লক্ষ্মীজনার্দনের নিত্য পূজা বন্ধ করতে উদ্যত হলে যোগমায়া চাইলেন গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনকে। তাই হলো। যোগমায়া দুই ছেলে ও দুই মেয়েকে নিয়ে উঠে এলেন দ্বারকানাথের বৈঠকখানায়। সেই থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি দুটি বাড়িতে পরিণত হয় ; তবে দুই বাড়ির পুরুষদের মধ্যে মতের অমিল বা মনের অমিল কখনো হয়নি। এই ঘটনার পর দুই পরিবারের মেয়েদের গতিবিধি অবশ্য স্বাভাবিক রইল না, শুধু পালাপার্বনে দেখাসাক্ষাৎ ঘটতো।

যোগমাযাব সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায মহর্ষির ছেলেমেযেরা খুব দুঃখ পেযেছিলেন। বড়ো মেযে সৌদামিনীর দুঃখই যেন বেশি। তিনি স্বামী পুত্রকন্যা নিযে জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই জীবন কাটিয়েছেন। কাকীমা ছিলেন তাঁর সুখ দুঃখের সাথী। এবার মহর্ষি পরিবারের সব ভার পডলো একা সৌদামিনীর ওপব। বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের একেবারে গোড়াব দিকে সৌদামিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন যদিও এর জন্যে তাঁর নিজের কৃতিত্ব খুব বেশি ছিল না।

আগেই বলেছি ঠাকুববাড়ি এবং আরো পাঁচটা সম্ভ্রান্ত পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হতো। গ্রামাঞ্চলে সে সুযোগ ছিল না। দু একজন দুঃসাহসিকা ছাড়া কেউ সাহস করে পুঁথিপত্র নিয়ে বসতে পারতো না কি? মনে তো হয় না। সুদূব পল্লীগ্রামেব গৃহবধূ রাসসুন্দরী একটু-আধটু লেখাপড়া শিখেছিলেন। তিনি ঠাকুরবাড়িব কেউ নন এমনকি এই পবিবারেব সংস্পর্শেও আসেননি তবু বাঙালী মেয়েদের মধ্যে তিনিই লিখেছিলেন প্রথম আত্মজীবনী। এই প্রথম আত্মজীবনী রচনার মতো বিশেষ ঘটনাটি আমরা ঠাকুরবাড়িরই কোন মহিলার কাছে আশা করেছিলুম। যাইহোক, রাসসুন্দরীর পক্ষে লেখাপড়া শেখা সহজ ছিল না, ঘরের দরজা বন্ধ করে শিখতে হতো। না হলে শোনা যেত বৃদ্ধদের খেদোক্তি, "বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেতে পুরুষের কাজ করিবেক। এতকাল ইহা ছিল

না। একালে হইযাছে। এখন মাগের নাম ডাক। মিনসে জড়ভরত।" এই তিক্ত মন্তব্য শুনতে শুনতে রাসসুন্দরীর মনে হতো 'যেন বিদ্যাব আব কোন গুণ নাই, বিদ্যায কেবল টাকা উপার্জন হয।" রাসসুন্দরীর মতো লুকিযে লুকিযে পড়তে হযেছে সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীর মাকেও। তিনি রাত্রিবেলা দরজা বন্ধ করে 'হিসেব কিতেব চিঠি পত্র লিখতেন'। পাবনায প্রমথ চৌধুরীব দিদি প্রসন্নমযী তো ছোটবেলায "বালকবেশে" কাছারি বাড়িতে সবকাবের কাছে পড়তে যেতেন।

তুলনামূলক ভাবে কলকাতাব অবস্থা বেশ ভালো। সেখানে পালা করে বৈষ্ণবী এসে লেখাপড়া শেখাতো। কিছুদিন পরে বৈষ্ণবীর স্থান গ্রহণ করে ইংরেজ গৃহশিক্ষিকারা। রাজা নবকৃষ্ণ, রাধাকান্ত দেববাহাদুর, ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন, প্রসন্নকুমাব ঠাকুব, বাজা বৈদ্যনাথ বায নিজেদেব অন্তঃপুরে লেখাপড়া শেখাবাব ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে সে শিক্ষা নিভৃতে, অন্তরালে। প্রসন্নকুমারের মেযে হরসুন্দরী ও পুত্রবধূ বালাসুন্দরী নানা বিদ্যায পারদর্শিনী হযে ওঠেন। অকালমৃত্যু না হলে হযত জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরেব স্ত্রী বালাসুন্দরীই বাংলা দেশে স্ত্রী স্বাধীনতাব সূচনা কবে যেতেন। বৈদ্যনাথ রাযের স্ত্রীকে পড়াতেন সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুলেব মিসেস উইলসন। ঠাকুরবাড়িতেও বিদেশিনী শিক্ষযিত্রী এসেছিলেন কিন্তু বাড়িব মধ্যে এ ধবণেব শিক্ষযিত্রী রাখার মধ্যে বিশে সাহসের কিছু ছিল না।

এ সময তোড়জোড় চলছিল মেযেদের জন্যে একটা ভালো স্কুল খোলার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছাড়াও এ ব্যাপারে উৎসাহ ছিল মদনমোহন তর্কালংকার গৌরমোহন বিদ্যালংকার ও আরো অনেকের। তাঁরা মেযেদের স্কুল খোলা পক্ষপাতী ছিলেন। বাধা এসেছিল প্রচণ্ডভাবে। এই 'গেল গেল' রবে মধ্যেই স্থাপিত হযে গেল বেথুন স্কুল। এই স্কুলেই পড়তে এসেছিলেন পাঁ বছরের ছোট্ট মেযে সৌদামিনী। সেটা ১৮৫১ সাল। তার দু বছর আগে ১৮৪৯ সালের সাতই মে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা হযেছে। খুব স্বাভাবিকভাবে আমরা আশা করতে পারি ঠাকুরবাড়ির কোন মেযেই বেথুনের প্রথম ছা

.বেন। কিন্তু তা হয়নি। বেথুনের প্রথম দুটি ছাত্রী মদনমোহন তর্কালংকারের ই মেয়ে কুন্দমালা ও ভুবনমালা। তাঁদের সঙ্গে আরো উনিশটি মেয়ে লে ভর্তি হয়েছিলেন।

কিন্তু সামাজিক ঝড় উঠতে দেরি হলো না। এসব ঝড় তোলে খবরের াগজেরা। 'সমাচার চন্দ্রিকা' নানারকম ওজর আপত্তি তুলেছিল। সরলমতি ালিকাদের স্কুলে পাঠানো উচিত নয় তাতে 'ব্যভিচার সংঘটনের শংকা আছে'। ামাতুর পুরুষেরা সুযোগ পেলেই "তাহাদিগকে বলাৎকার করিবে, অল্পবয়স্ক বলিয়া াড়িয়া দিবে না, কারণ খাদ্যখাদক সম্বন্ধ।" এমন কথাও লেখা হলো যে, যাঁরা স্কুলে মেয়েদের পড়তে পাঠাচ্ছেন তাঁরা 'মান্য ও পবিত্র হিন্দু কুলোদ্ভব' নাও তে পাবেন। বেথুনের ছাত্রী সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ালো সাতটিতে। পেক্ষদলও চুপ করে ছিলেন না এমনকি 'সংবাদ প্রভাকর' পর্যন্ত এসব উক্তির তিবাদ জানালো। কে মান্য আর কে মান্য নন সে নিয়েও তর্ক চলতে লাগলো, বু কাগজের তর্কাতর্কি এক জিনিস আর বাস্তবে ঘটে আর এক জিনিস। ধনী-ানী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ইতস্তত: করতে লাগলেন। দু একটা উদাহরণের ্রয়োজন হলে ডাক পড়লো সৌদামিনীর। পাঁচ বছরের সুন্দর ফুটফুটে ময়েটি পেশোয়াজ পরে খুড়তুত বোন কুমুদিনীর সঙ্গে স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি লো। দেবেন্দ্রনাথ সৌদামিনীকে স্কুলে পাঠালেন শুধু দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে। তনি জানতেন তাঁর দেখাদেখি আরো অনেকে নিজের মেয়েদের স্কুলে পাঠাবেন। াঁর অনুমানে ভুল হয়নি। ১৮৫১ সালের জুলাই মাসে সৌদামিনী স্কুলে র্তি হলেন বাঙালী মেয়েদের পড়াশোনার পথ সহজ করে দেবার জন্যে। াপত্তি? হ্যাঁ তাঁকে নিয়েও বিপদ হয়েছিল বৈকি। তাঁর ধবধবে ফর্সা শ্বেত াখরের মতো রঙ দেখে পুলিশ এসে ধরেছিল চুরি করা ইংরেজ মেয়ে ভেবে।

সৌদামিনীর লেখাপড়া ঠিক কতটা এগিয়েছিল জানা যায়নি। মহর্ষি রিবারে তিনি ছিলেন 'গৃহরক্ষিতা' অর্থাৎ গৃহের রক্ষয়িত্রী। সমস্ত কিছু শোনা করে তাঁর হাতে সময় থাকতো কম। শুধু কি দেখাশোনা? নরা কোথাও যাবে, তাদের নিখুঁত করে চুল বেঁধে দিতে হবে। বাড়িতে

কোন উৎসব হবে, সুন্দর করে ফুল কেটে আল্পনা দিতে হবে। সব দিকে মহর্ষির সতর্ক দৃষ্টি। তাই বিশাল পরিবারের আদর্শ গৃহিণী হয়ে সৌদামিনী অন্যদিকে নজর দিতে পারতেন না। তাঁর নিজের লেখা বলতে দু একটি ব্রহ্মসঙ্গীত আর একটিমাত্র স্মৃতিকথা 'পিতৃস্মৃতি' ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি 'তোমারে পূজিব অকিঞ্চন' গানটি হয়ত অনেকেই শুনেছেন। 'পিতৃস্মৃতি'ও দুষ্প্রাপ্য নয়। পড়ে মনে হয়, ইচ্ছে করলে সৌদামিনী আরও অনেক কিছুই দিতে পারতেন কিন্তু দিয়েছেন শুধুমাত্র কয়েকটি সেকেলে ছবির টুকরো। বেথুনে পড়ার কথাই ধরা যাক না। সৌদামিনী লিখছেন :

"কলকাতায় মেয়েদের জন্য যখন বেথুন স্কুল প্রথম স্থাপিত হয় তখন ছাত্রী পাওয়া কঠিন হইল। তখন পিতৃদেব আমাকে এবং আমার খুড়তুত ভগিনীকে সেখানে পাঠাইয়া দেন। হরদেব চাটুজ্জ্যেমশায় আমার পিতার বড় অনুগত ছিলেন, তিনিও তাঁহার দুই মেয়েকে সেখানে নিযুক্ত করিলেন। ইহা ছাড়া মদনমোহন তর্কালংকার মহাশয়ও তাঁহার কয়েকটি মেয়েকে বেথুন স্কুলে পড়িতে পাঠাইয়া দেন। এইরূপে অল্প কয়েকটি মাত্র ছাত্রী লইয়া বেথুন স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়।"

এ যেন শুধুই খবর। তফাৎ এই যে, এ কথা তৃতীয় ব্যক্তির রিপোর্ট না হয়ে বেথুনের একেবারে প্রথম দিকের একটি ছাত্রীর লেখা নিজের কথা। অথচ সৌদামিনী কত খবরই না দিতে পারতেন। বেথুনে পড়া মেয়েদের নিয়ে তো কম ছড়া আর প্রহসন লেখা হয়নি। বলাবাহুল্য সৌদামিনীকেও কতকটা বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে দিয়েই এগোতে হয়েছে। যেমন হায় হায় করে উঠলেন গুপ্ত কবি 'যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে। তখন এ. বি. শিখে বিবি সেজে বিলাতি বোল কবেই কবে।' লেখা শুরু হলো বেথুনে-পড়া অত... বিপথগামিনীদের নিয়ে নানারকম প্রহসন—স্বাধীন জেনানা, বৌবাবু, পাশ করা মাগ, শিক্ষিত বউ, মাগ মুখো ছেলে, শ্রীযুক্তা বৌবিবি, পাশ করা আদুরে বৌ, কলির মেয়ে ও নব্যবাবু, মেয়েছেলের লেখাপড়া আপনা হতে ডুবে মরা—নামের কি শেষ আছে! বিষয়বস্তু সবারই এক, বক্তব্যও একটাই 'গেলো গেলো সব গেলো'।

সৌদামিনী যে এই জাতীয় সামাজিক বাদানুবাদের খবর রাখতেন না তা
। তাঁরই লেখা থেকে জানতে পারি জোড়াসাঁকোয় মহর্ষি ভবনের কম্পাউণ্ডের
াবেই ছিল তাঁর পিসতুত ভাই চন্দ্রবাবুর বাড়ি। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা খোলা
দে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে তিনি একদিন এসে বললেন, "দেখ দেবেন্দ্র, তোমার
ড়ব মেয়েরা বাহিরের খোলা ছাতে বেড়ায় আমরা দেখিতে পাই, আমাদের
জ্জা করে। তুমি শাসন করিয়া দাও না কেন?" উদারপন্থী দেবেন্দ্রনাথ এর মধ্যে
ান দোষ দেখতে পাননি তার চেয়েও বড়ো কথা তিনি বুঝেছিলেন দিন বদলের
লা শুরু হয়েছে। তাই হেসে বলেছেন, "আমি আর কিসের বাধা দিব। যাঁহার
জ্য তিনিই সমস্ত ঠিক করিয়া লইবেন।"

তবে সৌদামিনীর 'পিতৃস্মৃতি' পড়ে দেবেন্দ্রনাথকে নব্যপন্থী ভাবলে ভুল করা
। যতক্ষণ না ছেলেমেয়েরা মন্দের দিকে যাচ্ছে ততক্ষণ তিনি কিছু বলতেন
হিন্দু সমাজের বহু সংস্কার তিনি ব্রাহ্ম হয়েও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন।
বো-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা কোনটাই তাঁর সমর্থন
য নি। আবার পারিবারিক প্রথা বা স্ত্রী আচারকে নির্মূল করার জন্যেও কোন
গ্রহ ছিল না। কারণ তিনি জানতেন এই সব তুচ্ছ প্রথা আর আচারের তলা
য় বয়ে চলেছে বাঙালার নিজস্ব প্রাণধারা, ওপর থেকে টান দিলে তার মূল
বে ছিঁড়ে, রস যাবে শুকিয়ে। তখনকার পরিস্থিতিতে স্থির মস্তিষ্কে এই
শের চিন্তা করে দুটো বিপরীতমুখী স্রোতের মধ্য দিয়ে সংসার তরণীখানিকে
র করে নিয়ে যাওয়াই ছিল অসাধারণ কৃতিত্বের কথা। সুখের বিষয়, দেবেন্দ্র-
থনের অনেক অন্তরঙ্গ কথাই আমরা সৌদামিনীর প্রবন্ধ থেকে জানতে পারি।

সৌদামিনীর ছোট বোনেদের মধ্যে সুকুমারী অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন
তিনিও তাঁর দিদির মতো একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে নিজে কোন
মিকা না নিয়েও জড়িয়ে পড়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ সুকুমারীর বিয়ে দিয়েছিলেন
ধর্ম অনুসারে অর্থাৎ বিবাহ অনুষ্ঠানে শালগ্রাম শিলা বর্জন করে। সুকুমারীর
য়ই প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ। এই বিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হয়। অনেকে
বিয়েকে অসিদ্ধ বলে মনে করতেন। এভাবে মেয়ের বিয়ে দেওয়ায় এবং

হিন্দুমতে পিতৃশ্রাদ্ধ না করায় দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের কাছ থেকে আরো দূরে সরে গেলেন।

সৌদামিনী-সুকুমারীর বোন স্বর্ণকুমারী বাংলাসাহিত্যে প্রথম সার্থক লেখিকা। অবশ্য স্বর্ণকুমারীর আরো একজন দিদি ছিলেন শরৎকুমারী নামে। তিনি রান্নাঘর এবং রূপচর্চাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারীর ছোট বোন বর্ণকুমারীও দু একটি ক্ষেত্রে অভিনয় করা ছাড়া তো আর কিছুই করেননি। কিন্তু স্বর্ণকুমারী যেন সব দিক থেকে এক বিরল ব্যতিক্রম! তাঁর সোনালি ছটায় ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল আলোকিত। স্বর্ণকুমারীর সাফল্য ও কৃতিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন আরো একজন মহিলা, তিনি ঠাকুরবাড়ির মেজো বৌ জ্ঞানদানন্দিনী। যদিও তিনি এ বাড়ির মেয়ে নন বিবাহসূত্রে এসে পড়েছেন ঠাকুরবাড়ির অঙ্গনে। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির কৃতিত্ব ও ঐতিহ্য থেকে তাঁকে আলাদা করে দেখবে কে? এখানকার শিক্ষাদীক্ষা চিন্তাভাবনা সব কিছুর সঙ্গেই যে তিনি জড়িয়ে-মিশিয়ে আছেন। সত্যি কথা বলতে কি, জ্ঞানদা-নন্দিনীই তো সবার আগে সবরকম বাধা-নিষেধের বেড়া টপকে বৃহত্তর জগতে এসে মেয়েদের মুক্তির পথ খুলে দিয়েছেন। তারপর পর্দা আর আবরু ঘোচাতে মেয়েদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। তাই স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে বা বলা যায় তাঁর আগেই জ্ঞানদানন্দিনীর প্রসঙ্গ সেরে নেওয়া যেতে পারে। তবে এঁদের কাউকেই স্বতন্ত্র করে দেখা যায় না কারণ এঁরা এসেছেন একই সময়ে একই সঙ্গে এবং একই পরিবারের সদস্য হয়ে।

জ্ঞানদানন্দিনী মহর্ষি পরিবারের মেজো বৌ। স্বাভাবিকভাবেই বড়ো বৌয়ের কথা মনে পড়বে। দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের স্ত্রী সর্বসুন্দরীর ভূমিকা ঠাকুরবাড়িতে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। এক একজনের লেখায় তিনি হঠাৎ-হঠাৎ উঁকি মেরে গেছেন চওড়া লাল পেড়ে শাড়ির আড়াল থেকে। ঘোমটার সীমানা বুঝি চিবুক ছাড়িয়ে উঠত না তাই তাঁর ছোটখাটো দেহটি একেবারে মিশে গেছে অন্দরমহলের থামের আড়ালে। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের অধিকাংশই তো কেটেছে

পরের সেবায়। শাশুড়ী-ননদ-জা আত্মীয়স্বজন সবাইকে আপন করে নিতে নিতে তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন বিরাট পরিবারের অসংখ্য মানুষের মধ্যে। সেকালে তো মেয়েদের জীবন এমনি করেই কাটতো। কিন্তু জ্ঞানদানন্দিনী হারিয়ে ফুরিয়ে যাবার মতো মেয়ে ছিলেন না। অদম্য প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে তিনি মেয়েদের অগ্রগতির অনেকটা পথই খুলে দিয়েছিলেন। সব কাজে সহায় ছিলেন তাঁর স্বামী প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস. অফিসার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্ঞানদানন্দিনীর বাবা গৌরীদান করেছিলেন সাত বছরের মেয়েকে। তখন তাঁর অক্ষর পরিচয় সবে শুরু হয়েছে গ্রামের পাঠশালাতে। তারপর সবার যা হয় তাই হলো। পুতুল খেলার ঘর সাজাতে সাজাতে নিজেই একদিন মোমের পুতুলটি সেজে ঢুকে পড়লেন রাজবাড়ির মতো সদর-অন্দর-দেউড়ি-দালানওলা বিরাট বিশাল ঠাকুরবাড়িতে। পায়ে গুজরি-পঞ্চম, মাথায় এক গলা ঘোমটা। সেই ঘোমটাখানি হয়তো দুহাতে সন্তর্পণে তুলে ধরে ভীতা-চকিতা হরিণীর দুটি কাজলটানা ব্যাকুল চোখ বারবার পথ খুঁজেছিল পিছন ফিরে চাওয়ার। বলা বাহুল্য পায়নি। ঠাকুরবাড়ির কোন্ বৌ তার পূর্ব জীবনের সংস্কার মনে রাখতে পেরেছে? কিন্তু এগিয়ে যাবার জন্যে নতুন পথ খুঁজে পেয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী। সে একটা ইতিহাস!

শুধু প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান অফিসার নয় বাংলার স্ত্রী-সাধনার পথিকৃৎ সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর লজ্জাবতী বালিকাবধূটিকে সব বিষয়ে ভারতীয় নারীর আদর্শ করে তুলতে চেয়েছিলেন। বিলেতে গিয়ে তিনি দেখলেন স্বাধীনচেতা বিদেশিনীদের। ঘরে-বাইরে তাদের অবাধ বিহার—স্বচ্ছন্দ, সুন্দর, সাবলীল। কই কোথাও তো ছন্দপতন ঘটছে না। 'সব গেল সব গেল' রব তুলে রসাতলে যাচ্ছে না বিলিতি সমাজ। তাহলে? যে মেয়েরা "জীবন উদ্যানের পুষ্প" তাদের আলো-বাতাস থেকে বঞ্চিত করে ঘরের মধ্যে শুকিয়ে মারলে "কি মঙ্গলের সম্ভাবনা"?

সত্যেন্দ্র স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। তিনি অন্তঃপুরের ঝরোকা ভেঙ্গে ফেলছেন, তাঁর স্ত্রী এসেছেন কালাপানি পাড়ি দিয়ে বিলেতে। মন জাগবার

আগেই মনের মানুষ বলে তাঁর পরম আদরের "জ্ঞেনুমণি" যাঁকে বরণ করে নিয়েছেন জগৎ সভায় স্বয়ম্বরা হয়ে সকলের মধ্যে বেছে নিয়ে তাঁকেই আবার পরিয়ে দিচ্ছেন প্রেম-পারিজাতের বরণমালা। শুরু হলো স্ত্রীকে গড়ে তোলার সাধনা। লেখা চললো চিঠির পর চিঠি।

"তোমার মনে কি লাগে না আমাদের স্ত্রীলোকেরা এত অল্প বয়সে বিবাহ করে যখন বিবাহ কি তাহারা জানে না, ও আপনার মনে স্বাধীনভাবে বিবাহ করিতে পারে না। তোমার বিবাহ তো তোমার হয় নাই, তাহাকে কন্যাদান বলে তোমার পিতা কেবল তোমাকে দান করিয়াছেন।" সাগর পার থেকে আসা চিঠি জ্ঞানদানন্দিনীর কানে কানে শোনায় নতুন খবর:

"আমরা স্বাধীনতাপূর্বক বিবাহ করিতে পারি নাই। আমাদের পিতামাতারা বিবাহ দিয়াছিলেন।" জ্ঞানদানন্দিনীর বুক কাঁপে, কি বলতে চায় চিঠি, "তুমি যে পর্যন্ত বয়স্থ, শিক্ষিত ও সকল বিষয়ে উন্নত না হইবে, সে পর্যন্ত আমরা স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে প্রবেশ করিব না।" এসব চিঠির উত্তরে জ্ঞানদানন্দিনী কি লিখতেন কে জানে? তাঁর লেখা একটি চিঠিও পাওয়া যায়নি। সত্যেন্দ্রের চিঠিতে অন্তরঙ্গ সম্বোধন থাকলেও তার ভাষা কেতাবী ধরণের সাধুভাষা, হয়ত সে সময় দাম্পত্য পত্রালাপের ভাষাও সাধুভাষাই ছিল। হেমেন্দ্রনাথকেও সাধুভাষা ব্যবহার করতে দেখা গেছে তবে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখতেন মুখের ভাষায়। এক একটি চিঠিতে ঝরে পড়তো সত্যেন্দ্রের মনের কথা,

"এখানে জনসমাজে যাহা কিছু সৌভাগ্য, যাহা কিছু উন্নতি, যাহা কিছু সাধু সুন্দর, প্রশংসনীয়—স্ত্রীলোকদের সৌভাগ্যই তাহার মূল।...আমার ইচ্ছা তুমি আমাদের স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে কিন্তু তোমার আপনার উপরই তাহার অনেক নির্ভর।"

অবশ্য সত্যেন্দ্রর স্বপ্ন সফল হলো না সেবারে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিলেন। সব ইচ্ছে কি পূর্ণ হয়? বাড়ির বৌ রইলেন বাড়ির মধ্যেই। তাঁর পড়াশোনা নতুন করে শুরু হলো সেজো দেওর হেমেন্দ্রনাথের কাছে। বাড়ির অন্য মেয়ে-বৌদের সঙ্গে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে বসতেন

জ্ঞানদানন্দিনী, হেমেন্দ্রের এক একটা ধমকে চমকে চমকে উঠতেন। এমনি করেই তাঁর পড়া এগোলো মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্য পর্যন্ত।

ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথ আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করে ফেললেন। মেয়েদের শিক্ষা ঠিকমতো এগোচ্ছে না দেখে তিনি তাদের পড়াবার জন্যে প্রথমে মিস গোমিস্‌কে তারপরে ব্রাহ্ম সমাজের নবীন আচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন। সেই প্রথম "একজন অনাত্মীয় পুরুষ" ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। তিনি বাড়ির ছোট ছোট মেয়ে এবং বৌয়েদের স্কুলপাঠ্য বইগুলি বেশ যত্ন করে পড়াতেন। এসময় কেশবচন্দ্র সেন কিছুদিন সপরিবারে ঠাকুরবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এভাবে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর পদ্ধতিটি তাঁর খুব ভালো লেগেছিল।

জ্ঞানদানন্দিনীর সাধনার নেপথ্য ইতিহাসটি খুব পরিষ্কার নয়। সবাই জানি, তিনি স্বামীর স্বপ্নকে সফল করেছিলেন। কিন্তু কি সেই স্বপ্ন? মেয়েরা পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াবেন শিক্ষায় যোগ্যতায় সমমর্যাদা নিয়ে এই তো। আজকের দিনে এর গুরুত্ব অনুভব করাও শক্ত। কারণ জ্ঞানদানন্দিনী যা করেছেন তা এমনিতে হয়ত খুব কষ্টকর নয় কিন্তু প্রথম কাজ হিসেবে অসম্ভব রকমের কঠিন। আজ যখন শুনি, তিনিই প্রথম বাঙালিনী, যিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তখন সবটাই হাস্যকর বলে মনে হয়। কি এমন শক্ত কাজ? সাহসেরই বা দরকার কি? এ নিয়ে এত হৈ চৈ করারই বা কি আছে? তবু হৈ চৈ হয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরলেন। তাঁর কর্মস্থল ঠিক হলো মহারাষ্ট্র। এখন, সে যুগের নিয়ম ছিল ছেলেরা চাকরি করতে বাইরে যেত, ছেলের বৌ থাকতো শ্বশুরবাড়িতে। সত্যেন্দ্র স্ত্রীকে কর্মস্থলে নিয়ে যাবার জন্যে অনুমতি চাইলেন। তিনি থাকবেন প্রবাসে। চার দেয়ালের অন্ধকূপে বন্দিনী হয়ে থাকবেন জ্ঞানদানন্দিনী? তাও কি হয়? অনেক দুঃখ পেয়েছেন তিনি। প্রগতিবাদী ছেলের বদলে তাঁকেই সহ্য করতে হয়েছে সমস্ত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিকে। জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রর দু একটা চিঠি থেকে আভাস পাওয়া যায় যে তাঁর মায়ের সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনীর সম্পর্ক মাঝে মাঝে তিক্ত

হয়ে উঠত। মহর্ষি-পত্নী তাঁর মেজো বৌমাটিব সঙ্গে কথাও বন্ধ করে দিতেন। সত্যেন্দ্রনাথের মেয়ে ইন্দিবার অপ্রকাশিত আত্মকথার পাণ্ডুলিপি 'শ্রুতি ও স্মৃতি'-তে দেখা যাবে সত্যেন্দ্র বিলেত গিয়েছেন বলে তাঁর মা মেজো বৌয়ের গয়না দিয়ে তাঁর নিজের দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। এই গয়না নেওয়ার প্রকৃত কাবণ যাই হোক না কেন মনে হয় অর্থাভাব নয় কারণ পরে মহর্ষি এ কথা শুনে খুব রাগ করেন ও জ্ঞানদানন্দিনীকে একটি হীরের কণ্ঠী গড়িয়ে দেন। অবশ্য জ্ঞানদানন্দিনীব গযনার ওপব কোন ঝোঁক ছিল না, শুধু ভালোবাসতেন পলার গযনা পরতে। যাক সে কথা। এবার সত্যেন্দ্রের প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। মহর্ষি বাধা দিলেন না।

আপত্তি অবশ্য উঠেছিল। বাড়ির বৌ বাইরে যাবে কি? কোন বাড়িব বৌ কি গেছে? তা কি কখনো হতে পাবে? বাডিব পুরুষেরাও যে যখন তখন অন্দরমহলে যেতে পাবে না। বিযেব আগে পর্যন্ত বাইরেই থাকে, বিয়েব পর যখন একখানা আলাদা শোবার ঘর হয় তখন বাতে শুতে আসে। নাহলে বহির্জগতের ছোঁয়া বাঁচানো অন্তঃপুবের শুচিতা নষ্ট হবে যে। এই সাবেকী চালের নড়চড় হতো না কোন বাড়িতে। ধিক্কাবেব ঘূর্ণীঝড উঠলো। মা আগেকার মতো আরেকবার ধমক লাগালেন ছেলেকে "তুই মেয়েদের নিয়ে মেমেদের মতো গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি নাকি?" সত্যেন্দ্রের মনে হয কিই-বা এমন ক্ষতি হয় তাতে? "এই পর্দাপ্রথা আমাদের নিজস্ব নয়, মুসলমানী রীতির অনুকরণ।" তাছাড়া ঠাকুরবাড়িতে "কযেদখানার মতো নবাবী বন্দোবস্তের" দরকারই বা কি?

তাঁর এসব ভালো লাগে না। লাগে না বলেই তো কযেক বছর আগে সেই হাস্যকর-হালকা অথচ দুঃসাহসিক কাজটি করতে পেরেছিলেন। এখন ভাবলেও হাসি পায়। বিয়ের কিছুদিন পরের কথা। সত্যেন্দ্রের তখন অল্প বয়স—ঘোব "র‍্যাডিক্যাল"। বাববার জন স্টুয়ার্ট মিলের 'সাবজেকসন অব উইমেন' পড়ছেন, 'স্ত্রী স্বাধীনতা' নামে প্যামফ্লেট বেরোচ্ছে। সব কাজের সঙ্গী প্রাণের বন্ধু মনোমোহন ঘোষ। হঠাৎ একদিন তাঁর ইচ্ছে হলো বন্ধুর স্ত্রীকে দেখবার।

এমন কি অপরাধ ?

সত্যেন্দ্র রাজী। কিন্তু দেখাবেন কি করে ? জ্ঞানদানন্দিনীর বাইরে যাবার জো নেই, অন্য পুরুষও অন্দরে আসতে পারবে না। তাহলে ? দিনরাত অনেক শলা-পরামর্শ ফন্দি-ফিকির খাটিয়ে শেষে একটা ব্যবস্থা হলো। সে যেমনি দুঃসাহসিক তেমনি রোমাঞ্চকর। জ্ঞানদানন্দিনীর মুখেই শোনা যাক :

"ওঁরা দুজন পরামর্শ করে একদিন বেশি রাতে সমান তালে পা ফেলে বাড়ির ভেতরে এলেন। তারপরে উনি মনোমোহনকে মশারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়লেন। আমরা দুজনেই মশারির মধ্যে জড়ো-সড়ো হয়ে বসে রইলুম, আমি ঘোমটা দিয়ে একপাশে আর তিনি ভোম্বলদাসের মতো আরেক পাশে। লজ্জায় কারো মুখে কথা নেই। আবার কিছুক্ষণ পরে তেমনি সমান তালে পা ফেলে উনি তাঁকে বাইরে পার করে দিয়ে এলেন।"

খুব সহজ ছিল না ব্যাপারটা। দেউড়ি-দালান পার হয়ে সবার চোখ এড়িয়ে বন্ধুকে আনতে হয়েছিল অন্দরমহলে। পদে পদে ধরা পড়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও সত্যেন্দ্র যে এতদূর এগিয়েছিলেন সে শুধু তিনি প্রগতিবাদী ছিলেন বলে।

এবার তো মহর্ষি স্বয়ং অনুমতি দিয়েছেন। মন খুশিতে টইটুম্বুর। প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে। সত্যেন্দ্র স্ত্রীকে বোম্বাই নিয়ে যাবেন "স্ত্রী স্বাধীনতার দ্বার খোলবার এক মহা সুযোগ উপস্থিত"। গোছগাছ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু জ্ঞানদানন্দিনী কি পোষাক পরে বাইরে বেরোবেন ? ঘরের কোণে বন্দী মেয়েদের সাজপোষাক নিয়ে এতদিন কেউ মাথা ঘামায়নি, শুধু একখানি শাড়ি পরলেই চলে যেত। নিজের পুরনো কথা বলবার সময় জ্ঞানদানন্দিনী জানিয়েছেন, শীতকালে তাঁরা এই শাড়ির ওপর জড়াতেন একটি করে চাদর। 'পুরাতনী' থেকে আমরা এরকম আরো অনেক খুঁটিনাটি খবর পেয়েছি। কিন্তু মনে প্রশ্ন থেকে গেছে, এতদিন পর্যন্ত বাঙালী মেয়েরা অন্য কোন পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন না কেন ? সত্যিই কি তাঁরা শাড়ি ছাড়া আর কিছুই পরতেন না ? বাংলাদেশে বেশ অনেকদিন ধরেই মুসলমান শাসন শুরু হয়েছিল। নবাব-হারেমের দু একটা ছবিতে মেয়েদের বেশ রুচিশোভন পোষাক পরতেও দেখা গেছে। সেই

পোষাকটি কি বাঙালী মেয়েরা গ্রহণ করতে পারতেন না? সাধারণতঃ দেখা গেছে বাঙালী পুরুষদের চলায়-বলায় পোষাকে-আষাকে রুচিতে-বিলাসে সর্বত্রই মুসলমানী ছাপ পড়েছে। তাহলে মেয়েরা কেন বাদ পড়লেন? পেশোয়াজের ব্যবহার তো ছিল। যাইহোক, জ্ঞানদানন্দিনীর জন্যে তখনকার মতো ফরাসী দোকানে ফরমাশ দিয়ে বানানো হলো কিম্ভূতকিমাকার 'ওরিয়েণ্টাল ড্রেস'। পরাও খুব কষ্টকর। জ্ঞানদানন্দিনী নিজে নিজে পরতেই পারলেন না। তবু ঐ পরেই কোনরকমে তৈরি হলেন। প্রথমবারের এই পরিচ্ছদ-সমস্যা জ্ঞানদানন্দিনীকে এত বিব্রত করেছিল বলেই তিনি মেয়েদের সাজপোষাক নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। আধুনিকা বাঙালী মেয়েদের রুচিশোভন সাজটি তাঁর সেই চিন্তার ফসল। সে আরো পরের কথা। আপাততঃ যাত্রার কথাটা সেরে ফেলি।

সত্যেন্দ্র প্রস্তাব করলেন, "বাড়ি থেকেই গাড়িতে ওঠা যাক।" এবারও সবাই ছি ছি করে উঠতে দেবেন্দ্রনাথও রাজী হলেন না। সেকালে মেয়েদের গাড়ি চড়া ভারি নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল। তিনি বললেন, "মেয়েদের পালকি করে যাবার নিয়ম আছে তাই রক্ষা করা হোক।" অসূর্যম্পশ্যা কুলবধূ কর্মচারীদের সামনে পায়ে হেঁটে দেউড়ি পেরোবে এতটা ভাবতে বোধহয় মহর্ষিরও ভালো লাগেনি। সাবেকী পালকি জ্ঞানদানন্দিনীকে বোম্বাইগামী জাহাজে চাপিয়ে দিলে। এই শেষ। এরপরে তিনি আর কোনদিন পালকি চাপেননি।

বোম্বাইয়ে পুরো দুবছর কাটিয়ে অপরূপ বেশবাসে সেজে জ্ঞানদানন্দিনী আবার যেদিন কলকাতার মাটিতে পা দিলেন প্রকৃতপক্ষে সেই দিনটিতেই শুরু হলো বাঙালী মেয়েদের জয়যাত্রা। তখন সবে সত্তরের দশক আরম্ভ হয়েছে। সর্বত্র বইছে এক উন্মাদনার হাওয়া। তবে বাংলা দেশে পর্দার কড়াকড়ি শিথিল হতে সময় লেগেছিল। ততদিন যে জ্ঞানদানন্দিনীকে একাই সব লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হয়েছে তা নয়, তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির অন্য মেয়েরা, এবং কয়েকজন ব্রাহ্মিকা মহিলা। অবশ্য যেদিন তিনি বোম্বাই থেকে ফিরলেন সেদিন তাঁর পাশে কেউ ছিল না। স্বর্ণকুমারী সেই মুহূর্তটিকে একটি কালির আঁচড়ে জীবন্ত করে তুলেছেন, "ঘরের বৌকে মেমের মতো গাড়ি হইতে সদরে নামিতে

দেখিয়া সেদিন বাড়িতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত।" বাড়ির পুরনো চাকরদের চোখ দিয়ে দরদর করে নেমে এসেছিল অশ্রুধারা। নিজের পুরনো ঘরটিতে ফিরেও জ্ঞানদানন্দিনী যেন একঘরে হয়ে রইলেন। সমবেদনায় করুণ স্বর্ণকুমারী দেখতেন "বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বধূঠাকুরাণীর সঙ্গে অসংকোচে খাওয়া দাওয়া কবিতে বা মিশিতে ভয় পাইতেন।" এই রকম পরিস্থিতিতে জ্ঞানদানন্দিনীর আচার-আচরণ দুঃসাহসিক বৈকি।

তিনি সত্যেন্দ্রনাথেব সঙ্গে চললেন লাটভবনে, নিমন্ত্রণ রাখতে। সেখানে তাঁকে দেখে সবাই প্রথমে ভেবেছিলেন 'ভূপালেব বেগম', কারণ "তিনিই তখন একমাত্র বেবোতেন।" "ভোজসভায় ছিলেন পাথুরেঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর। তিনি তো ঘবের বৌকে প্রকাশ্য রাজসভায় আসতে দেখে রাগে-লজ্জায় দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। আগে কোনো "হিন্দু বমণী" গভর্ণমেণ্ট হাউসে যাননি। এখনই বা যাবার দবকার কি ছিল? সে কথা সনাতনপন্থীরা বুঝবেন কি করে? বুঝেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাই পুলকিত হয়ে লিখেছেন, "সে কি মহাব্যাপার! শত শত ইংবেজ মহিলার মাঝখানে আমাব স্ত্রী সেখানে একমাত্র বঙ্গবালা!" যতই হৈ চৈ হোক না কেন রোগটা বড়ো ছোঁয়াচে। একটি দুটি করে আরো দরজা খুলতে শুরু করলো।

জ্ঞানদানন্দিনী যে শুধু মেযেদেব পথের কাঁটা ঘুচিয়েছিলেন তা নয় পুরুষের মনের বাধাও অনেকটা দূর করেছিলেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সমবয়সী এই দেওরটি তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। কিন্তু প্রথমে জ্যোতিরিন্দ্র নব্যপন্থী ছিলেন না ববং একটু রক্ষণশীল ছিলেন বড়ো দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো। কেশব সেনকে ব্যঙ্গ কবে প্রহসন লেখার মধ্যেই তাঁর মনোভাবটি ধরা পড়েছিল কিন্তু মেজো দাদা আর মেজ বৌঠানের সাহচর্য তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল নতুন পথে।

জ্ঞানদানন্দিনী আমাদের ঠিক কি দিয়েছিলেন সেটা সবার কাছে তেমন স্পষ্ট নয়। বাঙালী নারীর পথিকৃৎ হবার জন্যে তাঁকে আরো এগোতে হয়েছে। তিনি একাকিনী দু তিনটি শিশু নিয়ে সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিলেত গিয়েছিলেন।

যেখানে একলা যেতে ছেলেদেরও বুক কেঁপে উঠতো। কালাপানি পার হয়ে বিলেত যাওয়া, বাপরে সে কি সহজ কথা! দু দুজন কৃতি পুরুষ, রামমোহন আর দ্বারকানাথ গেলেন বিলেতে কিন্তু ফিরলেন কই? সত্যেন্দ্রকে পাঠাবার সময়েই সবাই ভেবে অস্থির হয়েছিল, আর এ তো বাড়ির বৌ! যৎসামান্য ইংরেজি বিদ্যের পুঁজি নিয়ে সে কালাপানি পাড়ি দিলে কোন্ সাহসে? প্রসন্নকুমারের পুত্র প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর জাহাজঘাটে এসে হতবাক। অস্ফুটে শুধু বললেন, "সত্যেন্দ্র এ কী করলেন? নিজে এলেন না।"

এক এক সময় মনে হয় জ্ঞানদানন্দিনী বিলেত গিয়েছিলেন কেন? শুধু সত্যেন্দ্রর সেই অচরিতার্থ যৌবন স্বপ্ন সফল করবার জন্যে, না সব বিষয়ে ভারতীয় নারীর আদর্শ হয়ে ওঠার জন্যে? বেশ অবাক লাগে যখন শুনি তিনি বিলেত গিয়েছিলেন শুধু স্ত্রী-স্বাধীনতার সঙ্গে পরিচিত হতে। দেশে ফিরে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। খুলে দিয়েছিলেন সম্ভাবনাময় নতুন উষার স্বর্ণদ্বার। অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে আর কেউ সে সময় কিছুমাত্র করেননি বা চালচলনে বিদেশিয়ানা নিয়ে আসেননি। রামবাগানের দত্ত পরিবারের তরু ও অরু লেখাপড়া শিখতে বিদেশে গিয়েছিলেন। আরো দু চার জনকে খুঁজলে পাওয়া যাবে না তা নয় তবে তাঁরা দেশের মাটিতে ফোটা বিদেশী অর্কিডের ফুলের মতোই দূরে দূরে রয়ে গিয়েছেন, বাঙালী-সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যাননি। পুরোপুরি 'সাহেব' হয়ে যাওয়া পরিবারগুলোর সঙ্গে দেশের হৃদয়ের যোগ ছিল না। তাই আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী।

সর্বপ্রথম ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েরা। কিছুদিন ধরেই ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে মেয়েরা যোগ দেবার অনুমতি পেয়েছেন। তাঁরা বসতেন চিকের আড়ালে স্বতন্ত্র আসনে। হঠাৎ ১৮৭২ সাল নাগাদ কয়েকজন আচার্যকে জানালেন তাঁরা তাঁদের বাড়ির মেয়েদের নিয়ে পর্দার বাইরে বসতে চান। যেমন কথা তেমন কাজ। অন্নদাচরণ খাস্তগির ও দুর্গামোহন দাস তাঁদের স্ত্রী ও মেয়েদের নিয়ে এসে বসলেন সাধারণ উপাসকদের

মধ্যে, পুরুষদের সঙ্গে। এতে অন্যান্য ব্রাহ্মদের আপত্তি ছিল। কেশব সেন বাধ্য হয়ে পর্দা ছাড়াই মেয়েদের উপাসনা মন্দিরে বসবার অনুমতি দিলেন। এইভাবে প্রকাশ্যে পর্দার বিরোধিতা শোনা গেল।

বাইরে বেরোবার জন্যে জ্ঞানদানন্দিনী বাঙালী মেয়েদের দিলেন একটি রুচি-শোভন সাজ। অবশ্য দেশী ধাঁচে শাড়ি পরা যে খারাপ ছিল তা নয় তবে তাতে সৌষ্ঠব ছিল না। বোম্বাইয়ে গিয়ে তিনি প্রথমেই জবরজং ওরিয়েণ্টাল ড্রেস বর্জন করে পার্শী মেয়েদের শাড়ি পরার মিষ্টি ছিমছাম ধরণটি গ্রহণ করেন। নিজের পছন্দমতো একটু অদল-বদল করে জ্ঞানদানন্দিনী এই পদ্ধতিটাকেই বজায় রাখলেন। স্বর্ণকুমারীর ছোট মেয়ে সরলা দেখেছিলেন ছোটবেলায় তাঁর মা এবং মেজোমামী দেশে ফিরলেন নতুন ধাঁচের শাড়ি পরে, বাড়িশুদ্ধ সব মেয়েই সেটি গ্রহণ করতে ব্রাহ্মিকারাও তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

বোম্বাই থেকে আনা বলে ঠাকুরবাড়িতে এই শাড়ি পরার ঢংয়ের নাম ছিল 'বোম্বাই দস্তুর' কিন্তু বাংলা দেশে তার নাম হলো 'ঠাকুরবাড়ির শাড়ি'। জ্ঞানদানন্দিনী বোম্বাই থেকে ফিরে এ ধরণের শাড়ি পরা শেখানোর জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মিকা এসেছিলেন শাড়ি পরা শিখতে, সবার আগে এসেছিলেন বিহারী গুপ্তের স্ত্রী সৌদামিনী গুপ্ত। শাড়ির সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনী শায়া-সেমিজ-ব্লাউজ-জ্যাকেট পরারও প্রচলন করেন। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, অন্যান্য ব্রাহ্মিকারাও বাইরে বেরোবার সাজের কথা ভাবছিলেন। মনমোহন ঘোষের স্ত্রী সরাসরি গাউন পরতেন। ঠাকুরবাড়িতেও ইন্দুমতী পরতেন গাউন। কিন্তু সব বাঙালিনী গাউন পরতে রাজী নন বলে দুর্গামোহন দাসের স্ত্রী ব্রহ্মময়ী পরতেন একটা জগাখিচুড়ি মার্কা পোষাক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন স্বদেশী পোষাক তৈরি করবার জন্যে পাজামাতে কোঁচা আর সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন তেমনি ব্রাহ্মিকারা "মেমসাহেবদিগের গাউনের উপরিভাগে আঁচল জুড়িয়া এক প্রকার আধা বিলাতি আধা দেশী পরিচ্ছদ" সৃষ্টি করেন। বোম্বাই দস্তুর নতুনত্বের গুণে সবাইকে আকৃষ্ট করলো। তবে এতে মাথায় আঁচল দেওয়া যেত না বলে প্রগতিশীলারা একটি ছোট টুপি

পরতেন। তার সামনেটা মুকুটের মতো, পেছনে একটু চাদরের মতো কাপড় ঝুলতো। জ্ঞানদানন্দিনীর টুপি পরা ছবি আমি দেখিনি তবে মাথায় শাড়ির আঁচলে ছোট্ট ঘোমটা টানা প্রবর্তন করেন তাঁরাই মেয়ে ইন্দিরা, তখন সাবেকী ধরণে শাড়ি পবার গৌরব আবার ফিরে এসেছে।

এখনকার আধুনিকাবা যে ভাবে শাড়ি পবেন সেই ঢংটি জ্ঞানদানন্দিনীর অবদান নয়। 'বোম্বাই দস্তুর'-এ যেসব অসুবিধে ছিল সেগুলো দূর করবার চেষ্টা করেন কুচবিহারের মহারাণী কেশব কন্যা সুনীতি দেবী। তিনি শাড়িব ঝোলানো অংশটি কুঁচিয়ে ব্রোচ আটকাবাব ব্যবস্থা করেন। তার সঙ্গে তিনি মাথায় পরতেন স্প্যানিশ ম্যান্‌টিলাজাতীয় একটি ছোট্ট ত্রিকোণ চাদর। তাঁর বোন ময়ূরভঞ্জেব মহারাণী সুচারু দেবী দিল্লীব দববারে প্রায় আধুনিক শাড়ি পবাব ঢংটি নিয়ে আসেন। এটিই নাকি তাঁব শ্বশুরবাড়িব শাড়ি পবার সাবেকী ঢং। বাস্তবিকই উত্তব ভারতের মেযেরা, হিন্দুস্থানী মেয়েবা এখনও যে ভাবে সামনে আঁচল এনে সুন্দর কবে শাড়ি পরে ঐ ধরণটিকেই বেশি প্রাচীন মনে হয়। বাঙালী মেয়েবা অধিক স্বাচ্ছন্দ্যগুণে এটিকেই গ্রহণ কবলেন তবে জ্ঞানদানন্দিনীব আঁচল বদলাবার কথাটি তাঁরা ভোলেননি তাই এখন আঁচল বাঁ দিকেই রইলো। কিছুদিন মেয়েদের হব্‌ল্ স্কার্টের অনুকরণে হব্‌ল্ কবে শাড়ি পবাও শুরু হয় তবে অত আঁটসাঁট ভাব সকলের ভালো লাগেনি। শাড়ির সঙ্গে সঙ্গে উঠলো নানান্ ফ্যাশানের লেস দেওযা জ্যাকেট ও ব্লাউজ। রবীন্দ্রনাথেব ভাষায, "বিলিতি দরজীর দোকান থেকে যত সব ছাঁটাকাটা নানা রঙের রেশমের ফালি"র সঙ্গে "নেটের টুকরো আব খেলো লেস মিলিয়ে মেযেদের জামা বানানো হতো।"

এই বিচিত্রবেশিনীরা সাধারণ হিন্দু সমাজের চোখে ছিলেন যোগেন বসুর 'মডেল ভগিনী'র মতো বিচিত্রজীব। জ্ঞানদানন্দিনী নিজে অবশ্য এ বিষয়ে কিছু বলেননি তবে তাঁর দুই ননদ সৌদামিনী আর স্বর্ণকুমারীর বচনা থেকে জানা যায় তাঁদের পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তাঁরা যখন সেমিজ জামা জুতো মোজা পরে গাড়ি চড়ে বেড়াতে বেরোতেন তখন চারদিকে ধিক্কারের ঝড় উঠত। শুধু ধিক্কার নয়, শাড়ির সঙ্গে জ্যাকেট পরে বাইরে বেরোলে

তাঁদের "বিলক্ষণ হাস্যভাজন" হতেও হতো।

হিন্দুদের সেলাই করা জামা পরে কোন শুভ কাজ করতে নেই। তাই পোষাক পরিচ্ছদ নিয়ে আরো কিছুদিন গণ্ডগোল চলেছিল। তবে যুগ বদলেছে, তাই মুসলমানী পোষাককে তাঁরা যেমন অন্তঃপুরে ঢুকতে দেননি তেমন করে ব্রাহ্মিকাদের পোষাককে বাধা দিতে পারলেন না। নতুন ধরণের শাড়ি পরার ঢংএর নামই হয়ে গিয়েছিল ব্রাহ্মিকা শাড়ি। তবে বিয়ে-টিয়ের সময় সনাতন নিয়মই চলতো। গগনেন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে যখন তাঁর ন বছরের মেয়ে সুনন্দিনীকে সম্প্রদান করতে যাচ্ছেন তখনও বরপক্ষের একজন আপত্তি জানিয়ে বলেন, "সেলাই করা কাপড় পরে তো মেয়ে সম্প্রদান হয় না।" গগনেন্দ্র যখন গৌরীদানই করছেন তখন আর নিয়মটুকু মানতে দোষ কি? গগনেন্দ্র জানতেন সে কথা। ঠাকুরবাড়ির ছেলে হলেও তাঁর বাড়িতে সনাতন হিন্দু নিয়মই চলে আসছে। তাই তিনি স্বভাবসিদ্ধ উদারভঙ্গীতে হেসে বলেছিলেন, "দেখুন মেয়ের গায়ে কোন জামা নেই।" সত্যিই তো! সমবেত বরযাত্রীরা দেখলেন মেয়ের গায়ে জামা নেই বটে তবে শাড়িটা এমন কায়দায় পরানো হয়েছে যে জামা নেই বোঝাই যায়নি। শিল্পী গগনেন্দ্র নিজস্ব পরিকল্পনা দিয়ে মেয়েকে সাজিয়েছিলেন। কনে সাজাবার এই ঢংটি সবার খুব পছন্দ হয়েছিল।

বেশবাসে আধুনিকতা আনা ছাড়াও জ্ঞানদানন্দিনী আরো দুটি জিনিষের প্রবর্তক—বিকেলে বেড়াতে বেরোনো আর জন্মদিন পালন। এ দুটিই তিনি বিলেত থেকে আমদানী করেছিলেন। ছেলে ও মেয়ের জন্মদিনে বাড়ির সমস্ত ছোটরা নিমন্ত্রিত হতো। আমোদ-প্রমোদে জ্ঞানদানন্দিনী চাকরবাকরদেরও বঞ্চিত করতেন না। সুরেন্দ্রের জন্ম বর্ষাকালে তাই সে সময় বাড়ির সব ভৃত্যের জন্যে আসত ছাতা আর ইন্দিরার জন্ম শীতকালে তাই পরিচারকেরা পেত একখানি করে কম্বল। জ্ঞানদানন্দিনীর উৎসাহেই সরলা-হিরণ্ময়ীরা প্রথম রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করেন সত্যেন্দ্রের ৪৯নং পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে। সেই উৎসবের দিন জানা গেল জ্যোতিরিন্দ্রের জন্মদিনও কাছাকাছি কোন এক তারিখে। পরের বছর থেকে জ্ঞানদানন্দিনীর উৎসাহে তাঁরও জন্মদিন পালনের ব্যবস্থা হয়। তবে

এই অনুষ্ঠানে জন্মতিথির সংখ্যা অনুসারে মোমবাতি জ্বালানো শুরু করেন স্বর্ণকুমারীর বড় মেয়ে হিরণ্ময়ী।

পারিবারিক যে কোন কাজে জ্ঞানদানন্দিনীর অপরিসীম উৎসাহ ছিল। যখন যার যা প্রয়োজন নিঃসংকোচে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন মেজো বৌয়ের কাছে। কিশোর রবীন্দ্রনাথ বিলেতে গিয়ে উঠবেন কার কাছে? না, মেজো বৌঠানের কাছে। জোড়াসাঁকোয় প্রফুল্লময়ী বুক ভরা কান্নার বোঝা নামিয়ে হাল্কা হবেন কার কাছে? না, মেজদির কাছে। রেণুকা অসুস্থ, মাতৃহীন দুটি শিশুকে রবীন্দ্রনাথ কোথায় রেখে যাবেন? কেন, জ্ঞানদানন্দিনী তো রয়েছেন। অবনীন্দ্রকে ছবি আঁকার উৎসাহ দিলেন কে? কে আবার জ্ঞানদানন্দিনী। প্রতিমার জন্যে আর্টের টিচার খুঁজে দেবেন কে? জ্ঞানদানন্দিনী ছাড়া আর কে আছে? সব দায়িত্ব সব ভার তাঁকে দিয়ে সবাই নিশ্চিন্ত।

শুধু বড়োদের নয়, ছোটদের কথাও অত বড়ো বাড়িতে জ্ঞানদানন্দিনী ছাড়া আর কেই-বা ভেবেছেন। তাদের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভার সন্ধান করে তাদের জাগাবার চেষ্টাও তিনি কম করেননি। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের জড়ো করে তিনি একটা পত্রিকা বার করলেন "বালক" নামে। সুধীন্দ্র, বলেন্দ্র, সরলা, প্রতিভা, ইন্দিরা অনেকেরই সাহিত্যচর্চার প্রথম হাতে খড়ি হয় 'বালকে'। স্বয়ং সম্পাদিকা অর্থাৎ জ্ঞানদানন্দিনী নিজে অবশ্য লিখেছিলেন একটিমাত্র রচনা। তিনি "কনটেম্পোরারি রিভিউ" থেকে ভেরাগোবিও মোগ্রিয়েভিচ্-এর সাইবেরিয়া থেকে পলায়নের রোমাঞ্চকর কাহিনীটি অনুবাদ করেন 'আশ্চর্য পলায়ন' নামে।

শুধু পত্রিকা প্রকাশ নয় ছেলেদের ছবি আঁকায় উৎসাহ দিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী বসিয়েছিলেন একটা লিথো প্রেস। বেশির ভাগ খরচ দিতেন তিনি নিজে। ছোটদের জন্যে তাঁর আরো একটি অবদান আছে। নাতি সুবীরেন্দ্রর জন্যে দুখানি রূপকথাকে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন তিনি। 'সাত ভাই চম্পা' ও 'টাক ডুমাডুম'। রূপকথাকে নাট্যরূপ দেওয়া শক্ত, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে। কিন্তু শিশুমনে এর আবেদন অপরিসীম। জ্ঞানদানন্দিনী এত সুন্দর করে শিয়ালের

সারদা দেবী

সর্বসুন্দরী দেবী

নীপময়ী দেবী

প্রফুল্লময়ী দেবী

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

স্বর্ণকুমারী দেবী

কাদম্বরী দেবী

মৃণালিনী দেবী

সৌদামিনী দেবী (গঙ্গোপাধ্যায়)

সৌদামিনী দেবী
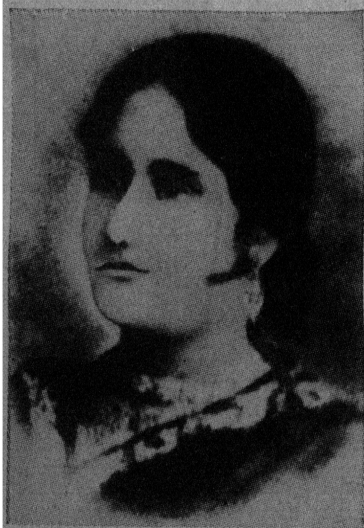
সরোজাসুন্দরী দেবী

ঊষাবতী দেবী

প্রতিভা দেবী

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী

অভিজ্ঞা দেবী

মনীষা দেবী
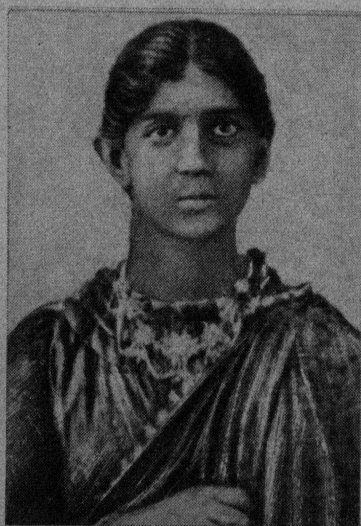
সুনৃতা দেবী

নাক কাটার গল্প বলেছেন যে বহুশ্রুত গল্পটিকেও বারবার শুনতে ইচ্ছে করে, আর মনে হয়, আহা, সব রূপকথাগুলো কেন তাঁর হাতের ছোঁয়ায় নতুন হয়ে উঠলো না। শিয়াল যখন বলে—"ওগো না গো না—তোমার কিছু ভয় নেই—আর যদিই বা একটু আধটু কেটে যায়, তাতে আমার চেহারা খারাপ হবে না। আমার তো আর মানুষের মতো ন্যাড়া নাক নয়, কাটার দাগ রোঁয়ার ভিতরে দিব্যি ঢাকা থাকবে।" তখন শিশুমন কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে উধাও হয়ে যায় রূপকথার রহস্যজগতে। তাই "নাকুর বদলে নরুণ পেলুম তাকডুমা ডুমডুম" হয়ে ওঠে আদি কবিতা।

ছোটদের কথা এমন করে খুব কম মায়েরাই ভেবেছেন। জ্ঞানদানন্দিনীর অন্যান্য প্রবন্ধেও দেখা যাবে শিশুচিন্তার প্রাধান্য। তাঁর লেখা তিনটে প্রবন্ধ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয। তার মধ্যে একটির নাম 'কিণ্টার গার্ডেন'। দ্বিতীয়টির নাম 'স্ত্রীশিক্ষা'। অর্থাৎ প্রথমটি শিশুশিক্ষা ও দ্বিতীয়টিতে নারীশিক্ষার কথা বলা হয়েছে। তবে 'স্ত্রীশিক্ষা'রও মূল উদ্দেশ্য জ্ঞানদানন্দিনীর মতে আদর্শ জননী হওয়া। শিশুকেন্দ্রিক রচনা ছাড়াও তাঁর লেখা আবো দুটি রচনা আমরা পাই। একটি মারাঠী রচনার বঙ্গানুবাদ "ভাউ সাহেবের বখর'—তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা কাহিনী। আর একটি হলো "ইংরাজনিন্দা ও স্বদেশানুরাগ" নামক প্রবন্ধ।

জ্ঞানদানন্দিনী ভারতেব প্রথম আই. সি. এস. অফিসারের স্ত্রী, উচ্চবিত্ত ইঙ্গবঙ্গ সমাজের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা, নিজেও বিলেত ঘুরে এসেছেন। সুতরাং বিলিতি হাব ভাব রুচি চিন্তার সঙ্গে তাঁর মিল হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ জ্ঞানদানন্দিনী নিজে সাহেবিয়ানা বেশি পছন্দ করতেন না। একটি নারীর পূর্ণ আত্মবিকাশের জন্য যতখানি পশ্চিমী রীতি গ্রহণ করা উচিত তিনি ঠিক ততটুকুই নিয়েছিলেন। তাই গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে কিংবা জামা-জুতো পরে গাড়ি চড়ে বেড়াতে তাঁর যেমন আপত্তি ছিল না তেমনি বাধা ছিল না স্বদেশের মঙ্গল চিন্তায়। তবে তিনি ভুয়ো ইংরেজনিন্দা করে সারাজীবন ইংরেজের অনুগ্রহ ভিক্ষা করে কাটিয়ে দেওয়াকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা কবে স্বদেশবাসীকে নিজের পায়ে

দাঁড়াতে বলেছেন। তিনি জানতেন, "আমাদের জাতীয় যথার্থ স্থায়ী উন্নতি আমরা ভিন্ন কাহারও দ্বারা সাধিত হইতে পারে না।"

জ্ঞানদানন্দিনীকে আমরা সব কাজেই এগিয়ে আসতে দেখেছি। এমনকি অভিনয় করার বেলায়ও তাঁর ডাক পড়তো। সব কাজেই তাঁর অনায়াস পটুতা। দেওরদের মাথায় পাগড়ি বেঁধে দেওয়ার জন্যে যেমন তাঁর ডাক পড়তো তেমনি সবাই তাঁকে খুঁজতো নাটকের মহলা দেবার সময়। ঠাকুরবাড়িতে নাটক-পাগল লোকের অভাব ছিল না। সেখানে কথায় কথায় "থিয়েটার দেবার" বা নাটকাভিনয়ের কথা শোনা যায়। মনে হয় বাঈ নাচের পরিবর্তে এটি গৃহীত হয়েছিল। জোড়াসাঁকো থিয়েটার উঠে গেল, জোড়াসাঁকোর উঠোনের ঘরোয়া অভিনয় বন্ধ হলো তবু নাট্যামোদী মানুষের মন চাপা রইলো না। তাই নতুন করে যখন 'রাজা ও রাণী' লেখা হলো তখন জ্ঞানদানন্দিনীর বাড়িতেই বসলো নাটকের মহলা। ভূমিকাও প্রায় ঠিকঠাক—

রাজা বিক্রম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাণী সুমিত্রা—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
দেবদত্ত—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
নারায়ণী—মৃণালিনী দেবী
কুমার—প্রমথ চৌধুরী
ইলা—প্রিয়ম্বদা দেবী

অন্যান্য ভূমিকায় ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য ছেলেরা। অভিনয় দারুণ জমেছিল। সবাই ভালো অভিনয় করেছিলেন। লোকে কাকে ছেড়ে কাকে দেখে? সেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে অভিনয় দেখে গেল পাবলিক স্টেজের কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রী। তারপর? সে এক দারুণ ব্যাপার। প্রত্যক্ষদর্শী অবনীন্দ্রনাথ। তিনি জানিয়েছেন, পাবলিক স্টেজে 'রাজা ও রাণী' অভিনয় দেখার নিমন্ত্রণ পেয়ে তাঁরা গিয়েছিলেন সেখানে। গিয়ে একেবারে তাজ্জব বনে গেলেন "রাণী সুমিত্রা স্টেজে এল, একেবারে মেজো জ্যাঠাইমা। গলার সুর, অভিনয়, সাজসজ্জা, ধরণধারণ হুবহু মেজোজ্যাঠাইমাকে নকল করেছে।"

এমারেল্ড থিয়েটারের এই অভিনয় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল আর রাণী সুমিত্রা সেজে জ্ঞানদানন্দিনীকে নকল করেছিল যে অভিনেত্রী তার নাম "গুলফম হরি"। রাজার ভূমিকায় মতিলাল সুর ও ইলার ভূমিকায় "হাডকাটা কুসুমের" অভিনয়ও ভালো হয়েছিল।

এই অভিনয়কে কেন্দ্র করে অবশ্য আরো একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঝড় তুলেছিল 'বঙ্গবাসী পত্রিকা'। 'ঠাকুর বাডির নতুন ঠাট' নাম দিয়ে একটা প্রবন্ধ ছাপা হলো, তাতে ঐ নাটকের পাত্রপাত্রীদের তালিকা এবং ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা স্পষ্ট করে লিখে কোন কোন নিষিদ্ধ সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী সাজা হয়েছে সেটা দেখিয়ে দেওয়া হয়। আগেই বলেছি, রাজা ও রাণীর ভূমিকায় অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী অর্থাৎ দেবর-বৌদিদি আর দেবদত্ত ও নারায়ণী সাজেন সত্যেন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী অর্থাৎ ভাসুর-ভ্রাতৃবধূ। কিন্তু এসব ছোটখাটো ব্যাপারের দিকে তাকাতে হলে জ্ঞানদানন্দিনীকে অনেক আগেই থেমে যেতে হতো।

নিজে লেখা ছাড়াও অপরকে উৎসাহ দিয়ে লেখানোর দিকে জ্ঞানদানন্দিনীর ঝোঁক ছিল বরাবর। ছোটদের কথা তো আগেই বলেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংস্কৃত নাট্যানুবাদের মূলেও ছিলেন তাঁর এই মেজো বৌঠান। তার আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটিও সংস্কৃত নাটক পড়েননি। জ্ঞানদানন্দিনীর অনুরোধে তাঁকে 'শকুন্তলা' পড়ে শোনাতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে সংস্কৃত নাটক অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। কথায় কথা বাড়ে; আমরা আর একটি কথা বলে জ্ঞানদানন্দিনীর প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে যাব। তিনি তো অনেক কাজেই উৎসাহী ছিলেন। একবার বোম্বাই থেকে ফিরে করলেন কি, একরকম জোর করেই একজন ফটোগ্রাফার ডাকিয়ে শাশুড়ী, জা, ননদ, ও বাড়ির অন্যান্য মেয়ে বৌয়েদের ফটো তুলিয়ে ফেললেন। সেদিন তাঁর আগ্রহ আর উৎসাহ না থাকলে অনেকেই হয়তো ক্ষণকালের আভাস থেকে চিরকালের অন্ধকারে হারিয়ে যেতেন। ধারণা গড়ে নেবার মতো একটা সামান্য ছবিও আমাদের চোখের সামনে এসে পৌঁছতো না। কে বলতে পারে, হয়তো রবীন্দ্রনাথের 'ছবি'

কবিতাটা লেখাই হতো না কোনদিন। একাকিনী জ্ঞানদানন্দিনী এগিয়ে দিয়েছিলেন সমস্ত বাঙালী মেয়েদের।

অবশ্য জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গে সব কাজেই জড়িয়ে মিশিয়ে আছেন স্বর্ণকুমারী, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। মেয়েরা কেউ কেউ সবে যখন কিছু করবার কথা ভাবছেন তখন স্বর্ণকুমারী এসেছেন একেবারে ঝোড়ো হাওয়ার মতো। লেখাপড়ার পাঠ ভালোভাবে শেষ হতে না হতেই তিনি তরতর করে লিখে ফেললেন একেবারে আস্ত একখানা উপন্যাস। সবাই অবাক। তা উনিশ শতকটা তো অবাক হবারই যুগ। কাঁচা ভিতের ওপর পাকা ইমারৎ গড়তে দেখলে কে না বিস্মিত হয়? এই তো সেদিন, মাঝে দশটা বছর গেছে কি যায়নি প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাসখানি লিখে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঔপন্যাসিক জীবন শুরু করেছেন। এখনও সবার মনে 'দুর্গেশনন্দিনী'র অমলিন স্মৃতি। চারপাশে শুধু নাটক-প্রহসন আর নক্সার ভিড়। কখন উপন্যাস লেখায় হাত দিলেন এই অষ্টাদশী তরুণীটি? এ তো শুধু প্রথম লেখা নয়। এ যেন আবির্ভাব!

আবির্ভাবই বটে। ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাস, শীতার্ত সন্ধ্যা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এক অনামিকার শুভ আবির্ভাবে। বইয়ের নাম 'দীপনির্বাণ। সকলেই উলটে পালটে দেখে। সকলের মনেই নানারকম প্রশ্ন। লেখকের নামহীন বইটি নিয়ে জল্পনা চলছে। কার লেখা বই? কার লেখা হতে পারে? এরই মধ্যে কানাঘুষো শোনা গেল বইখানি একটি মেয়ের লেখা।

বোমা ফাটলো এবার।

একজন মেয়ের লেখা? পড়ে বিশ্বাস হয় না। ভাষায় এমন বাঁধুনি, লেখায় এমন মুন্সীয়ানার ছাপ! মেয়েলি জড়তা-সংকোচ কুণ্ঠা কোথাও কিচ্ছু নেই। এ কি কোন মেয়ের লেখা হতে পারে? 'সাধারণী' কাগজ সমালোচনা করলে—

"...শুনিয়াছি এখানি কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলার লেখা। আহ্লাদের

কথা। স্ত্রীলোকের এরূপ পড়াশোনা, এরূপ রচনা, সহৃদয়তা, এরূপ লেখার ভঙ্গী বঙ্গদেশ বলিয়া নয় অপর সভ্যতর দেশেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।" প্রশংসা ঠিকই। কিন্তু তারই মধ্যে লুকিয়ে রইল সন্দেহের কাঁটা। খচখচ করে বেঁধে 'মহিলার লেখা'।

সত্যিই কি মহিলার লেখা?

কে সেই মহিলা? কি তাঁর পরিচয়?

মহিলার নামে পুরুষের লেখাও তো হতে পারে।

স্বর্ণকুমারীর মেজোদাদা সত্যেন্দ্র তখন বিদেশে; তিনি ভাবলেন এ নিশ্চয় তাঁর ভাই জ্যোতিরিন্দ্রের লেখা। অভিনন্দন জানিযে চিঠি পাঠালেন, "জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?" সত্যিই পারে না। স্বর্ণকুমারীর বর্ণালী দীপ্তিও অজানা খনির নতুন মণির আলোর মতো ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। সন্দেহের আর অবকাশ রইলো না।

স্বর্ণকুমারীকে নিয়ে এত আলোড়ন উঠেছিল কেন? তিনিই কি প্রথম বাঙালী লেখিকা না প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক? ইতিহাস বলবে এর কোনটাই ঠিক নয়। ঠাকুরবাড়ির মতো শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকেই প্রথম লেখিকার আবির্ভাব হওয়া অসঙ্গত নয়, অসম্ভবও ছিল না। কিন্তু 'দীপনির্বাণ' প্রকাশের আগেই মার্থা সৌদামিনী সিংহের নারীচরিত কিংবা নবীনকালী দেবীর 'কামিনী কলঙ্ক' লেখা হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে হেমাঙ্গিনী দেবীর 'মনোরমা' কিংবা সুরঙ্গিনী দেবীর 'তারাচরিত'। যতদূর জানি, প্রথম বাংলা কাব্য লেখিকার নাম কৃষ্ণকামিনী দাসী। তাঁর 'চিত্তবিলাসিনী' ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-কে বাদ দিলে এটিই বাঙালী মেয়ের লেখা প্রথম গ্রন্থ। এরপর প্রবন্ধ জাতীয় রচনা প্রথম লেখেন পাবনার বামাসুন্দরী দেবী ১৮৬১ সালে। তাঁর পুস্তিকখানির নাম ছিল "কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।" প্রথম মহিলা নাট্যকার কামিনীসুন্দরী দেবী 'উর্বশী' নাটক লেখেন ১৮৬৬ সালে। অনেকের মতে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিকের নাম শিবসুন্দরী দেবী। তাঁর 'তারাবতী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ সালে (মতান্তরে

১৮৭৩ সালে)। শিবসুন্দরী ছিলেন পাথুরেঘাটার হরকুমার ঠাকুরের স্ত্রী। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শৌরীন্দ্রমোহন 'তারাবতী'র ইংরেজি অনুবাদ করে (১৮৮১) নিজের গানের বইয়ের সঙ্গে বিভিন্ন দেশে উপহার পাঠিয়েছিলেন। প্রথম মহিলা আত্ম জীবনীকার রাসসুন্দরী দেবী (১৮৭৬)। এঁরা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। শিবসুন্দরী ছাড়া অন্যরা কোন বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকেও আসেননি। তবু তাঁদের বিদ্যানুরাগ ও সাহিত্যপ্রীতি আমাদের মুগ্ধ করে। ঠাকুরবাড়ি থেকেই এদের কোনটি প্রথম লেখা হতে পারতো। যাক সে কথা, এই তথ্যের দিকটিকে বাদ দিলে স্বর্ণকুমারী পূর্ববর্তিনীদের কাউকেই সাহিত্যিক হিসেবে গ্রহণ করা চলে না। পরম গৌরবে নিজেদেব দায়িত্ব পালন করলেও মেয়েদের সাহিত্য এতদিন ছিল শুধু হাস্যকর এবং অনুকম্পার বস্তু। স্বর্ণকুমারী এসে আদায় করে নিলেন প্রার্থিত সম্মান। হাসি আর করুণার বদলে দেখা দিল শ্রদ্ধামেশানো বিস্ময়! মেয়েদের চলার পথ, আত্মপ্রকাশের পথ আরো বুঝি একটু সুগম হলো।

উপন্যাস ছাড়াও স্বর্ণকুমারী লিখেছিলেন গল্প, নাটক, প্রহসন, কবিতা, গাথা, গান, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, গীতিনাট্য, স্মৃতিকথা, স্কুল পাঠ্য বই—একজন মহিলার পক্ষে যা প্রায় অসম্ভবের পর্যাযে পড়ে। আশ্চযের কথা এই যে তিনি তাঁর পূর্ববর্তিনীদের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হননি। তাঁর আদর্শ লেখক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, যদিও তাঁর ইতিহাসনিষ্ঠা বমেশ দত্তকেই মনে করিয়ে দেয়। বঙ্কিমের মতো লেখক আদর্শ হওয়ায় স্বর্ণকুমারীর রচনায় রমণীয় লাবণ্যেব কিছু অভাব ঘটেছে। অবশ্য তাতে খুব বেশি ক্ষতি হযনি। আর যেখানেই হোক সাহিত্যে মেয়েলী ভঙ্গীব আদর নেই। স্বর্ণকুমাবীর অধিকাংশ বচনাই পুরুষালি ঢংএ লেখা। অথচ তিনি গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করেন বেশ অল্প বযসে। অবশ্য এই বয়সে উপন্যাস লেখাব নজির আরো আছে। তরু দত্তের কথাই ধরা যাক না। মাত্র একুশ বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে তরুর মৃত্যু হয় কিন্তু সেই স্বল্প কটি দিনের মধ্যেই তিনি লিখেছিলেন অনেকগুলো মনে রাখবার মতো কবিতা আর দুটি উপন্যাস, লিখেছিলেন ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায়। সে যুগে

ইংরেজি ভাষায় নাটক, নভেল অনেকেই লিখতেন। বিদেশিনী শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষার ফলে ইংরেজি শেখার পথও হয়েছিল সরল। স্বর্ণকুমারীও তাঁর নিজের গল্প ও উপন্যাসের অনুবাদ করেছেন, তবে সে অনেক পরে।

মাঝে মাঝে স্বর্ণকুমারীকে অসাধারণ সৌভাগ্যবতী বলে মনে হয়। পথের কাঁটাও বুঝি তাঁর পায়ের তলায় ফুল হয়ে ফুটেছে। নতুন কিছু করার জন্যে জ্ঞানদানন্দিনীকে যত ঝড়ঝাপ্টা সইতে হয়েছিল তাঁকে সে সব দুর্যোগ স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি পেলেন শুধুই শ্রদ্ধা, শুধুই সম্মান, শুধুই অভিনন্দন। একেই বলে ভাগ্য! সত্যিই কি কোন বাধা ছিল না? না, স্বর্ণকুমারী কোন বাধাকে বাধা মনে করেননি। আপাতভাবে সংসারে উদাসীন হওয়ার জন্য স্বর্ণকুমারী সবসময় এক নিরাসক্ত দূরত্বের মধ্যে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। বাকিটুকু ঘিরে রেখেছিল জানকীনাথ ঘোষালের ভালোবাসা। স্ত্রীকে তিনি সমস্ত দুঃখ বিপদের হাত থেকে সরিয়ে চেষ্টা করেছেন সাহিত্যক্ষেত্রে সার্থক করে তুলতে। স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যিক খ্যাতি চিড় ধরায়নি তাঁদের দাম্পত্য জীবনে।

স্বর্ণকুমারী যখন নিজেকে লেখিকা হিসেবে তৈরি করে নিচ্ছেন তখন অন্যান্য মেয়েরা কি করছিলেন? অন্যান্য বাড়ির অন্দরমহলের খবর সংগ্রহ করা এত সহজ নয়। আগে ঠাকুরবাড়িটাই দেখা যাক। স্বর্ণকুমারীর দিদি-বৌদিদিরা মগ্ন থাকতেন ঘরের কাজে। সকাল থেকে তাঁদের বসতো তরকারি বানানোর আসর, সেই সঙ্গে চলতো মেয়েলী আড্ডা—এই আসরে যোগ দিতেন সৌদামিনী, শরৎকুমারী, বর্ণকুমারী, প্রফুল্লময়ী, সর্বসুন্দরী, কাদম্বরী আরো অনেকে। মহর্ষি বাড়ি ফিরলে তদারক করতে আসতেন সারদাদেবী। এছাড়া বাড়ির অন্যান্য আশ্রিতা মহিলারাও যোগ দিতেন। হাতের কাজের সঙ্গে জমে উঠতো গল্প। বাড়ির ছোট ছোট মেয়েরা গল্পের টানে হাজির হতো সেখানে। সরলাও প্রায়ই যেতেন কিন্তু নিজের মাকে কোনদিন সে আসরে দেখেননি।

শরৎকুমারী ভালোবাসতেন রূপচর্চা করতে। সবচেয়ে বেশি সময় নিয়ে রূপটান মেখে চৌবাচ্চার জলে সাঁতার কেটে তিনি অনেকটা সময় কাটিয়ে দিতেন।

তাঁর স্বামী যদুকমল মুখোপাধ্যায় ছিলেন সুরসিক ব্যক্তি। শোনা যায়, অনেকেরই কৌতূহল ছিল ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের রূপ-রঙ নিয়ে। একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন যদুকমলকে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 'দুধে আর মদে'। অনেকেই মনে করতেন ঠাকুববাড়ির ছেলেমেয়েদের এই দুটি পদার্থ দিযে স্নান করানো হতো জন্মাবার পরেই। যদুকমলের রহস্য-প্রিয়তার এই ছোট্ট ছবিটি উপহার দিয়েছেন সত্যেন্দ্র-দুহিতা ইন্দিরা, তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থ 'শ্রুতি ও স্মৃতি'তে। ঠাকুরবাডিতে মেয়েরা রন্ধনচর্চাও কবতেন, শরৎকুমাবী ছিলেন রন্ধন পটিয়সী। অন্যান্য বাড়ির মেয়েরাও যে অন্যভাবে জীবন কাটাতেন তা নয়। বিনয়িনীর অপ্রকাশিত আত্মকথা "কাহিনী" পড়ে জানা যায় তাঁদের বাড়িতে অর্থাৎ অবন-গগন ঠাকুর পরিবারের মেযেদের অনেক সময় কেটে যেত ঠাকুরঘরে। অন্যান্য বাড়িতেও অধিকাংশ মেয়ে এমনি ভাবেই সময় কাটাতেন। এছাড়া কেউ দিতেন পুতুলের বিয়ে, কেউ খেলতেন তাস-পাশা কিংবা দশ-পঁচিশ। স্বর্ণকুমারী এভাবে জীবন কাটাননি। নিজেকে অন্য সব দিক থেকে সরিয়ে এনে তিনি অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

"দীপনির্বাণ" উপন্যাসের পরে প্রকাশিত হলো "বসন্ত উৎসব", প্রায় একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করলো "ছিন্নমুকুল"। এবার যশের মুকুট তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলেন পাঠকসমাজ। ইদানীংকালে হয়তো অনেকেই ভুলে গেছেন যে, বাংলায় অপেরাধর্মী গীতিনাটিকা লেখার ব্যাপারেও স্বর্ণকুমারী পথিকৃতের গৌরব দাবি করতে পারেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' এমনকি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী'রও আগে রচনা করেন 'বসন্ত উৎসব'। লেখার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়। ঠাকুরবাড়িতে তখন স্বর্ণ যুগ চলছে। বাড়িতে রয়েছেন স্বর্ণকুমারীর নাট্যরসিক দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্যপ্রেমিকা স্ত্রী কাদম্বরী। সত্যেন্দ্র-জ্ঞানদা মাঝে মাঝে আসতেন ঝোড়ো হাওয়ার মতো; 'জীর্ণ পুরাতন'কে ভাসিয়ে দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে। প্রচণ্ড উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে হয়ে গেল 'হিন্দুমেলা'। এরপর ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েরা মেতে উঠলেন একটা নতুন পত্রিকা প্রকাশের জন্যে। পাঁচ বছর আগে বেরিয়েছে 'বঙ্গদর্শন'। ঘরে ঘরে বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র আদর। ওই

রকম ভালো কাগজ বার করা যায় নাকি? মহর্ষির বড়ো ছেলে দ্বিজেন্দ্র একটু প্রাচীনপন্থী, তাঁর ইচ্ছে তত্ত্ববোধিনীকেই আরো জাকিয়ে তোলা। নব্যপন্থী জ্যোতিরিন্দ্রের সে ইচ্ছে নয়। পুরনো জিনিষকে নতুন করা যায় না। শেষে তাঁরই জয় হলো। ভাই-বোনেরা মিলে খসড়া করেন, পরিকল্পনা হয়, রাত বাড়ে।

কি নাম দেওয়া হবে?

'সুপ্রভাত'?

'নাঃ কেমন যেন শোনাচ্ছে'। সবচেয়ে বেশি ভোটে যে নামটি গৃহীত হলো সেটি যেমন সুন্দর, তেমনি অর্থবহ।

কি নাম?

"ভারতী"।

প্রথম দিকে 'ভারতী' ছিল জ্যোতিরিন্দ্র-কাদম্বরীর মানস কন্যা, পরে স্বর্ণকুমারীই ছিলেন 'ভারতী'র প্রকৃত কর্ণধার। অবশ্য সে অনেক পরেব কথা, ১৮৮৪ সালের কথা। তার বছব সাতেক আগে 'ভারতী'র প্রথম সম্পাদক হন দ্বিজেন্দ্রনাথ। প্রথম সংখ্যা থেকেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন 'মেঘনাদবধে'র কঠোর সমালোচনা। আবার ফিরে আসা যাক পূর্ব প্রসঙ্গে।

ঠাকুররাড়িতে বাঈ-নাচ হতো না বটে তবে রসের ভোজে কেউ কোনদিন বাদ পড়তেন না কারণ রসস্রষ্টা ছিলেন তাঁরা নিজেবাই। বাড়িব যে কোন আনন্দ-উৎসবের সময় নানারকম অনুষ্ঠান হতো। এর উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। বছব দশেক আগেকার জোড়াসাঁকো থিযেটারের উদ্যোক্তা ছিলেন গণেন্দ্র, গুণেন্দ্র, সারদাপ্রসাদ ও জ্যোতিরিন্দ্র। এখন সে থিয়েটারের পাট চুকে গেছে কিন্তু বদলায়নি নাট্যামোদীর মন। তাই আবার নতুন করে নাটক জমিয়ে তুললেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। পুবনো থিয়েটারি মজলিশ বাড়িতে ঢুকতে পেলে না বটে তবু নাটক জমে উঠলো। জোড়াসাঁকো থিয়েটারের সেই কুশলী অভিনেতা জ্যোতিরিন্দ্র, যিনি নটীর ভূমিকায় অভিনয় করে সবার মন ভুলিয়ে ছিলেন তিনিই আসর সাজালেন। পুরনো কুশীলবরা নেই, কেউ বা

পরলোকে। এবার নতুন করে যোগ দিলেন বাড়ির মেয়েরা। যদিও ঘরোয়া অনুষ্ঠান, দর্শকরাও আত্মীয় স্বজনেরা। তবু এ ঘটনায় চমকে উঠলো সবাই। অভিনয়কে বাড়ির উঠোনে টেনে আনা ও সম্ভ্রান্ত ঘবেব মেয়েদের মঞ্চে এসে দাঁড়ানো দুটোই ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

স্বর্ণকুমারীর 'বসন্ত উৎসবে'র অভিনয হয়েছিল ঠাকুরবাড়িব ঘরোয়া আসরে। একদিন বারান্দার জমাটি আড্ডায় বসে কথা উঠলো সেকালে 'বসন্ত উৎসব' কেমন হতো? আসব জমে উঠলো তর্কে বিতর্কে। সব কাজের উদ্যোক্তা জ্যোতিরিন্দ্র প্রস্তাব করলেন, "এসো না, আমরাও একদিন সেকেলে ধরণের বসন্ত উৎসব করি।' কারুর উৎসাহ তো কম নয। দেখতে দেখতে "পিচকারী আবীর কুঙ্কুম প্রভৃতি প্রযোজনীয় সব সবঞ্জাম" এসে গেল। রঙিন আলোয় ছাতের বাগানে খুব আবীর খেলা হবে। আমোদ প্রমোদ বাদ যায় কেন? স্বর্ণকুমারী লিখে ফেললেন 'বসন্ত উৎসব'। গীতিনাটিকার সূচনা হলো স্বর্ণকুমারীব হাতে। এই বিরাট 'আনন্দযজ্ঞে' রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন সাত সমুদ্দুর তেরো নদীব পারে বিলেতে বসে কোন এক মবা সাহেবের বিধবা গিন্নীকে বেহাগ-সুরে শোকগীত শোনাচ্ছেন।

'বসন্ত উৎসবে'র নায়িকা লীলা সাজলেন কাদম্বরী। আব যে সন্ন্যাসিনীর কৃপায় লীলা তার প্রেমিককে ফিরে পেল সেই সন্ন্যাসিনী সাজলেন স্বর্ণকুমাবী নিজে। গেরুয়া সাজের সঙ্গে তাঁর উদাসিনী প্রকৃতিটি সুন্দব খাপ খেযেছিল। নায়ক হয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তবে 'বসন্ত-উৎসবে'র পরবর্তী অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথও প্রতিনায়ক হয়ে টিনের তলোয়াব ঘুবিয়ে যুদ্ধ কবেছিলেন। এবপর কিছুদিন ধরে তিন ভাইবোনে গীতিনাট্য লেখা এবং অভিনয চালিয়ে গেলেন নিয়মিতভাবে। পরে স্বর্ণকুমারী লেখেন 'বিবাহ উৎসব'।

অবিশ্রাম ঝর্ণার মতো বয়ে চললো স্বর্ণকুমারীব লেখাব স্রোত। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে ঠাকুববাড়ির আব কেউই বোধহয় এত বেশি লেখেননি। তাঁর সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্র এটি নয়। বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণকুমারী তাঁর যোগ্য আসন আজও পাননি। অথচ একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ এই

দুটি ভিন্ন কোটির মধ্যবর্তী সেতু হিসেবে আমরা স্বর্ণকুমারীর নাম করতে পারি। ঐতিহাসিক গল্প ও উপন্যাস রচনায় টড কাহিনী অনুসরণ করেও তিনি যে মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না।

স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়। 'দীপনির্বাণ', 'মিবাররাজ', 'বিদ্রোহ', 'ফুলের মালা', 'হুগলীর ইমামবাড়া'—প্রত্যেকটিই জনপ্রিয় হয়েছিল। ইতিহাসের ফাঁক ভরিয়ে তোলার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে যে কৌশল অবলম্বন করতেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। যেমন ধরা যাক, 'কুমার ভীমসিংহ' গল্পের কথা। রাজসিংহের প্রথমা পত্নী কমলকুমারী ও দুই রাণীর দুই পুত্র ভীমসিংহ ও জয়সিংহের কথা টড কাহিনীতে আছে। কিন্তু রাজসিংহের দ্বিতীয়া স্ত্রীর কোন নাম নেই। কিন্তু স্বর্ণকুমারী যখন গল্প লিখছেন তখন বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাস লেখা হয়ে গেছে। কিষাণগড়ের চারুমতীকে তিনি রূপনগরের বীরাঙ্গনা চঞ্চলকুমারী করে তুললেন। এর পাঁচ বছর পরে গল্প লিখতে বসে স্বর্ণকুমারী অবলীলায় জয়সিংহ-জননীর নাম দিয়ে দিলেন চঞ্চলকুমারী। টডের ইতিহাস একটু ক্ষুণ্ণ হলো বটে কিন্তু হোঁচট খেলো না পাঠকের মন। কল্পনা-বাস্তবে মেশা ছায়া-ছায়া নামহারা একটা চরিত্র ব্যক্তিত্ব লাভ করলো স্বর্ণকুমারীর হাতে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখলেও সামাজিক গল্প-উপন্যাস লিখে স্বর্ণকুমারী নাম করেন বেশি। যদিও ঠাকুরবাড়ির বিশেষতঃ এ বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে সাধারণ বাঙালী সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না বলে তাঁদের লেখায় বাস্তব জীবনের ছাপ বিশেষ পাওয়া যায় না এমন একটা ধারণা বহুদিন থেকেই আমাদের মনে বাসা বেঁধে আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন "পৃথিবীর সঙ্গে যথার্থ পরিচয়ের অভাব তাদের পঙ্গু করে রেখেছে।" তিনি সম্ভবতঃ সেজন্যেই স্বর্ণকুমারীর রচনাগুলির অনুবাদ-প্রকাশে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। পারিবারিক জীবনের ছোটবড়ো খুঁটিনাটি ব্যাপারের দিকে চোখ তুলে না তাকালেও স্বর্ণকুমারী বাস্তব জীবন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। সমাজ সংসার সব কিছুর ঊর্ধ্বে যে মানুষের মন তিনি তাঁর নাগাল পেয়েছিলেন। তাই তাঁর

সর্বশ্রেষ্ঠ দুটি উপন্যাস সামাজিক উপন্যাস।

প্রথমে ধরা যাক 'স্নেহলতা'র কথা। বিশ শতকের সমালোচকদের ভাষায় "বাঙালী সমাজে আধুনিকতার সমস্যা লইয়া এই প্রথম উপন্যাস লেখা হইল।" আগেই বলেছি, স্বর্ণকুমারী সব বিষয়েই অতি ভাগ্যবতী, নয়তো বিধবা সমস্যা নিয়ে এর অনেক আগে থেকেই তো লেখালেখি চলছে, স্বর্ণকুমারীর ভাগ্যে অভিনন্দন জুটবে কেন? তবে এ বিষয় নিযে স্বর্ণকুমারীকে ভাবতে দেখে একটু অবাক লাগে কারণ মহর্ষি স্বয়ং বিধবা বিবাহের বিরোধী ছিলেন। বিধবা স্নেহলতাও অবশ্য বিষবৃক্ষের 'কুন্দনন্দিনী'র পন্থা অনুসরণ করেছে কিন্তু 'চোখের বালি'র বিনোদিনীই কি নতুন পথ দেখাতে পেরেছিল? যাক সে কথা, স্বর্ণকুমারী বিধবা সমস্যাকে দেখেছেন সমাজ-সংস্কারকের দৃষ্টিতে নয়, নারীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। নারীর প্রেম-ভালোবাসা-সংশয়-লজ্জা-সংকোচ-ভয়-সংস্কার সব কিছুর মধ্য দিয়েই তিনি মেয়েদের সমস্যাকে দেখতে চেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে এই দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যই বৈশিষ্ট্য এনেছিল।

উনিশ শতকে বিধবা সমস্যা নিয়ে অনেকেই ভাবনা চিন্তা শুরু করেছিলেন। শুধু ভাবনা চিন্তা নয়, সক্রিয় হয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেন আরো অনেকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর প্রথম বিধবা বিবাহ দেবার পর উৎসাহ-উদ্দীপনা অনেক বেড়ে গেল। এ ব্যাপারে অবশ্য ব্রাহ্ম সমাজ অসাধারণ আগ্রহ দেখিয়েছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে বিধবা বিবাহের প্রবর্তন হয় অনেক পরে কিন্তু দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবকেরা অনেক অসাধারণ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। আমরা সত্যেন্দ্রনাথের উদার দৃষ্টি ও স্ত্রী-স্বাধীনতাপ্রয়াসী মনটির কথা জানি। দুর্গামোহন দাসের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আরো উদার, আরো বলিষ্ঠ। সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে তিনি নিজের তরুণী বিমাতার সঙ্গে একজন বন্ধুর বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মময়ীও ছিলেন অসাধারণ মহিলা। শিবনাথ শাস্ত্রীও কম যান না। তিনি প্রথম জীবনে পিতার আদেশে প্রথমা স্ত্রী প্রসন্নময়ী থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বিরাজ-মোহিনীকে। পরে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে স্থির করেন তিনি বিরাজমোহিনীকে

স্ত্রীরূপে গ্রহণ না করে আবার নতুন করে বিয়ে দেবেন। অবশ্য বিরাজমোহিনীর প্রবল আপত্তিতে ব্যাপারটা বেশি দূর গড়াতে পায়নি। ঠাকুরবাড়ি থেকে এই ধরণের মনোভাব কোন সময়ই সমর্থন পায়নি। ১৮৭২ সালে কেশব সেন অসবর্ণ বিবাহকে যখন বৈধ ঘোষণা করে 'বিশেষ বিবাহনীতি' (তিন আইন) চালু করলেন তখন ঈশ্বরচন্দ্র রাজনারায়ণ বসুর মেয়ে লীলাবতী মিত্রের কাছে কয়েকজন অসহায়া বিধবাকে পাঠান যাতে তিনি তাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারেন। লীলাবতী কম সাহসের পরিচয় দেননি। তিনি ১৮৮৩ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে আটটি বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন।

স্বর্ণকুমারীও যে বিধবাদের কথা ভাবেননি তা নয়। তিনি নারীকল্যাণমূলক কাজ আরম্ভ করেছিলেন 'সখিসমিতি'র মধ্যে দিয়ে। নামটি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। স্বর্ণকুমারী তাঁর বান্ধবীদের নিয়ে এই সমিতি পরিচালনা করতেন। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিধবা ও কুমারী মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী করে তোলা। তখনও মেয়েরা বিশেষতঃ বিবাহিতারা স্কুলে পড়তে আসতো না অথচ লেখাপড়া শেখার আগ্রহ বেড়ে গেছে। তাই ঘরে ঘরে শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন—তাদের অভাবে শিক্ষক কিংবা বিদেশিনী মিশনারী মেম সাহেব নিয়োগ করা হতো। স্বর্ণকুমারী দেখলেন বাঙালী মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে অনায়াসেই এই কাজটি পেতে পারে। অর্থোপার্জনে স্বনির্ভর হলে অনাথা বিধবাদের জীবনযাত্রা যে সহজতর হবে তাতে সন্দেহ ছিল না। 'সখিসমিতি' যে এ ব্যাপারে খুব সফল হয়েছিল তা নয় তবে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে ও মেয়েদের আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার জন্য 'সখি সমিতি'র মতো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। সত্যি কথা বলতে কি আজও সে প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি।

আবার ফেরা যাক 'স্নেহলতা' প্রসঙ্গে। স্বর্ণকুমারী বিধবাদের লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের আত্মনির্ভর করে তুলতে চাইলেও তাদের পুনর্বিবাহ দেবার চেষ্টা করেননি। তবে এভাবে বিধবা সমস্যার সমাধান সত্যিই হয় কিনা সে বিষয়েও চিন্তা করেছিলেন। সেই চিন্তার ফসল 'স্নেহলতা'। তাই স্নেহের মৃত্যুর পরে জগৎবাবুর চিন্তার সূত্র ধরে আমরা যখন লেখিকার ভাবনার সঙ্গে

পরিচিত হই তখন চমকে উঠি। জগৎবাবু এই উপন্যাসের একটি প্রধান চরিত্র। স্নেহের মৃত্যুর পর তাঁর মনে হয়েছিল, "স্নেহকে লেখাপড়া না শিখাইলে সে বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার অদৃষ্ট বহন করিতে পারিত, আপনার অধঃপতন মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিত না।" এ কথা লেখিকারও কথা। যুক্তি যদি ভেতর থেকে মনকে নাড়া দেয় তাহলে উপেক্ষিত জীবনের বঞ্চনা ও ক্ষোভকে অদৃষ্ট বলে মেনে নেবার অপরিসীম শক্তির ভিত আসে দুর্বল হয়ে। নারী হয়ে স্বর্ণকুমারী এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারেননি। তাই বিধবাদের আত্ম-নির্ভরতা এবং অর্থোপার্জনের পথ দেখিয়ে দিলেই যে সব হলো না সেটা তিনি জানতেন। 'হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রমে'র জন্যে লেখা 'নিবেদিতা' নাটকেও তিনি এই সমস্যার আরেকটি কুৎসিত রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে কোথাও তিনি সমাধানের পথ দেখতে পারেননি এমনকি সে চেষ্টাও করেননি। তবু মনে হয় তিনি বিধবা মেয়েদের সমাজের মধ্যে সসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সম্মানের পরিবর্তে শুধু অন্নের সংস্থান, অর্থোপার্জন, শিক্ষা এমন কি পুনর্বিবাহও তাঁর মতে, কোন নারীকে পূর্ণ করে তুলতে পারে না। স্বর্ণকুমারীর সমসাময়িক আরো কয়েকজন লেখিকা সামাজিক উপন্যাস লিখে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এঁদের একজনের নাম কুসুমকুমারী দেবী ও অপরজন শরৎকুমারী চৌধুরাণী। কুসুমকুমারীর 'স্নেহলতা', 'প্রেমলতা' ও 'শান্তিলতা' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রশংসা লাভ করেছে। শরৎকুমারীকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

স্বর্ণকুমারীর অপর জনপ্রিয় উপন্যাসটির নাম 'কাহাকে'। এখানে স্বর্ণকুমারী সমস্ত পুরুষালি ঢং বিসর্জন দিয়ে শুধু একটি মেয়ের ভালোবাসার কথা শুনিয়েছেন। স্বর্ণকুমারীর লেখায় যাঁরা নারীসুলভ রমণীয়তা পাননি 'কাহাকে' তাঁদের সন্তুষ্ট করেছে। অন্য কোন সমস্যা এখানে নেই আছে শুধু একটি আধুনিকার আত্মকথন। শিক্ষিতা আধুনিকা নায়িকা নিজেকে বিশ্লেষণ করে ভালোবাসার স্বরূপ সন্ধান করেছে। নারীসুলভ স্বাভাবিক লজ্জা ও সংস্কারকে বর্জন করে স্বর্ণকুমারী যেভাবে নারীমনকে বিশ্লেষণ করেছেন তার তুলনা এ যুগেও খুব বেশি মেলে না।

সাধারণ জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে হয়তো তাঁর পরিচয় কিছু কম ছিল কিন্তু মনোবিশ্লেষণ দিয়ে তিনি সেই অভাবকে পূর্ণ করে দিয়েছেন। অনেকেই 'কাহাকে' উপন্যাসে লেখিকার নিজস্ব পরিবেশ অর্থাৎ তৎকালীন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পরিবেশ খুঁজে পেয়েছেন। লেখিকার নিজের পরিবেশ বলেই 'কাহাকে' এত জীবন্ত এ ধারণাও করা হয়। স্বর্ণকুমারীর নিজের জীবনের সঙ্গে নায়িকার সাদৃশ্য না থাকলেও এ পরিবেশে তিনি যে খুব স্বচ্ছন্দ সে কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। 'কাহাকে' শুধু বাঙালী পাঠকদের ভালো লেগেছিল তা নয় বিদেশীদেরও মন ছুঁয়েছিল।

উনিশ শতকে ইংরেজীতে নভেল লেখার একটা রেওয়াজ ছিল। সে সময় অনেকেই ইংরেজী উপন্যাস লিখতেন, কেউ কেউ নিজেদের বাংলা লেখা অনুবাদ করে নিতেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেওয়া যায় ইংরেজী ভাষাটা তখনকার ছেলেমেয়েদের কাছে শক্ত ছিল না। যে কোন ধনী পরিবারে ছোট বেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের ইংরেজী পড়ানো হতো। পড়ার বইও লেখা হতো ইংরেজীতে। গভর্ণেস বা শিক্ষয়িত্রী হতেন বিদেশিনী। কাজে কাজেই ইংরেজী ছিল শাসক ইংরেজের মতোই বাঙালীর কাছের জিনিষ। মহিলারাও ইংরেজী ভাষায় উপন্যাস লিখতেন। এ সময় কতজন লেখিকা ছিলেন প্রশ্ন জাগতে পারে। ১৮৫০ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে ১৯৪ জন লেখিকার নাম পাওয়া যায়। তাছাড়া বোধহয় আরো জন পঞ্চাশেক লেখিকা ছিলেন যাঁরা নাম প্রকাশ করতে চাননি। সুতরাং স্বর্ণকুমারীকে একাকিনী ভাবলে ভুল করা হবে।

যাইহোক, কথা হচ্ছিল উপন্যাসের অনুবাদ নিয়ে। এ ব্যাপারে স্বর্ণকুমারী বেশ উৎসাহী ছিলেন। তাঁর দুটো উপন্যাস, চোদ্দটা গল্প ও একটা নাটক অনূদিত হয়। সবচেয়ে প্রথমে ক্রিস্টিনা আলবার্স অনুবাদ করেন 'ফুলের মালা'। মডার্ণ রিভিউ-এ "দি ফ্যাটাল গারল্যাণ্ড" নামে ছাপা হয়। 'ফুলের মালা' উপন্যাস হিসেবে খুব সার্থক হয়নি। খুব সম্ভব সেজন্যেই রবীন্দ্রনাথের এই অনুবাদ সম্বন্ধে ভালো ধারণা ছিল না। ১৯১৩ সালে কবি যখন ইংলণ্ডে তখন স্বর্ণকুমারী তাঁর কাছে এই বইটি পাঠান, হয়তো বিদেশের বাজারে একটু পরিচিত হবার

জন্যেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমত জানালেন:

"আমি জানি এ বই প্রকাশ করবার চেষ্টা এখানে সফল হবে না। তাছাড়া তর্জমা খুব ভালো হয়েছে তা নয়—অর্থাৎ ইংরেজি রচনার উচ্চ আদর্শে পৌঁছয়নি।" [২৮. ১. ১৯১৩]

তাঁর একই মন্তব্য শোনা গেছে ইন্দিরাকে লেখা চিঠিতেও। কবি তাঁকে লিখেছেন:

"নদিদি আমাকে তাঁর 'ফুলের মালা'র তর্জমাটা পাঠিয়েছিলেন। এখানকার সাহিত্যের বাজার যদি দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন এসব জিনিষ এখানে কেন কোনমতেই চলতে পারে না। এরা যাকে reality বলে সে জিনিষটা থাকা চাই।" [৬. ৫. ১৯১৩]

কবির পক্ষে এ নিয়ে কথা বলা মুস্কিল হয়েছিল এইজন্যে যে তাঁর কবিতা সে সময় বিদেশে যথাযোগ্য সম্মান পেয়েছে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো আর কারুর তুলনা চলতে পারে না। অথচ এ কথা বলতে গেলে ভুল বোঝার শংকা বেশি। তিনি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর অনেক বাঙালী লেখকের ধারণা হয়েছিল যে তাঁদের গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ হলে তাঁরাও উপযুক্ত সম্মান পেতে পারেন। এই ধরণের লেখকদের কথা বলবার সময় রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী সম্বন্ধেও শ্রদ্ধাপোষণ করেননি। তিনি রোটেনস্টাইনকে লিখেছিলেন,

"She is one of those unfortunate beings who has more ambition than abilities. But just enough talent to keep her mediocrity alive for a short period. Her weakness has been taken advantage of by some unscrupulous literary agents in London and she has had stories translated and published. I have given her no encouragement but I have not been successful in making her see things in their proper light."

কবি এ চিঠিটা কবে লিখেছিলেন জানা যায়নি। মনে হয়, এ সময়

স্বর্ণকুমারীর আরেকটি উপন্যাসের অনুবাদ "এ্যান্ আন্‌ফিনিস্ট সঙ" লণ্ডনে প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসটি 'কাহাকে'র অনুবাদ, অনুবাদিকা স্বর্ণকুমারী স্বয়ং। কোন কারণেই দমে না গিয়ে স্বর্ণকুমারী 'কাহাকে' অনুবাদ করেছিলেন। লণ্ডন থেকেই বইটি প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালের ডিসেম্বরে। ১৮৭৬-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯১৩-র ডিসেম্বর—দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে স্বর্ণকুমারী এসে দাড়ালেন শীতার্ত রজনীর তুষার-কুয়াশাঢাকা লণ্ডনবাসী পাঠকের কাছে। তাঁরা দেখলেন, একটি বিদেশী বই, শেষ ক'রে মনে হলো অসমাপ্ত গানের কলি যেন। ঝরে পড়লো মুগ্ধ পাঠকের প্রশংসাবাণী :

Remarkable for the picture of Hindu life the story is overshadowed by the personality of the authoress, one of foremost Bengali writer to-day." (Clarion)

আর একটু সোচ্চার প্রশংসা করলেন "ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেটে'র" সম্পাদক :

"Mrs. Ghosal, as one of pioneers of the women movement in Bengal, and fortunate in her own upbring, is well qualified to give this picture of a Hindu maiden development."

রবীন্দ্রনাথ যে কেন এত আশংকা করেছিলেন বোঝা যায় না। তাঁর সমস্ত অনুমানকে অমূলক প্রমাণ করে ১৯১৪ সালে "এ্যান্ আন্‌ফিনিস্ট সঙ"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ঐ একই কোম্পানী থেকে। সুতরাং সাময়িকভাবে হলেও স্বর্ণকুমারী বিদেশীদের আকৃষ্ট করেছিলেন। 'কাহাকে'র আরো একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সেটি কলকাতা থেকে ১৯১০ সালে "টু হুম" নামে প্রকাশ করা হয়। 'টু হুমে'র অনুবাদিকা স্বর্ণকুমারীর ভাইঝি শোভনা। দুটো অনুবাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারীর লেখাটিই বেশি স্বচ্ছন্দ। এছাড়াও "দিব্যকমল" নাটকটি অনূদিত হয় জার্মান ভাষায় "প্রিন্সেস কল্যাণী" নামে। সুতরাং স্বদেশে-বিদেশে সর্বত্রই স্বর্ণকুমারী লেখিকার সম্মান অর্জন করেছিলেন।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ লেখক খ্যাতি তাঁরাই পান যাঁরা উপন্যাস লেখেন।

স্বর্ণকুমারী সফল উপন্যাস রচয়িত্রী হলেও তিনি আরো অনেক কিছু লিখতেন। তাঁর লেখা ছোট গল্পও বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যদিও বাংলায় সার্থক ছোট গল্প প্রথম লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আগে যাঁরা গল্প লিখেছেন তাঁরা জানতেনও না তাঁদের নতুন রচনাটিকে কি নামে ডাকা হবে। তাই স্বর্ণকুমারীর লেখা গল্প 'কুমার ভীমসিং'কে কখনও বলা হয়েছে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' আবার কখনও 'ঐতিহাসিক নাটক'। বাংলা ছোটগল্পের যখন এই রকম অবস্থা তখন স্বর্ণকুমারী বাঙালী মেয়েদের নিয়ে বেশ কয়েকটা ছোটগল্প লিখেছিলেন। 'মালতী', 'লজ্জাবতী', 'গহনা'র ভাবিনী, 'যমুনা' 'প্রতিদিনের শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে' লুকিয়ে থাকে, হারিয়ে যায়। স্বর্ণকুমারী আঁকলেন তাদেরই লজ্জানত-দ্বিধাজড়িত মুখের ছবি। এসব ছবি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সমাজ-সেবা করতে করতে।

'সখিসমিতি'র কথা আগেই বলেছি। স্বর্ণকুমারী অন্যান্য লেখিকাদের সব সময়েই উৎসাহ যোগাতেন। সেযুগে লেখিকারা প্রায়ই ছিলেন একে অপরের সখি বা 'সই'। পুরুষের ক্ষেত্রে হয়তো প্রতিযোগিতা ছিল কিন্তু মেয়েরা ছিলেন মেয়েলী ঈর্ষার ঊর্ধ্বে। একজন লেখিকাকে কোন সময়েই অপর লেখিকার কঠোর সমালোচনা করতে দেখা যায়নি। স্বর্ণকুমারীর অনেক সখি—শরৎকুমারী তাঁর 'বিহঙ্গিনী' সই, মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী তাঁর 'মিলন-বিরহ' সই—এরকম আরো অনেক সখি ছিল। 'সখিসমিতি'র উদ্যোগেই সর্বপ্রথম শিল্পমেলা হয়। স্বর্ণকুমারী চেয়েছিলেন মেয়েদের হাতের কাজকে শিল্পের মূল্য দিয়ে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে। এতদিন হাতের কাজ শুধু ঘরের শোভা বাড়িয়েছে, সমাজে কৌলিন্য পায়নি। শিল্পীও পায়নি প্রাপ্য সম্মান। শিল্পমেলায় সেই সুযোগ এলো। বেথুন কলেজ প্রাঙ্গণে বসলো মেলা। রবীন্দ্রনাথ লিখে দিলেন অভিনয়োপযোগী একটা নাটক "মায়ার খেলা"। মেয়েরাই অভিনয় করলেন তাতে; দর্শকও শুধুই মেয়েরা। তাঁদের সেই উৎসাহ-আনন্দ-উদ্দীপনার বুঝি তুলনা হয় না। অভিনয় ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাই করলেন, বাইরের দু একজনও হয়তো ছিল। কিন্তু হাতের কাজের পুরস্কার পাবার সময় দেখা গেল ঠাকুর-বাড়ির মেয়েদের হারিয়ে দিয়ে প্রথম পাঁচটি পুরস্কারই পেলেন ভিন্ন মেয়েরা।

প্রথম বছর (১২৯৫) যাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন তাঁদের নাম ও শিল্পকর্মের বিবরণ পাওয়া গেছে। যেমন,

প্রথম পুরস্কার—মিস মানুক "রঞ্জিতের বেত্রসেতুর ছবি"

দ্বিতীয় পুরস্কার—শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দাসী "ক্ষীরের ফুলশয্যা ও খোদিত প্রস্তরছাপ"

তৃতীয় পুরস্কার—শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী "মাটির গ্রাম্যছবি ও কার্পেটে দেবী চৌধুরানী"

চতুর্থ পুরস্কার—মিস সরকার "সুতার সূক্ষ্ম কারুকার্য"

পঞ্চম পুরস্কার—শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাস "জরীর কাজ"

এঁদের মধ্যে তৃতীয় পুরস্কার পান কবি গিরীন্দ্রমোহিনী।

সখির মতো স্বর্ণকুমারীও কবিতা লিখতেন, গান লিখতেন আর লিখতেন গাথা। আজকাল গাথা লেখার দিন শেষ হয়ে গেছে কিন্তু উনিশ শতকে একটা কাহিনী নিয়ে কবিতা লেখাকে বলা হতো গাথা। শরৎকুমারীর স্বামী অক্ষয় চৌধুরী গাথা রচনার সূত্রপাত করলে রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী ও আরো অনেকে গাথা লেখায় মন দিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারীর গাথা পড়ে দু-একটা পত্রিকা বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আজকের দিনে সেসব রচনা মোটেই সাড়া জাগাতে পারে না এমন কি তাঁর সুন্দর গানগুলোও নয়। তবে এখনও যে স্বর্ণকুমারী কয়েকটা ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আছেন তার প্রথমটি হলো পত্রিকা সম্পাদনা ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা। আজও কোন লেখিকা কোন নীরস তথ্যভারাক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে রাজী হবেন কিনা সন্দেহ। এই দুটি ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী যেন পুরুষোচিত বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলায় মহিলা পরিচালিত সাময়িকপত্রের সংখ্যা কম নয়। ১৮৭৫ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অন্ততঃ ২৬ জন সম্পাদিকার আবির্ভাব হয়েছিল। বলাবাহুল্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন স্বর্ণকুমারী। ঠাকুরবাড়ির আরো অনেক মেয়ে এবং বৌ পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার কাজে এগিয়ে এসেছেন,

তবে সে অনেক পরে। জ্ঞানদানন্দিনীর কথা আগেই বলেছি। তিনি ছাড়াও ইন্দিরা, হিরন্ময়ী, সরলা, প্রতিভা, প্রজ্ঞা, হেমলতা ও আরো অনেকে সম্পাদিকা হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

১৮৭৫ সালের জুলাই মাসে থাকমণি দাসীর সম্পাদনায় প্রথম মহিলা পরিচালিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তবে থাকমণি বোধহয় ছিলেন নামে মাত্র সম্পাদিকা। তাঁর বাবা এই পত্রিকা বার করেছিলেন। এর বছর দুই পরে ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হয় 'ভারতী'। সাত বছর পরে, কাদম্বরীর আকস্মিক মৃত্যুর পর স্বর্ণকুমারী এই পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। তিনি যে একজন ভালো সম্পাদিকা একথা হয়তো জানাই যেত না, যদি না কাদম্বরীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটতো। শরৎকুমারীর ভাষায় এই দুর্দিনে তিনি "নারীর পালন শক্তির পরিচয় দিলেন।" শুধু কি তাই? এই 'ভারতী'র জন্যেই স্বর্ণকুমারীকে লিখতে হলো নতুন নতুন প্রবন্ধ, নাটক, প্রহসন কত কী!

মহিলা নাট্যকারের কথা বলেছি। কিন্তু তাঁরা যে কোনদিন প্রহসন লিখবেন সেটা অনেকেই আশা করেনি। স্বর্ণকুমারী অনেকগুলো নাটক ছাড়া লিখেছেন দুটি প্রহসন। কারুণিক প্যাটার্নের গল্প-উপন্যাস লিখতে লিখতে তিনি যে হাসাতেও পারেন তারই দুটি সার্থক উদাহরণ হয়ে দাঁড়ালো 'পাকচক্র' আর 'কনেবদল'। এছাড়া তিনি লিখেছেন অনেকগুলো 'শারাড'। 'শারাড' কথাটা শুনতে যত অপরিচিত লাগছে আসলে তা নয়। খানিকটা রঙ্গকৌতুক পরিবেশনই এর লক্ষ্য। অভিনয়ের মধ্যে থেকে দর্শককে হেঁয়ালিটি বার করতে হয়। যেমন ধরা যাক 'পাহাড়' কথাটি। একজন সাজলেন রোগী তার পায়ের হাড় ভেঙেছে। ডাক্তার এসে তার পা টিপে টাপে দেখলে; দর্শক বুঝলো এর মধ্যে 'পাহাড়' কথাটি লুকিয়ে আছে। স্বর্ণকুমারীর 'বৈজ্ঞানিক বর' ও 'লজ্জাশীলা' 'শারাড' হিসেবে অতুলনীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো স্বর্ণকুমারীও একসঙ্গে সৃষ্টি ও সংস্কারের কাজে হাত দিয়ে উপন্যাসের রম্যজগৎ ছেড়ে নেমে এসেছিলেন প্রবন্ধ লেখার দুরূহ কাজে। তাই, 'পৃথিবী'র মতো কষ্টসাধ্য প্রবন্ধ লেখার পেছনেও তাঁর আন্তরিকতাটুকু চোখে

পড়ে। এমন বিষয় নিয়ে, এই বকেট নিয়ে গ্রহান্তরে ছুটে যাবার যুগেও, মেয়েরা বড়ো একটা প্রবন্ধ লেখেন না। হয়তো মহাবিশ্বলোকের ইশারায় কেঁপে ওঠে না তাঁদের অন্তর। অথচ স্বর্ণকুমারী বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লেখার কাজে হাত দিয়েছিলেন বঙ্কিমের 'বিজ্ঞানরহস্য' প্রকাশের মাত্র সাত বছর পরে, রামেন্দ্রসুন্দর তখনও সাহিত্যের আসরে নামেননি। এমন সময় স্বর্ণকুমারী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভূবিজ্ঞানীদের মতামত সংকলন করে সাতটি প্রবন্ধ লিখে বাঙালী মেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞানালোচনার সূত্রপাত করেন। এসময় স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে স্কুলপাঠ্য ভূগোল ও বিজ্ঞানের নানারকম বই বেরিয়েছে। কিন্তু স্বর্ণকুমারী প্রবন্ধগুলি লেখেন নবজাগ্রত বাঙালী মানসে পৃথিবী সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের যথাসম্ভব ভালো উত্তর দেবার জন্যে।

বাংলায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখবার সময় স্বর্ণকুমারী একটা কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেটি হলো বাংলা পরিভাষার অভাব। পারিভাষিক শব্দের অভাবে বাংলায় লাপ্লাস্, হারসেল, টমসন্, নর্মাণ, লাকিয়ার, গডফ্রে, ব্যালফোর, ফিগুয়ে প্রভৃতি ভূবিজ্ঞানীর মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে স্বর্ণকুমারী প্রথমে বেশ বিপদে পড়েছিলেন। তাই নিজেই কিছু পরিভাষা সৃষ্টি করেন। তাঁর তৈরি করা পরিভাষার সংখ্যা কম নয়, তবে তাঁর ঝোঁক ছিল সহজ ও সুশ্রাব্য শব্দের দিকে। যেমন—

ফার্ণ = পর্ণীতরু

পেনামব্রা = উপচ্ছায়া

সেন্‌সিটিভ = মোহিষ্ণু

সোলার স্পট = সূর্যবিম্ব

পিগমি = বালখিল্য

ট্রায়াসিক = ত্রিস্তর

য়ুনিভার্স = বিশ্বাকাশ

হিপ্‌নোটিস্‌ম্ = স্বাপ্নিকতা

ডিডাক্‌সন = অবরোহ

এইজাতীয় পরিভাষা স্বর্ণকুমারীর সুনির্বাচিত শব্দচয়নে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

সাহিত্যচর্চা ও সমাজ-সেবার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণকুমারী যোগ দিয়েছিলেন কংগ্রেস অধিবেশনে। তাঁর স্বামী জানকীনাথ ছিলেন ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা। স্বামীর সঙ্গে স্বদেশপ্রেমে দীক্ষা নিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী। তিনি কংগ্রেসের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিবেশনে যোগদান করেন। ঐ অধিবেশনে আরেকজন মহিলাও যোগ দিয়েছিলেন, তিনি প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁরও কোন যোগ ছিল না তবে তৎকালীন নারী সমাজে তিনি রীতিমতো আলোড়ন জাগিয়েছিলেন। কাদম্বিনী যেখানে যেতেন সেখানেই ভিড় জমে যেত তাঁকে দেখবার জন্য। স্বর্ণকুমারীর স্বদেশ চিন্তা তাঁর শেষ জীবনে লেখা উপন্যাসত্রয়ীতে যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ছোট মেয়ে সরলার জীবনে। এমনকি তিনি ভেবেছিলেন সরলার বিয়ে দেবেন না, তাঁকে স্বদেশসেবায় উৎসর্গ করবেন। বিদেশের বিশেষতঃ ইংলণ্ডে মেয়েদের স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা এমনকি রাজনৈতিক কার্য-কলাপে অংশগ্রহণ সব কিছুই স্বর্ণকুমারীর ভালো লাগতো। তিনি জানতেন পুরুষেরা এজন্য বিরক্তি প্রকাশ করে, ঠাট্টা তামাসা করে কিন্তু "তাদের সম্মানের চক্ষেই দেখে, তাদের হাতেই কলের পুতুলের মতো নাচে।" ভারতের মেয়েরা কি এভাবে এগিয়ে আসবে না? যদিও স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যকৃতি কোন পুরস্কারের মুখাপেক্ষী ছিল না তবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। এই পদকের প্রথম প্রাপক স্বর্ণকুমারীর ছোট ভাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। যতদূর জানি তিনিই প্রথম নারী, যিনি এই স্বর্ণপদক লাভ করলেন। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে তাই স্বর্ণকুমারীর উজ্জ্বলতাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে।

যেখানে স্বর্ণকুমারী ও জ্ঞানদানন্দিনীর শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছিল সেই ঠাকুরবাড়ির ঘরোয়া স্কুলটিতে আবার ফিরে যাওয়া যাক। এই ঘরোয়া স্কুলে কেউ স্পেশাল ক্লাস যদি করে থাকেন তবে তিনি নীপময়ী। প্রবল বিদ্যানুরাগী

হেমেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে সাধ পূর্ণ করেছিলেন তাঁর মেয়েরা। নীপময়ীই কি অপূর্ণ রেখেছিলেন স্বামীর মনোবাসনা? জ্ঞানদানন্দিনীর মতো নীপময়ী কোন হৈচৈ তোলেননি সত্যি, তবু এই বিরাট বাড়িটির অন্দরমহলে নারী জাগরণের কি রকম প্রস্তুতি চলেছিল, কি ভাবে তাঁদের স্বামীরা তাঁদের গ্রহণ করতেন জানবার জন্যেই পেছন ফিরে তাকানো যেতে পারে।

নীপময়ী দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধু হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে। তাঁর ছোট বোন প্রফুল্লময়ীও ঠাকুরবাড়ির বৌ হয়েছিলেন। হরদেব বন্ধুর অনুরোধে সৌদামিনীর সঙ্গে তাঁর নিজের দুই মেয়েকেও বেথুনে পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য যাঁরা বেথুনে পড়তে গিয়েছিলেন তাঁরা নীপময়ী-প্রফুল্লময়ী নন, তাঁদের দিদি অন্নদা ও সৌদামিনী। মহর্ষি এবং হরদেব দুই বন্ধু হলেও তাঁদের মধ্যে সামাজিক অবস্থার দুস্তর প্রভেদ ছিল। তাই নীপময়ীর বিয়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়নি। খুব গণ্ডগোল দেখা দেয়।

গণ্ডগোল হবে নাই বা কেন? হরদেব চট্টোপাধ্যায় কুলীন ব্রাহ্মণ, তিনি ব্রাহ্ম মতে পিরালী ব্রাহ্মণের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলে জ্ঞাতি কুটুম্বেরা দিশাহারা হয়ে ভাবলেন তাঁদের সবারই জাত যাবে। জাতকুল রক্ষার তোড়জোড় চললো ভালোমতো। হরদেবের বড়ো ছেলে স্ত্রী পুত্র নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন অন্য জায়গায়। শিশু পৌত্রের জন্যে বুকটা ফেটে গেলেও সংকল্পচ্যুত হলেন না হরদেব। দেবেন্দ্র যে তাঁর প্রাণের বন্ধু, তাঁর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন, সেখানে সমাজ বাধা দেবার কে? এখন সমাজের ক্ষমতা আর তত নেই। এই তো সেদিন এক কুলীনের বউ স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করে খোরপোষ আদায় করলেন, খুব বেশিদিনের কথা নয়, মাত্র ১৮৫৬ সালের ঘটনা। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ দিয়েছেন। তেরো সতীনের ঘর করবেন না বলে বাড়ি থেকে ফেরার হলেন বিধুমুখী। সমাজ কি তাঁকে জোর করে ধরে এনে সংসার খাঁচায় পুরতে পেরেছে! হরদেব ভয় পেলেন না।

অপর পক্ষও যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিল তা নয়। একশ জন লাঠিয়াল নিয়ে

তাঁরা তৈরি হলেন যাতে বর এলেই লাঠির ঘায়ে তাঁর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়ে কনেকে তুলে নিয়ে চম্পট দেওয়া যায়। তারপর? হয়তো দ্বাদশী নীপময়ীর জন্যে এক অন্তর্জলী যাত্রী কুলীন পাত্রকেও তাঁরা জোগাড় করে রেখেছিলেন; তবে ব্যাপারটা এতদূর গড়াতে পারেনি। খবরটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় পুলিশ-পাহারা বসলো বিয়েবাড়িতে। গোধূলি লগ্নে বরবেশে এলেন হেমেন্দ্রনাথ। যেমন রূপ তেমনি সাজের বাহার, দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল যেন। বেনারসী জোড়ের ওপর নানারকম গয়না—গলায় মুক্তোর মালা, হীরের হার, হাতে বালা, আঙ্গুলে নানারকম আংটি ঝলমল করছে। বালিকা প্রফুল্লময়ীর মনে হয়েছিল বরবেশে বুঝি মহাদেব এসেছেন তার দিদিকে বিয়ে করতে।

সালঙ্কারা নীপময়ী হেমেন্দ্রকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে পরিয়ে দিলেন বরণমালা। ব্রহ্মোপাসনা শেষ করে তাঁরা বাসরে প্রবেশ করলেন। কৌতূহল হলে সেখানেও একটু উঁকি মেরে আসা চলে; কারণ হেমেন্দ্র 'আমার বিবাহ' পুস্তিকায় সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ লিখে রেখেছেন। ব্রাহ্ম বিবাহ বলে বাসরে অব্রাহ্ম মহিলারা আসেননি। তাই হেমেন্দ্রকেও "অব্রাহ্মিক পরিহাস" সহ্য করতে হয়নি। শুধু তাই নয় পাছে তাঁরা কোন পরিহাস করেন সেই ভয়ে হেমেন্দ্র স্ত্রীশিক্ষার প্রসঙ্গ তুললেন এবং তাঁদের বাড়ির অনেক মেয়ে সংস্কৃত ও ইংরেজী পড়তে পারেন বলে সমবেত মহিলাদের অবাক করে দিলেন। হেমেন্দ্রের এই উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সেকালে সব ব্রাহ্ম মহিলাই উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না। সাধারণতঃ আমরা ব্রাহ্মিকা বলতেই যা বুঝি তার বাইরেও অনেকে ছিলেন। সুকুমারী ও হেমেন্দ্রের এই ধরণের ব্রাহ্ম বিবাহ দেওয়ায় মহর্ষি ভবনের সামাজিক গণ্ডিটি আরো ছোট হয়ে এলো। কিন্তু সেদিকে তাকাবার সময় কারুর ছিল কি?

ঠাকুরবাড়িতে তখন নতুন ভাবের স্রোত বইছে। উৎসাহ-উদ্দীপনায় দিন কাটছে খেয়াল খুশির হালকা হাওয়ায় ওড়া পাখির মতো। বাইরের শিক্ষিত সমাজেও চলছে উৎসাহ উদ্দীপনা। সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন নিয়ে আসছে ব্রাহ্মসমাজ। কেশব সেন একদিন একদল ব্রাহ্ম মহিলাকে নিয়ে বরসন্ নামে

এক পাদ্রীব বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ বাখতে গেলেন। চায়ের পেয়ালায় তুফান রোজই ওঠে। হেমেন্দ্রও এই ফাঁকে একটা নতুন কাজ করলেন। তিনি স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখানোব সঙ্গে সঙ্গে গান শেখাবার ব্যবস্থা কবে দিলেন।

এমন দুর্জয় সাহসের কথা তখন কেউ ভাবতো না কারণ ভদ্রঘরের বাঙালী মেয়েরা মোটেই গান শিখতেন না। কবে থেকে এ ব্যবস্থা চালু হলো বলা মুস্কিল, হয়তো ঔরঙ্গজেবের সময় থেকেই গানের চর্চা বন্ধ হয়েছিল। বাংলাদেশে গান শিখতেন পুরুষেরা, গান শিখতো বাঈজীরাও। নটীব নূপুব নিক্কণে আব বাঈজীর কোকিল কণ্ঠেব কাছে বাবুরা নিজেদের সর্বস্ব বিকিযে দিলেও সমাজেব দিক থেকে ভদ্রঘরে মেয়েদের নাচগান শেখানো ছিল বড়ো নিন্দনীয়, গর্হিত ব্যাপার। মেয়েরা গান শোনার শখ মেটাতো বৈষ্ণবীদেব গান শুনে। তবে বাড়িব মধ্যে নিজের মনে তাঁরা গুনগুন করতেন না এ কথা মোটেই বিশ্বাস্য নয় কারণ স্বর্ণকুমারী আব কাদম্বরী দুজনেই গান জানতেন। তবে ওস্তাদী হিন্দুস্থানী গান সঙ্গীতজ্ঞের কাছে শেখেননি।

হেমেন্দ্রনাথ এ বাধা না মেনে স্ত্রীকে গান শেখাবাব জন্যে মহর্ষিব কাছে অনুমতি চাইলেন। মহর্ষির রক্ষণশীল মন প্রথমটায় বুঝি সায় দিতে চাযনি। কিন্তু যা সত্যিই মন্দ নয় তাকে তিনি বাধা দেবেন কেন? পিতাব অনুমতি পেয়ে হেমেন্দ্র বাড়ির গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে নীপময়ীব গান শেখার ব্যবস্থা কবে দিলেন।

তারপর?

তারপর কি হলো? যিনি একটা বড়োসড়ো সংবাদ হয়ে উঠতে পারতেন, যাঁকে নিয়ে সমাজপতিরা আব একবার হাঁ হাঁ করে সমাজকে রসাতলে পাঠাতে পারতেন, পড়োশিনীরা আর একবার গালে হাত দিয়ে ভাববার সুযোগ পেতেন তাঁকে নিয়ে একটা গুঞ্জন পর্যন্ত উঠলো না। কেন? মেজবৌ জ্ঞানদানন্দিনীর মতো নীপময়ী বাইরে ছড়িয়ে পড়েননি বলে? বিচিত্র মানুষের মন! দুই ভাইয়ের একজন স্ত্রীকে ভারতীয় নারীর আদর্শ করে তুলতে বিলেত পাঠান, আরেকজন স্ত্রীকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী করে তোলেন নীরবে নিভৃতে। জ্ঞানদা-

নন্দিনী যদি নারী জাতির আদর্শ হন নীপময়ীও তো তাই। তবু দুজনের মধ্যে কত প্রভেদ।

নীপময়ী সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়। এগারোটি সুযোগ্য-সার্থক সন্তানের জননী নীপময়ী গান জানতেন, ছবি আঁকতেন, নানা ভাষার বই পড়তেন, দেশী বিলিতি রান্না করতেন। আমরা জানি, নতুন বৌ এলে তাকে ঠাকুরবাড়ির আদব কায়দা শেখাবার ভার পড়তো নীপময়ীর ওপরে। মহর্ষির নির্দেশে ফুলতলির ভবতারিণীকেও গড়ে পিঠে মৃণালিনী করে তুলেছিলেন আর কেউ নয়, এই নীপময়ী। অথচ কোনদিন তাঁকে নিজের কথা বলতে শোনা গেল না। বোঝা গেল না সর্বগুণান্বিতা নীপময়ী জীবনকে কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। একথা সত্যি, তিনি বহির্জগতে কোন প্রভাব বিস্তার করেননি। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিতা বধূর মতোই তাঁর জীবন কেটেছে।

নীপময়ীর একটি সংবাদ আমাদের সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে সেটি হলো তাঁর ছবি আঁকা। সেদিন 'পুণ্য' পত্রিকায় নীপময়ীর একটা ছবি চোখে পড়লো। ১৩০৭ সালের 'পুণ্য'তে প্রকাশিত 'হরপার্বতী' অতি সাধারণ একটি ছবি। চিত্রশিল্পী হিসেবে নীপময়ী হয়তো কিছুই হতে পারেননি তবু জানতে ইচ্ছে করে বইকি। বাংলাদেশে ছবি আঁকার চর্চা প্রায় ছিলই না। পূর্ব যুগের পটশিল্প অবহেলায় হারিয়ে যাচ্ছিল। ভারতীয় শিল্পের অবস্থাও খুব ভালো নয়। এ সময় নীপময়ী ছবি আঁকা শিখছিলেন। সম্প্রতি ডঃ অমৃতময় মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে তাঁর মাতামহ ক্ষিতীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত একটি খাতা 'মহর্ষি পরিবার' দেখবার সুযোগ হয়েছিল। তাতে ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের কথা কিছু কিছু লিখেছেন, ছবি আঁকার কথাও আছে।

"মায়ের আঁকা ছবি এখনও আমাদের তিন ভাইয়ের ঘরে কয়েকখানা আছে। কালিদাস পালের শিক্ষকতায় মা ইরুদিদির একটা ছবি এঁকেছিলেন। তাছাড়া একটা ক্লিওপেট্রার ছবি এঁকেছিলেন। White সাহেবের শিক্ষকতায় দিদির ছবি এঁকেছিলেন।"

দুঃখের বিষয় নীপময়ীর আঁকা ছবিগুলি সবই নষ্ট হয়ে গেছে। বিবরণ পড়ে মনে হয় নীপময়ী এদেশী এবং বিদেশী চিত্রশিল্পীর কাছে ছবি আঁকা শিখলেও অঙ্কনশৈলীতে তাঁব নিজস্বতা কিছু ফুটে ওঠেনি। নীপময়ীব ছেলে-মেয়েরাও ভালো ছবি আঁকতেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের শিক্ষকদেব কথাও লিখেছেন। কালিদাস পালেব মাসিক বেতন ছিল ত্রিশ টাকা আর White পেতেন একশো টাকা।

ছবি আঁকা ছাড়াও নীপময়ী সেকালের সুপ্রসিদ্ধ বেণীমাধববাবুর কাছে শিখেছিলেন বাযা তবলা ও করতাল বাজাতে। নীপময়ীকে হেমেন্দ্রনাথ শেখাননি এমন বিষয় খুব কম ছিল। ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁকে মিল্টনের 'প্যাবাডাইস লস্ট' ও সংস্কৃতে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' পড়তে দেখেছিলেন। তবে নীপময়ীর সঙ্গীতচর্চা, চিত্রচর্চা, সবই নেপথ্যে বয়ে গেছে। শিক্ষার ফল শুধু দেখা গেছে তাঁব মেয়েদেব অসাধারণ গুণাবলীব মধ্যে। হয়তো তাঁর ছোট বোন প্রফুল্লময়ীও এমনি আড়ালে থেকে যেতেন যদি-না তাঁর স্মৃতিকথাটি আমাদেব কাছে পৌঁছে দিতেন সুধীন্দ্রনাথের বড়ো মেয়ে বমা। তিনিও জ্ঞানদানন্দিনী-স্বর্ণকুমারীর মতো কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে বাংলার মেয়েদেব চোখের সামনে কোন নজির সৃষ্টি করেননি। কিন্তু ঠাকুরবাড়িব অন্দরমহলে সর্বসুন্দরী, নীপময়ী, প্রফুল্লময়ীবাও তো ছিলেন।

প্রফুল্লময়ীর মতো হতভাগিনী নারীর সংখ্যা বেশি নেই। নাম তাঁব প্রফুল্লময়ী কিন্তু সারাটি জীবন তিনি চোখেব জল ফেলে ঘবেব কোণে বসে কাটিয়েছেন। রূপকথার রাজপ্রাসাদেব মতো এই বিশাল ঠাকুরবাড়ির একটা ঘরে যে এত অশ্রুবিন্দু জমাট বেঁধে পাথর হয়ে উঠেছে সে কথাই বা কে জানতো? জীবনের একেবারে শেষ পর্বে প্রফুল্লময়ী ব্যক্ত কবলেন নিজেকে। না কবলে ঠাকুরবাড়ির সমস্ত আনন্দ উল্লাস ছাপিয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণাক্লিষ্ট একটি অশ্রুসিক্ত অপরূপ মুখশ্রী কি কোনদিন স্পষ্ট হযে উঠত? সুখ-দুঃখ আর হাসি-কান্নার টানা-পোড়েনে তবেই না বোনা হয়েছে নারীজীবনের সার্থক ছবি।

প্রফুল্লময়ীব দুঃখ কোন সময়েই খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কি করে উঠবে? হঠাৎ-হারানোর হাহাকার রূপ পেতে পাবে, তিল তিল করে জমে ওঠা বুকভাঙ্গা বেদনার তো কোন রূপ নেই। অথচ প্রফুল্লময়ী পেয়েছিলেন সবই। ছোটবেলায পুণ্যিপুকুর ব্রত করবার সমষ সব মেয়েই যা চায সেই সব। দিদিব বিয়ে হয়েছে বড়ো ঘবে। মহাদেবের মতো সুন্দব ভগ্নিপতি। মাঝে মাঝে মাযের সঙ্গে দিদিকে দেখতে যেতেন ছোট্ট প্রফুল্লমযী। অবাক বিস্ময়ে দেখতেন দেউড়ি-দালানওয়ালা তিন মহলা বাড়িটিকে। কত ঘর, কত থাম, জানালা, বেলিং, দাস-দাসী, আসবাবপত্র, আলমারিতে সাজানো কাঁচেব-পুতুল—কত কী! তাঁকে দেখেও পছন্দ হয়ে গেল শরৎকুমারী ও স্বর্ণকুমারীব। কেমন স্বর্ণচাঁপাব পাপড়িব ফিকে সোনাব মতো চমৎকাব গায়েব বঙ, পদ্মের পাপড়িব মতো টানা টানা ডাগর দুটি ভ্রমরকৃষ্ণ চোখ, নিখুঁত মুখশ্রী, চমৎকার গড়ন, মিষ্টি গলা—আচ্ছা, বীবেন্দ্রর সঙ্গে বিয়ে দিলে কেমন হয়? যেমন ভাবা তেমন কাজ।

দুই বোনে তাড়াতাড়ি মেয়ে দেখার ব্যবস্থা করলেন। বীরেন্দ্র মহর্ষিব চতুর্থ পুত্র, অত্যন্ত মেধাবী, বিশেষ করে অঙ্কে অসাধারণ আসক্তি। সুদর্শন। বেশ মানাবে দুজনকে। তাই মেয়ে দেখাব প্রস্তাব। এর আগে ঠাকুরবাড়িতে মেয়ে দেখা হতো সাবেকীমতে। বাড়ির পুবনো ঝি খেলনা নিয়ে মেয়ে দেখতে যেত এবং তারা যাদের পছন্দ করে আসত তাদের সঙ্গেই বিয়ে হতো। কিন্তু দিন বদলাচ্ছে সুতরাং আধুনিক মেয়ে দেখাব পদ্ধতি যদি চালু করা হয় দোষ কি? একদিন প্রফুল্লমযী আসতেই দুই বোনে মিলে তাঁকে সাজিয়ে বীবেন্দ্রকে দেখাবার জন্য টেনেটুনে বাইরের দিকের বারান্দায় নিয়ে যাবাব চেষ্টা কবলেন। গ্রাম্য-বালিকা প্রফুল্লময়ী, তখন তাঁর লজ্জাই বেশি। কাজেই তিনি কিছুতেই বীরেন্দ্রের সামনে বেরোলেন না। কোন রকমে ভেতরের দিকে চলে এলেন। তাতে অবশ্য বিয়ে আটকালো না। অতি বৃদ্ধা বয়সে স্মৃতিকথা বলার সময় প্রফুল্লময়ীর সব কথাই মনে পড়েছিল। সেই সব সুখের দিনের স্মৃতি!

এক ফাল্গুনী অপরাহ্ণে দিদির মতোই একহাত ঘোমটা টেনে তাঞ্জামে চেপে প্রফুল্লময়ী এলেন স্বামীর ঘরে। শাশুড়ী-ননদ-জা-দিদির আদরে দিনগুলো

শুরু হলো স্বপ্নের মতো। ঠাকুরবাড়ি থেকে নতুন বৌ যৌতুক পেলেন গা-ভরা গয়না। গলায়—চিক, ঝিলদানা, হাতে—চুড়ি, বালা, বাজুবন্দ, কানে—মুক্তার গোচ্ছা, বীরবৌলি, কানবালা; মাথায়—জড়োয়া সিঁথি; পায়ে—গোড়ে, পাঁয়জোড়, মল, ছানলা, চুটকী, কোমরে—দশ ভরির গোট আরো কত কী! মনে হলো সুখের বুঝি সীমা নেই।

স্মৃতিচারণের সময় প্রফুল্লময়ী ঠাকুরবাড়ির ছোট ছোট ছবি এঁকেছেন। সে ছবিগুলি আশ্চর্যরকমের ধবোযা। বাড়ির মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন হচ্ছিল, নারী পুরুষ সকলেই প্রগতির নেশায় মেতে উঠেছিলেন, প্রফুল্লময়ীর লেখা পড়ে তা বোঝাই যায় না। প্রফুল্লময়ী জানাচ্ছেন সাবেকী সব বাড়িতে যেমন হয়, তাঁদের বাড়িতেও ননদ-জায়েরা সবাই মিলে একসঙ্গে খেতে বসতেন। গাঁয়ের মেয়ে বলে প্রফুল্লময়ী টানতেন দীর্ঘ ঘোমটা। একহাত ঘোমটার মধ্যে তিনি কি করে খান ভেবে না পেয়ে লুকিয়ে-ঝুঁকিয়ে উঁকি মারতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং "খাওয়ার রকম দেখিয়া থাকিতে না পারিয়া নানারকম ঠাট্টা করিতে ছাড়িতেন না।"

এরকম করেই দিন কাটছিল। মিষ্টি গলা বলে তাঁর গান শেখারও ব্যবস্থা হলো। কিন্তু চার বছর পরে সমস্ত সুখস্বপ্ন মিলিয়ে গেল ক্ষণিক বুদ্বুদের মতো। স্নান আহার ত্যাগ করে দিনে দিনে অস্বাভাবিক হয়ে উঠলেন বীরেন্দ্র। ক্রমশই অস্থিরতা বাড়তে বাড়তে রূপ নিলো পাগলামির। লোকে বলে অঙ্ক কষতে কষতে বীরেন্দ্র পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। ঘরের চার দেয়ালে বড়ো বড়ো অঙ্ক কষে রাখতেন কাঠকয়লা দিয়ে। শোনা যায়, একজন ইংরেজ অঙ্কবিদ সেই অঙ্কগুলি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। কিন্তু অন্য সময়ে বীরেন্দ্রের মধ্যে এই স্থিরতা ছিল না। প্রচণ্ড সন্দেহের বিষে সবাইকে জর্জরিত করে তুলতেন। জোর করে তাঁকে এক চামচ ভাত বা একটি পটোল পোড়া খাওয়াতে হিমসিম খেতে হতো সবাইকে। এমনি করে আরো তিন বছর কাটে কিন্তু প্রফুল্লময়ীর ভাঙ্গা কপাল আর জোড়া লাগেনি। ধীরে ধীরে অতি অকালে ম্লান হয়ে আসে সদাহাস্যময়ী মুখখানি।

বাড়িতে যখন 'বসন্ত-উৎসব' আব 'পুনর্বসন্তে'র মহড়া চলছে পুরোদমে, প্রফুল্লময়ীর চোখে তখন ঘন বর্ষার শ্রাবণধারা। মাঝে মাঝে বড়ো বিস্ময় লাগে। কেন এমন হয়? কি করে হয? কিন্তু ভবা ভোগেব প্রাচুর্যের মধ্যে বদ্ধদুয়ার ঘরে একটি মেয়ের তিল তিল কবে শুকিয়ে যাওয়া চিবদিন কে মনে রাখে? প্রথমে দুঃখ পায়, সান্ত্বনা দেয়। তারপব ভুলে যায। এ ঘটনা তো যে কোন বাড়িতে ঘটে। কিন্তু ঠাকুববাডির মতো আলোকপ্রাপ্ত পবিবাবেও এর কোন পবিবর্তন হলো না? উন্নতমনা মহর্ষিও কি এই বিষাদ প্রতিমাটিকে কোন ভাবে সার্থক হয়ে ওঠার পথ দেখাতে পাবতেন না? প্রফুল্লময়ী সমস্ত শোক তাপের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন অধ্যাত্ম চিন্তাব মধ্য দিয়েই। কিন্তু সে তাঁর একান্ত নিজস্ব উপলব্ধি, মহর্ষিব উপদেশ বা সান্ত্বনাবাক্য কোনদিন তাঁর পাথেয় বা পথেব দিশাবী কোনটাই হয়ে উঠেছিল বলে শোনা যাযনি।

এত দুঃখের মধ্যেও প্রফুল্লময়ীব ভাগ্য মাঝে কিছুদিন সুপ্রসন্ন হয়েছিল। না হলে অন্ধেব নড়ির মতো রুগ্ন সন্তান বলেন্দ্রনাথেব অল্প বয়সেই এত নামডাক হবে কেন? কিছুদিন পরে টুকটুকে বউ হয়ে এলেন সুশীতলা বা সাহানা। এবার বোধহয় দুঃখ ঘুচলো। প্রফুল্লময়ী আপনমনে স্বামীব পরিচর্যা করেন। ছেলে ও ছেলের বৌকে নিযে স্বপ্ন দেখেন। আবার বাদ সাধলেন বিধাতা। মাত্র কদিনেব জ্বরবিকারে শয্যা নিলেন বলেন্দ্র। যমে-মানুষে টানাটানি চলে কদিন। হিতাহিত জ্ঞান হাবালেন প্রফুল্লময়ী। তাবপর এলো সেই দুর্যোগ-ভরা ভয়ানক রাত্রি। ঘরে বাইবে অশ্রুর তুফান। বলেন্দ্রের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে। তাব যন্ত্রণা চোখে দেখতে না পেবে বাইবে গিযে বসছেন হতভাগিনী জননী। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ এসে বললেন, "তুমি একবার তার কাছে যাও।" প্রফুল্লময়ী জানতেন এ ডাক আসবে। তা বলে 'এত শীঘ্র'! পুত্রের মৃত্যুশয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন প্রফুল্লময়ী।

"সব শেষ হইয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছে। সূর্যদেব ধীরে ধীরে কিরণচ্ছটায় পৃথিবীকে সজীব করিয়া তুলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাহার জীবনদীপ নিভিয়া গেল।"

প্রফুল্লময়ী সব আঘাত সহ্য করলেন শান্ত মুখে, ষোড়শী পুত্রবধূর মুখ চেয়ে। এমনই তাঁর কপাল যে পুত্রবিয়োগ ব্যথায় তিনি শোকে তাপে ভেঙ্গে পড়েননি বলে বাড়ির সবাই আশ্চর্য বুঝি-বা বিরক্তও হলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে লিখলেন, "নবোঠানের এক ছেলে, সংসারের একমাত্র বন্ধন নষ্ট হয়েছে তবু তিনি টাকাকড়ি কেনা বেচা নিয়ে দিনরাত যে রকম ব্যাপৃত হয়ে আছেন তাই দেখে সকলেই আশ্চর্য এবং বিরক্ত হয়ে গেছে—।" কবি চিঠিটা লিখেছিলেন বলেন্দ্রের শ্রাদ্ধের আগের দিন। প্রফুল্লময়ীর স্মৃতিকথা পড়ে মনে হয় কেনা বেচা কাজ কর্ম নিয়ে তিনি দুঃখ ভোলার চেষ্টা করেছেন। নয়তো তিনি জল-ঝড় উপেক্ষা করে বলেন্দ্রের ঘরের সামনে দিনরাত পড়ে থাকতেন কেন?

এরপরেও পুত্রবধূর মৃত্যু, স্বামীর মৃত্যু, ভাইয়ের মৃত্যু, বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অর্থাভাব প্রভৃতি নানান্ বিপর্যয় প্রফুল্লময়ীর জীবনে আনাগোনা করেছে। তিনি তার হিসেব রাখেননি। বুকজোড়া শূন্যতার হাহাকার প্রশমিত হবার পর তিনি যখন "আমাদের কথা" বলতে বসেছেন তখন আর কারুর বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ নেই, নেই কোন বঞ্চনার গ্লানি। নির্বেদ বিষণ্ণতার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করে তিনি যে শান্তি পেয়েছেন দুঃখশোকহীন সুখের তরঙ্গে ভেসে বেড়ালে তা কোনদিনই পেতেন না। যে স্পর্শমণি পাবার জন্য মানুষ আকুল হয়ে ঘুরে বেড়ায় বেদনার সিন্ধু মন্থন করে সেই অমৃতের সন্ধান প্রফুল্লময়ী যেদিন পেলেন সেইদিন তিনি বিশ্বচরাচরের সব কিছুর মধ্যে বলেন্দ্রকে আবার ফিরে পেলেন। এই পাওয়াই তাঁর জীবনের চরম প্রাপ্তি। তিনি বলেছেন,

"মনে হয়, সে আঙিনায় সেই পূর্বের মত হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। পূর্বাকাশে ভোরের আলোতে তাহারই মুখখানি জলজল করে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সেও যেন ঘুমের অচেতনে আমার কোলে ঢলিয়া পড়ে। আমার বলুকে আমি হারাইয়াও হারাই নাই বরং তাহাকে আরও নিকটে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। এক সে আমার বহু হইয়া অহরহ আমার সম্মুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আজ সে অনন্তরূপে অনন্ত বাহু মেলিয়া আমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।"

ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরকে সার্থক করে তোলার জন্যে প্রফুল্লময়ীর এই ঐশ্বরিক

উপলব্ধিরও প্রয়োজন ছিল। নয়তো মনে হতে পারতো ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরিকারা নানা কেতায় পোষাক পরে, বেড়াতে বেরিয়ে, ঘোড়ায় চেপে, চুল বেঁধে আর রান্না করে বাঙালী মেয়েদের শুধু বহির্মুখী করেই তুলেছেন। কিন্তু তা তো নয়। এ বাড়িতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মহাসঙ্গম ঘটেছে। বহির্মুখী ধারার সঙ্গে মিশেছে অন্তর্মুখী সাধনার ধারা। প্রফুল্লময়ী সর্বপ্রথম শোকসাগর মন্থন করে সেই অমৃতের সন্ধান এনে দিলেন।

কোন কিছুই কারুর জন্যে থেমে থাকে না। বিশাল ঠাকুরবাড়ির এক কোণে যখন প্রফুল্লময়ীর জীবনে দুর্ভাগ্যের কালোছায়া নেমে আসছে ঠিক তখনই বাড়ির আরেক প্রান্তে বেজে উঠছে খুশির সানাই বারোয়াঁ সুরে। চতুর্দোলায় চড়ে আর একটি ছোট্ট মেয়ে 'গোধূলি লগ্নের সিঁদুরি রঙে'-রাঙা চেলি পরে প্রবেশ করলেন ঠাকুরবাড়িতে। তাঁর কাঁচা শ্যামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি, "গলায় মোতির মালা সোনার চরণচক্র পায়ে।" বাড়ির ছোট্ট ছেলেটির হঠাৎ মনে হলো এতদিন যে রাজার বাড়ি খুঁজে খুঁজে সে হয়রাণ হয়েছে, খুঁজে পায়নি, সেই বাড়িটিরই বুঝি খবর নিয়ে এলো এই রূপকথার রাজকন্যে, তার নতুন বৌঠান। কল্পনার দৌড় গেল বেড়ে।

কাদম্বরী যশোরের সেই পরিচিত রায়বংশের মেয়ে নন, তিনি কলকাতা-বাসিনী। তাঁর বাবা শ্যামলাল গাঙ্গুলির সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগাযোগ অনেকদিন ধরেই ছিল। কাদম্বরীর পিতামহ জগন্মোহনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল দ্বারকানাথের মামাতো বোন শিরোমণির। কাজেই এ বিবাহে মহর্ষির আপত্তি ছিল না। বাধা দিয়েছিলেন তাঁর মেজো ছেলে সত্যেন্দ্র। তিনি তখন সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছেন, চোখে কত রঙীন স্বপ্ন! ছোট ভাই জ্যোতিরিন্দ্রের বধূ রূপে তিনি মনে মনে মনোনীত করে রেখেছেন গুড়ির চক্রবর্তীর মেয়েকে। শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বিয়ে হবে, তার বদলে কিনা বাল্যবিবাহ! আট বছরের একটি খুকি? এরপরে কি জ্যোতি বিলেত যাবে? যদি যায় তো ফিরে এসে কি এই ছোট্ট মেয়েটিকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করতে পারবে? শেষে নষ্ট হয়ে যাবে না তো

দুটি অমূল্য জীবন! কিছুতেই কিছু হলো না। 'একে পিরালী তায় ব্রাহ্ম' ঠাকুরবাড়ির অবস্থা তখন 'একঘরে' হওয়ার মতো, তাই জ্যোতিরিন্দ্রের জন্যে যে মেয়ে পাওয়া গেছে তার সঙ্গেই বিয়ে হলো। সত্যেন্দ্রের সমস্ত আশংকা মিথ্যে করে দিয়ে কাদম্বরী ঠাকুরবাড়ির যোগ্যতমা বধূ হয়ে উঠলেন।

তিনি এ বাড়িতে এসে তিন তলার ছাদের ওপর গড়ে তুললেন "নন্দন কানন"। "বসানো হল পিল্পের ওপর সারি সারি লম্বা পাম গাছ, আশেপাশে চামেলি, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, করবী, দোলনচাঁপা।" এলো নানারকম পাখি। দেখতে দেখতে বাড়িটার চেহারা যেন বদলে গেল। গৃহসজ্জার দিকে নববধূর প্রথম থেকেই সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধকে সবচেয়ে উঁচু তারে বেঁধে দিয়েছিলেন এই কাদম্বরী, সেই বাঁধন কোনদিন শিথিল হয়নি।

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের যা কিছু অবদান তার সব কিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে আছেন কাদম্বরী। অথচ, খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, নিজে তিনি কোন কিছুতেই অংশগ্রহণ করতেন না। শুধু অপরের প্রাণে প্রেরণার প্রদীপটিকে উজ্জীবিত করে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। আসলে আমরা যাকে বলি রোম্যান্টিক সৌন্দর্যবোধ কাদম্বরীর সেটি পুরোমাত্রায় ছিল। ঠাকুরবাড়িতে এসে অনুকূল পরিবেশে হয়ত বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু এই চেতনা ছিল তাঁর মানস গভীরে। তাই বাইরে থেকে এসে এ বাড়ির প্রাণপুরুষকে জাগিয়ে দিতে তিনি যতখানি সফল হয়েছেন আর কেউ তা পারেননি।

কাদম্বরীকে নিয়ে এত বেশি আলোচনা হয়েছে যে তাঁর সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলতে চেষ্টা করা বাহুল্যমাত্র। অবশ্য এই আলোচনা-সমালোচনার কারণ রবীন্দ্রনাথ। কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনোগঠনে কাদম্বরীর দান অসামান্য। তাঁর অকালমৃত্যু রবীন্দ্রমানসে গভীর ছাপ রেখে যায়। একথা কবি নিজেই অসংখ্য কবিতায় ও গানের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং যাঁরা তাঁদের নিয়ে অনেক কল্পনা এবং কষ্ট-কল্পনা করেন তাঁদের সুযোগ করে দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজেই একথা বললে খুব ভুল বলা হবে না। কবি নিজেও জানতেন সেকথা। তাই কৌতুক করে শেষ বয়সে বলতেন, "ভাগ্যিস নতুন বৌঠান মারা গিয়েছিলেন

তাই আজও তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখছি—বেঁচে থাকলে হয়তো বিষয় নিয়ে মামলা হতো!”

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে কিছুটা গোঁড়ামির পরিচয় দিলেও সত্যেন্দ্র-জ্ঞানদানন্দিনীর প্রভাবে নব্যভাবের নেশায় মেতে উঠলেন। সাবেকী সংস্কার ত্যাগ করে তিনি কাদম্বরীকেও ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছিলেন এবং গঙ্গার ধারে নির্জন শিক্ষাপর্ব শেষ হলে কাদম্বরী প্রতিদিন স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন। তাঁদের দেখে অবাক বিস্ময়ে যারা কানাকানি করতো তাদের কথা প্রথমেই বলেছি। কাদম্বরীর অশ্বারোহণ বেশ আলোড়ন জাগিয়েছিল। কাদম্বরী ঠিক কোন সময় ঘোড়ায় চড়তেন সেকথাও জানা যায়নি। কেউই সঠিক সময় নির্দেশ করেননি। তবে এ ব্যাপারে কাদম্বরীকে একমাত্র 'অশ্বারোহিণী বঙ্গললনা' বলা চলে না। কারণ আরো কয়েকজনের কথা আমরা শুনেছি। তাঁরা কাদম্বরীর পূর্ববর্তিনী হয়তো নন কিন্তু সমসাময়িক বা অল্প পরবর্তী যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। য়ুরোপীয় শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে উগ্রাধুনিকারা ঘোড়ায় চড়া শিখতেন। সাহেবদের অনুকরণ করতেন দেশী সাহেব অর্থাৎ ভারতীয় আই. সি. এস. অফিসারেরা। সত্যেন্দ্রনাথকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তাঁর স্ত্রী ঘোড়ায় চড়তে পারেন কিনা। সত্যেন্দ্রের পরেই যে তিনজন বাঙালী সিভিলিয়ান অফিসার হয়েছিলেন তাঁরা—রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারী লাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা আচার-বিচার চালচলনে পুরো সাহেব হয়ে গিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী শ্রীহট্টে ঘোড়ায় চড়ে বিকেলে হাওয়া খেতে বেরোতেন। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের মেয়ে রমলা এবং কুচবিহারের মহারাণী সুনীতিদেবীর মেয়েরাও ঘোড়ায় চড়তে জানতেন। হেমেন্দ্রনাথের মেয়েরাও কেউ কেউ এ ব্যাপারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তবে এঁরা এসেছেন অনেক পরে। সেকালে উগ্রাধুনিকা মেয়েরা অনেক ব্যাপারেই অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। এঁদের সবচেয়ে আধুনিকতা ছিল স্বামী বা সঙ্গীনির্বাচনের অভিনবত্বে। ঠাকুর-বাড়ির মেয়ে-বৌরা ঠিক এই ধরনের মানসিকতার পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁরা সনাতন ধারাটিতেই এনেছেন নতুন কালের ছন্দ। বল্গাহীন উন্মত্ত মুক্তির স্রোতে

হয়তো উন্মাদনা আছে কিন্তু সুস্থ মানসিকতা কোথায় ? ঠাকুরবাড়ির কোন মেয়েই এমন হালকা হাওয়ার খেয়ালী নেশায় মেতে ওঠেননি। তাই নারী সমাজের ওপর তাঁদের মোহরের ছাপটাই সবচেয়ে গভীর !

কাদম্বরী শুধু ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেই বেরিয়েছিলেন তা নয়, সাধারণী নারীদের চোখে এঁকে দিয়েছিলেন এক দুঃসহ স্পর্ধার মায়াঞ্জন, অনেকের বুকে তিনি জাগিয়েছিলেন দুঃসাহস। মেয়েরা দেখলো হালকা হাওয়ায় উড়ে আসা বুদ্বুদের ফেনার মতো পশ্চিমীধারায় মানুষ হওয়া মেয়ে নয়, পথে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন তাদেরই মতো এক গৃহবধূ। বাস্তবিকই মেয়েলি কাজে কাদম্বরীর সুতীব্র আগ্রহ ছিল। প্রতিদিনের তরকারি কাটার আসরে তিনি যেমন উপস্থিত থাকতেন তেমনি দেখাশোনা করতেন বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। কারুর জ্বর হলে আর রক্ষে নেই, কাদম্বরী গিয়ে বসতেন তার শিয়রে। সদ্য মাতৃহারা বালক দেবরটিকেও তিনি পরম স্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন অথচ কতই বা বয়স তাঁর ? রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়ো।

কাদম্বরীর প্রধান পরিচয় তিনি অসাধারণ সাহিত্যপ্রেমিকা ছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপার হরফে তাঁর নাম নেই সত্যি কিন্তু তিনিই ছিলেন ঐ পত্রিকার প্রাণ। সে কথা বোঝা গিয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে। পূর্বোক্ত 'নন্দন কাননে' সন্ধেবেলা বসতো গান ও সাহিত্য পাঠের আসর। আসরে যোগ দিতেন বাড়ির অনেকে, বাইরে থেকে আসতেন অক্ষয় চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী শরৎকুমারী 'লাহোরিণী', জানকীনাথও থাকতেন সেখানে আর মাঝে মাঝে আসতেন কবি বিহারীলাল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী ছিলেন এ সভার স্থায়ী সভ্য। কাদম্বরী বিহারীলালের কবিতা পড়তে খুব ভালোবাসতেন ও মাঝে মাঝে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। শুধু তাই নয়, নিজের হাতে একটা আসন বুনে উপহার দিয়েছিলেন। আসনের ওপর, প্রশ্নচ্ছলে কার্পেটের অক্ষরে লেখা ছিল 'সারদামঙ্গল' কাব্যেরই কয়েকটা লাইন। কবি সে উত্তর দেবার জন্যে আর একটি কাব্য যখন রচনা করেন তখন কাদম্বরী ইহলোকে নেই। বিহারীলাল তাঁর উপহারকে স্মরণ করে কাব্যের নাম দিয়েছিলেন "সাধের আসন"।

ছাদের বাগানে সন্ধ্যেবেলা বসতো পরিপাটি আসর। মাদুরের ওপর তাকিয়া, রূপোর রেকাবে ভিজে রুমালের ওপর বেলফুলের গোড়ের মালা, এক গ্লাস বরফজল, বাটা ভরতি ছাঁচি পান সাজানো থাকতো। কাদম্বরী গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন সেখানে, জ্যোতিরিন্দ্র বাজাতেন বেহালা, রবীন্দ্র ধরতেন চড়া সুরের গান, সে গান সূর্য ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত। "হু হু করে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভরে।" কিশোর রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক সৌন্দর্য-চেতনাকে জাগাবার জন্যে এই পরিবেশ এই সৌন্দর্যদৃষ্টি ও কল্পনার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর নতুন বৌঠান কাদম্বরীকে নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। মাঝে মাঝে অনুচিত সন্দেহ এসে যে কাঁটা বেঁধায়নি তাও নয়। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের বিবাহের কয়েকমাসের মধ্যে কাদম্বরীর মৃত্যু সংশয় সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রমানস গঠনে এই অসামান্যা নারীর দান চিরস্মরণীয়। তাঁর কবি হয়ে ওঠার কথা পড়ে মনে হয় তাঁর আন্তরিক চেষ্টার মূলে ছিলেন কাদম্বরী। বৌদিদির চোখে নিজেকে যত দামী করে তোলার চেষ্টা চলছিল, কাদম্বরী মুখ টিপে হেসে ততই অগ্রাহ্য করে গেছেন দেবরটিকে :

"রবি সবচেয়ে কালো, দেখতে একেবারেই ভালো নয়, গলা যেন কী রকম। ও কোনোদিন গাইতে পারবে না, ওর চেয়ে সত্য ভালো গায়।"

বলতেন :

"কোনোকালে বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারবে না।" রবীন্দ্রনাথের তখন শুধুই মনে হতো "কী করে এমন হব যে আর কোন দোষ তিনি খুঁজে পাবেন না।" বুঝতেন না সেই সাধনাই করছেন কাদম্বরী, যাতে কেউ কোনদিন রবির দোষ খুঁজে না পায়। যখন একথাটা বোঝার মতো করে বুঝলেন তখন কাদম্বরী হারিয়ে গেছেন চির অন্ধকারে, প্রতিভার প্রদীপে তেল সলতে যোগানো সারা, আলো জ্বালার কাজ শেষ। তাই তো তারপর সারাজীবন ধরে চলে তাঁর অনুসন্ধান :

"নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।"

আমরা রবীন্দ্র কাব্য আলোচনায় যাবো না তবে তাঁর বহু কবিতায়, বহু গানে রয়েছে তাঁর কথা, ছবিতে ধরা পড়েছে তাঁর চোখের আভাস। সব মিলে কাদম্বরী আজ আমাদের কাছে বাস্তবে-কল্পনায় মেশা একটি অপরূপ চরিত্র হয়ে আছেন। কবি নারীকে বলেছেন "অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা"— কাদম্বরীও তাই। রোম্যান্টিক স্বপ্ন-সঞ্চারিণী নতুন বৌঠানের মধ্যে হারিয়ে গেছেন মানবী কাদম্বরী।

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে কাদম্বরীর আরেকটি ভূমিকাও স্মরণীয়। তিনি ছিলেন সুঅভিনেত্রী এবং সুগায়িকা। নাট্যরসিক জ্যোতিরিন্দ্রের মন আরো উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল গুণবতী স্ত্রীকে পেয়ে। বাইরের জোড়াসাঁকো থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি নিজেই লিখতে শুরু করলেন নাটক-প্রহসন-গীতিনাট্য অভিনয়ের ব্যবস্থাও হলো। একেবারে ঘরোয়া পরিবেশে, বাড়ির উঠোনে। বাড়ির মধ্যে অভিনয়ে মেয়েদের যোগ দিতে বাধা কি? কাদম্বরীকে কেউ বাধা দিলেন না। তিনি এসে দাঁড়ালেন পাদপ্রদীপের আলোয়। প্রথম অভিনয় স্বর্ণকুমারীর 'বসন্ত উৎসব' না কি জ্যোতিরিন্দ্রের 'অলীকবাবু'? প্রথমে নাম ছিল 'এমন কর্ম আর করব না'। রচনার সময় হিসেবে 'এমন কর্ম আর করব না' পূর্ববর্তী। সুতরাং 'বসন্ত উৎসবে'র চেয়ে তার দাবি বেশি। যদি ধরে নেওয়া যায় এ প্রহসন লেখার পরই অভিনয়ের ব্যবস্থা হয় এবং রবীন্দ্রনাথ নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তাহলে প্রহসনটি অভিনীত হয়েছে রবীন্দ্রের প্রথম য়ুরোপ যাত্রার আগে এবং এটাই ছিল কাদম্বরীর প্রথম অভিনয়।

প্রথম বা দ্বিতীয় যাই হোক না কেন 'এমন কর্ম আর করব না' মঞ্চসফল নাটক। এই নাটকে বাড়ির অনেকেই সানন্দে যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অলীকবাবু, দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যসন্ধ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চীনেম্যান, অলীকের বন্ধু অরুণেন্দ্রনাথ, গদাধর শরৎকুমারীর স্বামী যদুকমল মুখোপাধ্যায়। পিসনি বা প্রসন্নদাসীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মহর্ষির ছোট মেয়ে বর্ণকুমারী।

রবীন্দ্রনাথের ছোট দিদি বর্ণকুমারী সম্বন্ধে আমরা খুব কম জানি। অথচ তিনি রবীন্দ্রনাথের পরেও অনেকদিন জীবিত ছিলেন। শিল্প বা সাহিত্যের দিকে নজর দিতে না পারলেও বর্ণকুমারী ভালো অভিনযের নজির সৃষ্টি করে গেছেন প্রসন্ন চরিত্রাভিনয়ে। বালিকা ইন্দিরার মনে সে অভিনয় দাগ কাটে, তিনি প্রসন্ন সেজে দাসীদের অতি স্বাভাবিক আচরণ অভিনয় করে দেখালেন একদিন। কিন্তু অন্য কোন অভিনযে তাঁকে অংশ নিতে দেখা যায়নি।

এই নাটকের সবচেয়ে দুরূহ ভূমিকাটিই হচ্ছে হেমাঙ্গিনীর। বঙ্কিম-উপন্যাস পড়া উনিশ শতকের রোম্যান্টিক নায়িকা 'এমন কর্ম আর করব না'-র হেমাঙ্গিনী। আবেগগর্ভ আদিরসকে পরিহাসতরল হাস্যরসে পরিণত করে আজও সে অমর হয়ে আছে। অনেকেই মনে করেন এই ভূমিকাভিনেত্রী ছিলেন কাদম্বরী। অথচ ইন্দিরার স্মৃতিতে 'অলীকবাবু'র যে অভিনযটি স্মরণীয় হযে আছে সেটিতে হেমাঙ্গিনী সেজেছিলেন অক্ষয় চৌধুরীর স্ত্রী শরৎকুমারী। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও ইন্দিরাকে অনুসরণ করে শরৎকুমারীকেই হেমাঙ্গিনীর ভূমিকাভিনেত্রী বলেছেন।

অপরদিকে সজনীকান্ত দাস সরাসরি কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন, "হে" কে? প্রশ্ন করার কারণ কবি "ভগ্নহৃদয়" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার সময় সেটি উৎসর্গ করেন "শ্রীমতী হে—"কে। কবি সজনীকান্তকে পাল্টা প্রশ্ন করেন, "তোমার কি মনে হয়?" সজনীকান্ত বলেছিলেন, "হেমাঙ্গিনী। 'অলীকবাবু'তে আপনি অলীকবাবু ও কাদম্বরীদেবী হেমাঙ্গিনী সাজিয়াছিলেন। সেই নামের আড়ালের সুযোগ আপনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

কবি স্বীকার করেন, "ইহাই সত্য অন্য সব অনুমান মিথ্যা।"

এই "শ্রীমতী হে" নিয়েও কম সংশয় নেই। ইন্দিরা মনে করেন 'হে'র পুরো নাম হেকেটি, গ্রীক পুরাণের ত্রিমুণ্ড দেবী, সংক্ষেপে কাদম্বরীর ডাক নাম। তবে ইন্দিরা দেখেননি বলেই যে কাদম্বরী হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় কখনো অভিনয় করেননি তা মনে হয় না। ১৮৭৭ সালে যদি প্রথম অভিনয় হয়ে থাকে তখন ইন্দিরা এদেশে ছিলেন না, পরেও তিনি যে সব সময় ঠাকুরবাড়িতে থাকতেন

তা নয়। এসব অভিনয়ে আমরা জ্ঞানদানন্দিনীকেও অভিনয় করতে দেখিনি। 'অলীকবাবু'র অভিনয় পরেও অনেকবার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনায় পরবর্তীকালের অভিনয়ে কবি গল্পটিকে ঈষৎ বদলে হেমাঙ্গিনীকে সারাক্ষণ নেপথ্যে রেখেছিলেন। অবন ঠাকুর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "তখন মেয়েই বা কই এ্যাকটিং করবার।" অসম্ভব নয়। তবু এক একবার মনে হয় সত্যিই কি শুধু অভিনেত্রীর অভাব? সে অভাব কখনও পূরণ হয়নি? না, কাদম্বরীর সমকক্ষ মনে হয়নি কাউকে? যাক, অলীক কষ্টকল্পনা করে তো লাভ নেই।

হেমাঙ্গিনীর ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও 'বসন্ত উৎসব' ও 'মানময়ী'তে কাদম্বরীর ভূমিকা স্পষ্ট। এ দুটি অভিনয়ে কাদম্বরী শুধু ভালো অভিনয়ই করেননি ভালো গানও গেয়েছিলেন। অবশ্য সঙ্গীতে কাদম্বরীর অধিকার ছিল। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পৌত্রী তিনি, গান তাঁর রক্তে। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে তিন তলার ঘরে শুধু পিয়ানো আসেনি জ্যোতিরিন্দ্র ও রবীন্দ্রের অনুশীলনও শুরু হয়ে গেছে। তাঁর নন্দনকাননের সান্ধ্য সভাতেও বসতো গানের আসর। এসব দেখে মনে হয় অভিনয়, গান, সাহিত্য নিয়ে কাদম্বরী সবাইকে একেবারে মাতিয়ে রেখেছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকার কথাই ধরা যাক না। দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেখা শোনা করতেন, রবীন্দ্রনাথ লিখতেন। কাদম্বরীর কাজ কি ছিল? শরৎকুমারীর ভাষায় তিনি ছিলেন 'ফুলের তোড়ার বাঁধন'। সবাইকে একসঙ্গে তিনিই বেঁধে রেখেছিলেন, সবার অলক্ষ্যে। বাঁধন যেদিন ছিঁড়লো সেদিন বোঝা গেল কাদম্বরী কি ছিলেন।

নিজের হাতে জীবনদীপটি নিবিয়ে দিয়ে অন্তরালে চলে না গেলে তিনি হয়তো ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরের রসের উৎসটিকে আরো কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে সোনালি দিনগুলি শীতের পাখির মতো বিদায় নিতে শুরু করেছে। এরপরে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সম্মিলিত ভূমিকার চেয়ে একক ভূমিকাই বড়ো হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেন চলে গেলেন কাদম্বরী, কেন? কেন? এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর আজও পাওয়া যায়নি।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহের মাত্র কয়েক মাস পরেই কাদম্বরীর মৃত্যু হয়। ঘটনাটি আকস্মিক। তবে একেবারে অভাবনীয় নয় হয়তো। পূর্বেও তিনি একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। এই সুরসিকা, রুচিসম্পন্না, প্রতিভাময়ী নারীর জীবনেও শান্তির অভাব ছিল। রবীন্দ্রজীবনীকারের ভাষায় কাদম্বরী ছিলেন "যেমন অভিমানিনী, তেমনি সেন্টিমেণ্টাল এবং আরো বলিব ইনট্রোভার্ট, স্কিজোফ্রেনিক।" তাঁর মতের সঙ্গে সবাই একমত না হলেও কাদম্বরীকে অভিমানিনী আরো অনেকেই বলেছেন। তাঁর নিঃসন্তান জীবনের বেদনা অভিমানকে আরো তীব্র করে তুলেছিল। তাই প্রাণের গভীরে লুকিয়ে থাকা দুঃখের ফল্গুধারা হঠাৎ এক আঘাতে নিজেকে হারিয়ে বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো নেমে এলো দুকূল ছাপিয়ে।

পরবর্তীকালে এ নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। অনেকেই অনেক রকম গল্প রচনা করে ফেলেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। বিশেষ করে তাঁর বিবাহ এবং কাদম্বরীর মৃত্যুর মধ্যে একটি যোগসূত্র কল্পনা করে নেওয়া যখন সত্যিই খুব কষ্টকর নয়। কিন্তু সমসাময়িক কালে কেউ কেউ এ ঘটনার জন্য দায়ী করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে।

কাদম্বরীর মৃত্যু সংক্রান্ত যে সব খবর পাওয়া গেছে তাতে নিশ্চিত উত্তর কিছু পাওয়া যায় না। যেমন স্বর্ণকুমারীকে প্রশ্ন করে অমল হোম শুনেছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জোব্বার পকেট থেকে কাদম্বরী পেয়েছিলেন তখনকার দিনের একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীর কয়েকখানি চিঠি। চিঠিগুলি উভয়ের অন্তরঙ্গতার পরিচায়ক। এই চিঠিগুলি পেয়ে কাদম্বরী কয়েকদিন বিমনা হয়ে কাটান তারপর আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর আগে তিনি লিখে গিয়েছিলেন যে ঐ চিঠিগুলিই তাঁর আত্মহত্যার কারণ। মহর্ষির আদেশে সেসব চিঠি ও তাঁর স্বীকারোক্তি নষ্ট করে ফেলা হয়। কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন যে, তিনি ঠাকুরবাড়ির একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির মুখে শুনেছেন, "যে মহিলার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল তিনি অভিনেত্রী নন, তবে সেই অন্তরঙ্গতার জন্য কাদম্বরী নাকি আগেও একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।"

ইন্দিরা আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে লিখেছেন, "জ্যোতিকাকামশাই প্রায়ই বাড়ি ফিরতেন না। তাঁর প্রধান আড্ডা ছিল বিরজিতলাওয়ে আমাদের বাড়ি। আমার মা জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গে ওঁর খুব ভাব ছিল।" এরই মধ্যে একদিন অভিমানিনী কাদম্বরী স্বামীকে বলেছিলেন তাড়াতাড়ি ফিরতে। গানে গানে আড্ডায় আড্ডায় সেদিন এত দেরি হয়ে গেল যে জ্যোতিরিন্দ্রের বাড়ি ফেরাই হলো না। প্রচণ্ড অভিমানে কাদম্বরী ধ্বংসের পথই বেছে নিলেন। বাড়িতে আসতো এক কাপড়ওয়ালা বিশু। সেই বিশুকে দিয়ে লুকিয়ে আফিম আনিয়ে, সেই আফিম খেয়েই কাদম্বরী মর্ত জীবনের মায়া কাটালেন।

সমসাময়িক কালের অন্যান্য কবিদের কোন কোন লেখা থেকে মনে হয় তাঁরাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই দায়ী করেছেন। নিঃসন্তান স্ত্রীর সঙ্গহীন শূন্যতা ভরিয়ে তোলার জন্যে স্বামীর যতটা মনোযোগী হওয়া উচিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তা ছিলেন না। হয়তো এ ব্যাপারে তিনি খানিকটা উদাসীন হয়ে থাকতেন। নিত্য নতুন সৃষ্টির আনন্দে মেতে ওঠা, হঠাৎ একেকটা খেয়ালের বশবর্তী হয়ে চলা, সত্যেন্দ্র-জ্ঞানদানন্দিনীর সান্নিধ্য, তাঁদের পুত্র-কন্যার সাহচর্য তাঁকে কাদম্বরীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে এনেছিল। তৎকালীন রুচি ও রীতির পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোতিরিন্দ্রের পক্ষে থিয়েটারের অভিনেত্রী বা নটীদের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনাও বিচিত্র নয়। যাই হোক, সব মিলে কাদম্বরীর মনে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। সযত্ন স্বামীসেবা, গৃহ পরিচর্যা, সাহিত্য শিল্প নিয়ে তিনি নিজেকে ভুলিয়ে রাখলেও শেষরক্ষা করতে পারেননি। সত্যেন্দ্র-জ্ঞানদানন্দিনীর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ও বির্জিতলাও বাস এবং রবীন্দ্রনাথের বিবাহ দুটি ঘটনায় তাঁর নিঃসঙ্গতা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পায়। সেই অবস্থায় স্বামীর অবহেলায় কাদম্বরী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন ও আত্মহননের পথ বেছে নেন। এর পটভূমিতে স্বর্ণকুমারী কথিত বা ইন্দিরা কথিত যে কোন একটি বা দুটি কাহিনীই থাকতে পারে তবে তৃতীয় কোন অনুমানের অবকাশ বোধহয় নেই।

এই ঘটনার কিছু আগে এবং পরে লেখা কয়েকটা কবিতার প্রতি এজন্যেই সমালোচকদের দৃষ্টি পড়েছিল। প্রথম কবিতাটির কবি অক্ষয় চৌধুরী। জগদীশ

ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে অন্যাসক্ত স্বামীর প্রতি নারীর অভিমানই 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' এবং এই নির্ঝরিণী আর কেউ না। জ্যোতিরিন্দ্র-পত্নী কাদম্বরী :

"রাখিতে তাহার মন, প্রতিক্ষণে সযতন
হাসে হাসি কাঁদে কাঁদি—মন রেখে যাই,
মরমে মরম ঢাকি তাহারি সম্মান রাখি,
নিজের নিজস্ব ভুলে তারেই দেখাই,
কিন্তু সে ত আমা পানে ফিরেও না চায়।"

প্রভৃতি অংশ পড়ে অবশ্য সেবাপরায়ণা গুণবতী কাদম্বরীর কথাই মনে পড়ে। অপর দিকে রবীন্দ্রজীবনীকার 'তারকার আত্মহত্যা'য় দেখেছেন কাদম্বরীর প্রথম আত্মহনন চেষ্টার প্রতিচ্ছবি। কিশোর রবীন্দ্রনাথ জানতেন তার নতুন বৌঠানের মনোবেদনার কথা।

"যদি কেহ শুধাইত
আমি জানি কী যে সে কহিত
যতদিন বেঁচে ছিল
আমি জানি কী তারে দহিত।..."

তাই জ্যোতির্ময় জগৎ থেকে তারকার আঁধার জগতে স্বেচ্ছা নির্বাসন।

কাদম্বরীর মৃত্যুর পরেও আরেকজন কবি জ্যোতিরিন্দ্রকে শালীনতার আড়াল না রেখেই তীব্র ভৎসনা করেছিলেন। বিহারীলাল তাঁর 'সাধের আসনে' পতিব্রতা সতীকে বললেন 'আর এস না ধরায়' কারণ :

"পুরুষ কিম্ভূতমতি চেনে না তোমায়।
মন প্রাণ যৌবন—
কি দিয়া পাইবে মন।
পশুর মতন এরা নিতুই নতুন চায়।"

সমসাময়িক ব্যক্তিদের সাক্ষ্য এবং কবিদের রচনা থেকে বোঝা যায়, কাদম্বরীর মৃত্যুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহকে জড়িয়ে যে অনুচিত কল্পনা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয় তার কোন ভিত্তি নেই। দেবর রবীন্দ্রনাথের প্রতি যদি কাদম্বরীর

অনুচিত আসক্তি প্রকাশ পেত তাহলে তিনি সবার অন্তরে এই শ্রদ্ধার আসন পেতেন কি ?

এই মৃত্যুকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন ? এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। কাদম্বরীর মৃত্যুর একমাস পরেই তিনি জ্ঞানদানন্দিনী, সুরেন্দ্র, ইন্দিরা ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সরোজিনী জাহাজে চেপে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় 'তারকার আত্মহত্যা'র কিশোর কবির অনুমানই বোধহয় ঠিক, "যেমন আছিল আগে তেমনি রয়েছে জ্যোতি"। কিন্তু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে আমরা বোধহয় শুধু একটি কথাই বলতে পারি, কাদম্বরীর জীবনাহুতি জ্যোতিরিন্দ্রকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছিল। তাই শুধু বাণিজ্যেই তাঁকে পর্যুদস্ত হতে হলো তা নয় পরাস্ত হতে হলো জীবনের কাছেও। না হলে তাঁর মতো প্রতিভাবান নাট্যকার কাদম্বরীর মৃত্যুর পর মৌলিক রচনা ছেড়ে দিয়ে শুধু অনুবাদ নিয়ে পড়ে থাকবেন কেন ? এ যে নিজেকেই ভুলে থাকা। কাদম্বরীর মৃত্যুকালে তার বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি। কেন করেননি সে প্রশ্ন করা হলে তিনি শুধু বলেছিলেন, "তাঁকে ভালোবাসি।"

যুক্তিবাদীরা হয়তো বলবেন অনুশোচনা। হয়তো সত্যিই তাই। নিজেকে সমাজ-সংসার থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন দিয়ে তিনি তিল তিল করে শাস্তি দিয়েছেন নিজেকেই। শাস্তি দিয়েছেন কাদম্বরীর প্রতি অমনোযোগী উদাসীন কর্তব্যচ্যুত স্বামীকে। দুঃখের বিষয় আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনোভাবের কথা একেবারেই জানতে পারি না। 'আমার জীবনস্মৃতি' কিংবা শেষ বয়সে লেখা ডায়রি, কোথাও জ্যোতিরিন্দ্রের মনের কথা ধরা নেই। কোথাও নেই কাদম্বরীর কথা। 'জীবন-স্মৃতি'তেও দু একটি সংবাদ ছাড়া কাদম্বরী সর্বত্রই আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত। অথচ রাঁচিতে তাঁর নিজে বাড়ি শান্তিধামের যে নিরাভরণ ঘরখানিতে তিনি থাকতেন তার দেয়ালে ছিল একটি মাত্র ছবি, তার নিজের হাতে আঁকা কাদম্বরীর পেন্সিল স্কেচ। সুতরাং এই 'ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা'। জ্যোতিরিন্দ্র সেই নির্জন বিষণ্ণ শান্তিধামের নিরালা অবসরে হয়তো বারবার অনুভব করতে চেয়েছেন সেই

অসামান্যাকে, যাঁর প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের কবি-মন উজ্জীবিত হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি যদিও সেটি ঠিক প্রমীলা সংবাদ নয়। সাম্প্রতিক কালের কোন কোন সমালোচক ভাবতে শুরু করেছেন যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব সঙ্গে ববীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কোন এক অজ্ঞাত কারণে ছিন্ন হয়ে যায়। এর কারণ হিসেবেও তাঁবা নিয়েছেন ববীন্দ্রনাথের ক্রমবর্ধমান খ্যাতি এবং নতুন বৌঠানের আত্মহত্যা ঘটনাটিকে। কিন্তু দুটি সম্ভাবনাই অসার মনে হয় কারণ রবীন্দ্রের প্রতি জ্যোতিবিন্দ্র কোনদিন ঈর্ষান্বিত হবেন ভাবা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগ স্ত্রীর মৃত্যুব পরে তো ছিলই, অন্য সময়েও বিচ্ছিন্ন হযনি। সরোজিনী জাহাজে ভ্রমণ করা ছাড়াও তাঁরা দুই ভাই বহুদিন সত্যেন্দ্র-নাথের বাড়িতে পাশাপাশি ঘরে বাস কবেছেন। তাঁর শেষ বয়সের ডায়রিতেও দেখা যাবে দু তিনবার রবীন্দ্র প্রসঙ্গ আছে। রবির বক্তৃতা, দাড়ি রাখা, গান কিছুই তাঁর চোখ এড়ায়নি। এমন কি ছবিও একেছেন। তবে এ সময জ্যোতিরিন্দ্র সব কিছু থেকেই অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন।

অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিতেও দেখা যাবে অন্তরঙ্গতার সুর। 'ভাই জ্যোতিদাদা'র ছবির এ্যালবাম ছাপার ব্যাপারে তিনিই উদ্যোক্তা এবং আগ্রহী। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। নিজেব পাবিবারিক জীবনেও নেমে এসেছে নিযতির দুর্বার দণ্ড। পুত্রকন্যাদের মৃত্যু, শান্তিনিকেতনের সমস্যা নিয়ে বিব্রত কবি তখন নিজের কোন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখতে পারছেন না, জীবনবিরাগী জ্যোতিবিন্দ্রনাথ তো সেখানে আরো দূবের মানুষ। সুতরাং কাদম্বরীর মৃত্যু দুই ভাইযের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেনি। এই মৃত্যুব মধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ খুঁজেছেন কাদম্বরীর বিদেহী সত্তাকে আব রবীন্দ্রনাথ নতুন করে চিনেছেন নিজেকে। কাদম্বরীর অদেহী সত্তা মিশে রইলো তাঁব কবিতায়, গানে, ছবিতে।

জীবন থেমে থাকে না। কাদম্বরী যখন চলে গেলেন ফুলতলির ভবতারিণী তখন নাবালিকা। তাকে 'স্বর্ণ মৃণালিনী' হবার আশীর্বাদ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ।

তারপর ভবতারিণী একদিন হারিয়ে গেলেন মৃণালিনার মধ্যে। যদিও এই পরিবর্তন কোন আলোডন আনলো না বহির্জগতে। একটুও তরঙ্গ তুললো না প্রগতিশীলাদের মনে। তবু মৃণালিনীকে সামান্যা বলতে পারা যায় না। মাত্র দশ বছব বয়সে একহাত ঘোমটা টেনে যে ভবতারিণী ঠাকুরবাড়িতে ঢুকেছিলেন সেদিন তিনি বুঝতেও পাবেননি কোন্ বাড়িতে তাঁব বিয়ে হচ্ছে, কাকে পেলেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, "আমাব বিযেব কোন গল্প নেই", বলতেন "আমাব বিয়ে যা-তা কবে হয়েছিল"। কিন্তু প্রথম দিকে তোড়জোড শুরু হয়েছিল বড়ো মাপে। দাসী পাঠিয়ে মেযে পছন্দ করা পুবনো ব্যাপার তাই এবার একটা কমিটি তৈবি হলো—জ্ঞানদানন্দিনী, কাদম্বরী, জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ও ববীন্দ্রনাথকে নিয়ে। তাঁবা সদলবলে মেয়ে খুঁজতে গেলেন যশোরে—সেখান থেকে ঠাকুর-বাড়ির অধিকাংশ বৌ এসেছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনীর বাপের বাড়ি নবেন্দ্রপুরে গিযে উঠলেও দক্ষিণডিহি, চেঙ্গুটিয়া প্রভৃতি আশেপাশেব সব গ্রামেব বিবাহযোগ্যা মেয়েই দেখা হযে গেল কিন্তু বৌঠাকুবাণীদের মনের মতো সুন্দরী মেযে পাওযা গেল না। তাই শেষকালে ঠাকুর স্টেটেব কর্মচাবী বেণীমাধব রায়েব বড়ো মেয়ে ভবতারিণীব সঙ্গেই বিযে ঠিক কবা হলো। অবশ্য দাদাদের মতো ববীন্দ্রনাথ বিযে করতে যশোবে যাননি, জোড়াসাঁকোতেই বিয়ে হয়েছিল।

গুরুজনেবা যে সম্বন্ধ স্থির কবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিনা দ্বিধায তাঁকেই বরণ কবে নিয়েছিলেন। বন্ধুদের নিজের বিয়ের নিমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়ে দিলেও এ বিয়েতে ঘটাপটা হযনি। পাবিবাবিক বেনারসী "দোড়দার" জমকালো শাল গায়ে দিযে তিনি বিয়ে কবতে গেলেন নিজেদের বাডির পশ্চিম বারান্দা ঘুরে। বিয়ে কবে আনলেন অজ্ঞ বালিকা ভবতারিণীকে। তাঁর বাসর ঘরে একবার উঁকি মেবে দেখলে দেখা যাবে সেখানে তিনি ওড়নাঢাকা জড়োসড়ো বধূর দিকে চেয়ে গান ধরেছেন "আ মরি লাবণ্যমযী···"।

শোনা গেছে, কথায় প্রচণ্ড যশুরে টান থাকায় ভবতারিণী প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন কথাই বলতেন না। কবি কি এই অসম বিবাহকে খুশি মনে গ্রহণ

করেছিলেন? তাই তো মনে হয়। ছোট ছোট ঘটনায় রয়েছে সুখের আমেজ। এরই মধ্যে শুরু হলো, ভবতারিণীর মৃণালিনী হয়ে ওঠার শিক্ষা। প্রথমে তিনি মহর্ষির নির্দেশে ঠাকুরবাড়ির আদব-কায়দা-বাচনভঙ্গীর ঘরোয়া তালিম নিলেন নীপময়ীর কাছে। তারপর নীপময়ীর মেয়েদের সঙ্গে মৃণালিনীও পড়তে গেলেন লরেটো হাউসে। ফুলতলির ভবতারিণী হয়তো হারিয়ে গেলেন কিন্তু মৃণালিনী অতি আধুনিকা হয়েও ওঠেননি কিংবা তাঁর লরেটোর ইংরেজি শিক্ষা, পিয়ানো শিক্ষা, বাড়িতে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা কোন সৃষ্টিমূলক কাজেও লাগেনি। কারণ তাঁর জীবন সংসারের সকলের সুখে নিমজ্জিত ছিল। চারপাশের অতি সরব এবং সোচ্চার ছবিগুলির পাশে তাঁর নির্বাক ভূমিকাটি আমাদের কাছে তেমন স্পষ্ট নয়। অথচ তিনিও বাড়ির অন্যান্য মেয়ে-বৌয়েদের মতো অভিনয় করেছেন, অনুবাদ করেছেন, আমোদে-প্রমোদে-দুঃখে-শোকে সবার সবচেয়ে বেশি কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী'র প্রথম অভিনয়ে মৃণালিনী সেজেছিলেন 'নারায়ণী' আর দেবদত্তের ভূমিকায় কে অভিনয় করেছিলেন জানেন? তাঁর মেজোভাসুর সত্যেন্দ্রনাথ। ঘরোয়া অভিনয় নয় বেশ বড়ো মাপের আয়োজন হয়েছিল। যদিও প্রথমবার তবু তাঁর অনাড়ম্বর সাবলীল অভিনয় ভালোভাবেই উৎরেছিল। অথচ 'নবনাটকে' অভিনয় করার জন্যে একটি স্ত্রীভূমিকা গ্রহণ করে অক্ষয় চৌধুরী আর কিছুতেই স্টেজে এসে দাঁড়াতে পারেননি। মৃণালিনীরও এরকম অবস্থা হতে পারতো। বিশেষ করে ভাশুরের সঙ্গে অভিনয়! কিন্তু কোন বিঘ্ন ঘটেনি। তবু রবীন্দ্রনাথের নাটক কিংবা অভিনয়ে যোগ দেবার আগ্রহও মৃণালিনীর ছিল না একথা স্বীকার করতেই হবে। 'সখিসমিতি'র দু একটা অভিনয়ে যোগ দেওয়া ছাড়া আর কিছুতেই তাঁকে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। আসলে গান-অভিনয়-সাহিত্যচর্চার মধ্যে মৃণালিনীর প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্বামীর মহৎ আদর্শকে কাজে পরিণত করবার জন্যে তিনি যখন রবীন্দ্রনাথের পাশে এসে দাঁড়ালেন তখনই তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রথম বার আমরা পেলুম। সামান্যার মধ্যে দেখা দিলেন অসামান্যা। দেখা দিল

সনাতন ভারতবর্ষের শাশ্বতী নারী। অবশ্য সে অনেক পরের কথা।

ঠিক সুগৃহিনী বলতে যা বোঝায় ঠাকুবাড়িতে মৃণালিনী ছিলেন তাই। জোড়াসাঁকোতে সবার ছোট তবু সবাই তাঁর কথা শুনতেন। সবাইকে নিয়ে তিনি আমোদ আহ্লাদ করতেন, বৌযেদের সাজাতেন কিন্তু নিজে সাজতেন না। সমবয়সীরা অনুযোগ করলে বলতেন, "বড় বড় ভাশুর-পো ভাগ্নেরা চারদিকে ঘুরছে—আমি আবার সাজব কি? তিনি আরো ভালোবাসতেন রান্না করে আর পাঁচ জনকে ভালোমন্দ রেঁধে খাওয়াতে। ঠাকুরবাড়িতে মেয়েদের গৃহকর্মে নানারকম তালিম দেওয়া হতো। মহর্ষিকন্যা সৌদামিনী তাঁর পিতৃস্মৃতিতে লিখেছিলেন যে তাঁদের প্রতিদিন নিযম করে একটা তরকারি রাঁধতে হতো। "রোজ একটা করিয়া টাকা পাইতাম, সেই টাকায় মাছ তরকারি কিনিয়া আমাদিগকে রাঁধিতে হইত।"

নতুন বৌযেদের শিক্ষা শুরু হতো পান সাজা দিযে। তারপর তাঁরা শিখতেন বড়ি দিতে, কাসুন্দি-আচার প্রভৃতি তৈরি করতে। ধনী পরিবারের বৌ হলেও এসব শিক্ষায় ত্রুটি ছিল না। বলা বাহুল্য মৃণালিনী এসব কাজে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে একটা কথা মনে রাখতেই হবে, এ সময় দিন বদলাচ্ছে। পালাবদল চলছে বাড়ির বাইরে, বাড়ির ভেতরেও। না বদলালে কি জ্যোতিরিন্দ্র কাদম্বরী তিন তলার ছাদে 'নন্দন কানন' তৈরি করতে পারতেন? সে সভায় অনাত্মীয় পুরুষেরাও অবাধে আসতেন অথচ সত্যেন্দ্র-বন্ধু মনোমোহনকে অন্তঃপুরে নিয়ে আসতে কম কাঠ খড় পোড়াতে হয়নি। যুগ বদলাচ্ছে। মৃণালিনী যখন লরেটো স্কুলে পড়তে গেলেন তখন আর কেউ ধিক্কার দিতে এলো না। কারণ তার আগেই চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় অসাধ্য সাধন করে ফেলেছেন। যাক সে কথা পরে হবে। এখন কথা হচ্ছে ঠাকুরবাড়ির সাবেকী চাল নিয়ে। অন্দরমহলের ব্যবস্থা বদলাতে বড়ো দেরি হয়। যাই যাই করেও গ্রীষ্মকালের শেষ সূর্যের আলোর মতো মেয়েদের চিরকেলে অভ্যেস যেন যেতে চায় না। তাই বাইরের জগতে কয়েকটি মেয়ে বিরাট পরিবর্তন আনলেও বৌযেরা তখনও শিখতেন ঝুনি বাইয়ের ঝাল কাসুন্দি,

আমসত্ত্ব, নারকেল চিঁড়ে তৈরি করতে। মৃণালিনী নানারকম মিষ্টি তৈরি করতে পারতেন। তাঁর মানকচুর জিলিপি, দইয়ের মালপো, পাকা আমের মিঠাই, চিঁড়ের পুলি যাঁরা একবার খেয়েছেন তাঁরা আর ভোলেননি। স্ত্রীর রন্ধন নৈপুণ্যে কবিও উৎসাহী হয়ে মাঝে মাঝে নানারকম উদ্ভট রান্নার 'এক্স্‌পেরিমেণ্ট' করতেন। শেষে হাল ধরে সামাল দিতে হতো মৃণালিনীকেই।

লেখাপড়া শেখার পর শিলাইদহে বাস করবার সময় মৃণালিনী কবির নির্দেশে রামায়ণের সহজ ও সংক্ষিপ্ত অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলেন। শেষ হয়নি। কবি সেই অসমাপ্ত খাতাটি তুলে দিয়েছিলেন মাধুরীলতার হাতে, বাকিটুকু শেষ করার জন্যে। অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার আগেই অকালে মাধুরীর জীবনদীপ নিবে যাবার পর আর খাতাটির খোঁজ মেলেনি। রথীন্দ্রের কাছে আর একটি খাতা ছিল—তাতে মৃণালিনী মহাভারতের কিছু শ্লোক, মনুসংহিতা ও উপনিষদের শ্লোকের অনুবাদ করেন। মৃণালিনীর লেখা আর কিছু কি ছিল? স্বর্ণকুমারীকে এ নিয়ে একবার প্রশ্ন করা হলে তিনি দৃপ্ত ভঙ্গীতে বলেছিলেন, "তাঁহার স্বামী বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, সেইজন্য তিনি স্বয়ং কিছু লেখা প্রয়োজন বোধ করেন নাই।"

খুবই সত্যি কথা, তবু মনটা খুঁতখুঁত করে বৈকি। ঠাকুরবাড়ির এই আমুদে বৌটি কি তাঁর মনের মধু সবটাই ঢেলে দিয়েছিলেন নীরব সেবায়! কালের সীমা পেরিয়ে কিছুই কি আমাদের কাছে এসে পৌঁছবে না? দ্বিপেন্দ্রনাথের স্ত্রী হেমলতার লেখা থেকেই শুধু পাওয়া যাবে মৃণালিনীকে? সুরসিক মৃণালিনীর একটা দুটো চিঠি অবশ্য রক্ষা পেয়েছে। সেই ছোট্ট সাংসারিক চিঠির মধ্যেও তাঁর পরিহাসপ্রিয় সহজ মনটি ধরা পড়েছে। সুধীন্দ্রনাথের স্ত্রী চারুবালাকে লেখা একটা চিঠিতে দেখা যাবে মৃণালিনী তাঁকে অনুযোগ করছেন অনেকদিন চিঠি না লেখার জন্যে। তার মধ্যে যে অনাবিল স্বচ্ছতা আছে তার সৌন্দর্য বুঝি কোন সাহিত্যিক চিঠির চেয়ে কম নয়।

"...তোমার সুন্দর মেয়ে হয়েছে বলে বুঝি আমাকে ভয়ে খবর দাওনি পাছে আমি হিংসে করি, তার মাথায় খুব চুল হয়েছে শুনে পর্যন্ত 'কুন্তলীন

মাখতে আবম্ভ করেছি, তোমাব মেয়ে মাথা ভবা চুল নিয়ে আমার ন্যাড়া মাথা দেখে হাঁসবে সে আমার কিছুতেই সহ্য হবে না। সত্যিই বাপু, আমার বড অভিমান হযেছে না হয় আমাদেব একটি সুন্দর নাতনী হয়েছে তাই বলে কি আর আমাদের একেবারে ভুলে যেতে হয়।"

শান্তিনিকেতন চলে গেলেও জোড়াসাঁকোব একান্নবর্তী পবিবারটির অন্তঃপুরের জন্যে মৃণালিনীব আন্তরিকতা কখনো হ্রাস পায়নি। দিনে দিনে তাঁর যে মূর্তিটি বড়ো হয়ে উঠেছে সে তাঁব জননী মূর্তি। শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয প্রতিষ্ঠার সময তার পূর্ণ পবিচয় পাওযা গেল। 'সৌমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী' সেখানে হযে উঠলেন অন্নপূর্ণা। মৃণালিনী রূপসী ছিলেন না, কিন্তু অপরূপ মাতৃত্বের আভা তাঁব মুখে লাবণ্যের মতো ঢলঢল করতো, "একবার দেখলে আবাব দেখতে ইচ্ছে হয" এই ছিল প্রত্যক্ষদর্শীব অভিমত। পাঁচটি সন্তানের জননী মৃণালিনীব এই মাতৃমূর্তি আবো সার্থক হযে উঠেছিল শান্তিনিকেতনে ঘর থেকে দূবে আসা শিশুগুলিকে আপন করে নেওয়ার মধ্যে।

শান্তিনিকেতনে আদর্শ বিদ্যালয প্রতিষ্ঠাব বাসনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেখানে গেলে মৃণালিনী তাঁর পাশে এসে দাঁড়িযেছিলেন। এই ধবণের কাণ্ডজ্ঞানহীনতায আত্মীয স্বজনেব উপদেশ, উপহাস, বিরুদ্ধতা, বিদ্রূপ সবই সহ্য করতে হয়েছিল। আত্মীয়দের খুব দোষ নেই, সর্বনাশেব মুখোমুখি গিয়ে কেউ দাঁড়াতে চাইলে তাকে তো সাবধান কববেনই। নাবালক পাঁচটি সন্তান, তার মধ্যে তিনটি মেযে অথচ কবি তাঁর যথাসর্বস্ব ঢেলে দিচ্ছেন আশ্রম বিদ্যালয়ে। লোকে বলবে না কেন ? মৃণালিনীর মনেও এ নিয়ে ভাবনা ছিল তবু তিনি স্বামীকে সব কাজে হাসিমুখে সাহায্য কবেছেন। যখনি কোন প্রয়োজন হয়েছে তখনই খুলে দিয়েছেন গাযেব প্রত্যেকটি গযনা। মৃণালিনী পেযেছিলেন প্রচুর। বিয়ের যৌতুকেব গযনা ছাড়াও শাশুড়ীর আমলের ভাবী গয়না ছিল অনেক। সবই তিনি কবির কাজে গা থেকে খুলে দিযেছিলেন। রথীন্দ্র লিখেছেন, "শেষ পর্যন্ত হাতে কয়েক গাছা চুড়ি ও গলায একটি চেন হার ছাড়া তাঁর কোন গয়না অবশিষ্ট ছিল না।"

শুধু গয়না দিযে নয়, আশ্রমের কাজেও মৃণালিনী স্বামীকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। আধুনিক অর্থে তাঁকে হয়তো প্রগতিশীলা বলা যাবে না কারণ শিক্ষাদীক্ষায় ঠাকুরবাড়ির মেয়েদেব ছাড়িয়ে অন্যান্য মেয়েরাও ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছিলেন। উগ্র আধুনিকতা এ বাড়িব মেয়েদের বক্তমজ্জায় প্রবেশ করেনি। দীর্ঘকাল ধরে জ্ঞানদানন্দিনীই সেখানে উগ্র আধুনিকতাব পবিচয় দিযে এসেছেন। কিন্তু মহৎ নাবীর পরিচয় মৃণালিনীর মধ্যে আছে। 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থ লেখবার সময় রবীন্দ্রনাথ এক জাযগায লিখেছেন, "মহাপুরুষের ইতিহাস বাহিরে নানা কার্যে এবং জীবন বৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর, মহৎ নারীর ইতিহাস···তাঁহার স্বামীর কার্যে রচিত হইয়া থাকে ; এবং সে লেখায় তাঁহার নামোল্লেখ থাকে না।" এরই মধ্যে আমরা মৃণালিনীর আসল পবিচয় খুঁজে পাবো। আজ আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের কথা খুঁটিয়ে বলতে বসেছি তাই, নযতো মৃণালিনীকে নিয়ে স্বতন্ত্র প্রসঙ্গেব অবতারণা করার সুযোগ বড়ো কম। তিনি রবীন্দ্রজীবনে, ঠাকুরবাড়িতে, শান্তিনিকেতনের আশ্রমে বিদ্যালয়ে মিশে আছেন ফুলেব সুরভির মতো, দেখা যায় না, অনুভবে মন ভরে যায়।

মৃণালিনী আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে ববীন্দ্রনাথের আশ্রম-বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা আরো সার্থক হতে পারতো। তিনি ব্রহ্মচর্য আশ্রমেব দেখাশোনা করতেন এবং অপরের কচিকচি শিশুদের অপবিসীম মাতৃস্নেহে নিজের কাছে টেনে নিয়ে তাঁদের হোস্টেলে আসার দুঃখ ভুলিয়ে দিতেন। বাড়ি থেকে দূরে এসেও ছেলেবা মাতৃস্নেহের আশ্রয় পেত। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের তীব্র আঘাত সহ্য করতে না পেরে আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপনের মাত্র এগারো মাস পরেই বিদায নিলেন মৃণালিনী। কবিব সমস্ত সেবা যত্ন ব্যর্থ করে দিযে শীতের পদ্মটি ম্লান হয়ে এলো, হারিযে গেল কবির প্রিয় পত্র-সম্বোধনটি "ভাই ছুটি"। কে জানতো এত শীঘ্র জীবন থেকে, সংসার থেকে ছুটি নিয়ে তিনি চলে যাবেন! জীবনের প্রতি পদে লোকান্তরিতা মৃণালিনীর অভাব অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথ "এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়—"। সংসারে যখন শুধুই কথার পুঞ্জ জমে উঠছে তখন তিনি বারবার স্মরণ করছেন লোকান্তরিতা স্ত্রীকে। অনুভব করছেন

তাঁর আশ্রম-বিদ্যালয় অসম্পূর্ণ থেকে গেছে কারণ "আমি তাদের সব দিতে পারি, মাতৃস্নেহ তো দিতে পারি না।" বাংলাদেশে আরো কয়েকজন আদর্শ জননীর পাশে মৃণালিনীর মাতৃমূর্তিটিও চিরস্থায়ী আসন পেয়েছে।

ঠাকুরবাড়ির বৌয়েদের সঙ্গে আরো একজনের কথা এ প্রসঙ্গে সেরে নেওয়া যাক। যোগমায়াকে নিশ্চয় মনে আছে, গিরীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রেমিকা ধর্মশীলা স্ত্রী, যিনি সাবেকী লক্ষ্মীজনার্দন ঠাকুরকে নিয়ে উঠে এসেছিলেন বৈঠকখানা বাড়িতে। সেদিন থেকে জোড়াসাঁকোর বাড়ি দু ভাগ হয়ে গেল কিন্তু মনের মধ্যে পাঁচিল ওঠেনি। বরং ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যোগ ছিল না নগেন্দ্রনাথের সন্দেহপরায়ণা স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরীর। সম্পত্তি সংক্রান্ত নানারকম সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাঁর ধারণা হয়েছিল মহর্ষিপরিবার তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চান। তাই তিনি সাডার স্ট্রীটের বাড়ি থেকে এ বাড়িতে কদাচিৎ এলেও কিছু খেতেন না। সব সময় তাঁর খাবার অন্য বৌদের চেখে দিতে হতো। যাক সে কথা। যোগমায়ার পুত্রদের সঙ্গে মহর্ষির পুত্রদের সৌহার্দ্য ঘোচেনি। মানসিকতার দিক থেকেও গুণেন্দ্র-পরিবার এঁদের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তাই এ দুটি বাড়ি প্রকৃতপক্ষে এক বাড়িই রয়ে গেছে। আবার গুণেন্দ্র পরিবার ব্রাহ্ম না হওয়ায় পাথুরেঘাটা বা কয়লাহাটা ঠাকুরবাড়ির সঙ্গেও তাঁদের যোগ ছিন্ন হলো না। এক কথায় এঁরা রইলেন দুই ঠাকুর পরিবারের ঠিক মাঝখানে। অন্যান্য ঠাকুরদের সঙ্গে রইল সামাজিক যোগ, মহর্ষিভবনের সঙ্গে হলো মানসিক যোগ। তাই দ্বারকানাথ লেনের পাঁচ নম্বর আর ছ নম্বরকে এক বাড়ি বলাই ভালো। আর সত্যিই তো এক সীমানার মধ্যে ছিল দুটি বাড়ি, এখন অবশ্য নেই। পাঁচ নম্বর বা দ্বারকানাথের সাজানো গোছানো অমন সুন্দর বৈঠকখানা বাড়িটিকে ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে, রক্ষা পেয়েছে শুধু অন্দরমহল সংলগ্ন বেনেবাড়িটি। এই বৈঠকখানা বাড়ির প্রকৃত গৃহিণী ছিলেন গুণেন্দ্রনাথের স্ত্রী সৌদামিনী।

বৃহৎ পরিবারে পাঁচটি সন্তানের জননী সৌদামিনীর কর্তৃত্বশক্তির পরিচয়

প্রথমটায় পাওয়া যায়নি। বোঝা গেল যেদিন তিনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে নানান্ সমস্যার সম্মুখীন হলেন।

যে বিচক্ষণতার সঙ্গে সৌদামিনী ভাঙ্গা সংসারেব হাল ধরেছিলেন তাব তুলনা হয না। গুণেন্দ্রনাথেব উদ্দাম জীবন উৎসবেব উন্মত্ততায এমন আকস্মিক-ভাবে নিঃশেষ হযে গেল দেখে তিনি মনঃস্থির করেছিলেন, তাঁর ছেলেদেব তিনি বিলাসের ফাঁস থেকে যেমন করে হোক বক্ষা কববেন। বল্‌গাহীন প্রমোদের স্রোতে ভেসে যেতে দেবেন না। এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যে কত কঠিন সেকথা আজ আমবা বুঝতে পারবো না। উনিশ শতকের শিক্ষা-সংস্কৃতি-নবজাগরণেব ফাঁক দিযে তখন বযে চলেছে বাবুয়ানীর তীব্র পঙ্কিল স্রোত। একদিকে যেমন স্কুল খোলা, পত্রিকা প্রকাশ, সমাজসেবার ধূম অপরদিকে তেমনি নগরনটীদের নূপুব নিক্বণ আব পেয়ালাভবা সুবাব রক্তিম আহ্বান। ধনী সন্তানেরা দেশী বিলিতি উভয় ধরণেব বিলাসিতাতেই অভ্যস্থ হয়ে উঠছেন।

বড়োলোকের ছেলে বিলাসী হবে না? সে কি কথা? গোঁফ ওঠাব সঙ্গে সঙ্গেই তো তাঁদেব তালিম দিযে 'আলালের ঘবে দুলালে' পবিণত কবা হতো। যখনকার যা দস্তুব! ঠাকুববাডিতে ধনের অভাব ছিল না, অভাব ছিল না বনেদিয়ানার। তবে? বাবুযানী না দেখালে আভিজাত্য থাকবে কি কবে? কলকাতার আর পাঁচটা ধনী পরিবাব কি কবছে? সৌদামিনী শক্ত হলেন। যেখানে যা হয হোক। পাশেই তো বযেছে মহর্ষিভবন। সেখানে তো আনন্দের উপাদানের নীচে বযে যাচ্ছে না পঙ্কিল বিলাসের স্রোত। তাই হলো শেষ পর্যন্ত। সেকেলে বাবুযানীর ক্রমাগত হাতছানি অনায়াসে উপেক্ষা কবে গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্র মহর্ষিপুত্রদের মতোই নানা গুণের অধিকাবী হয়ে উঠলেন। সব দিকে থাকতো সৌদামিনীব প্রখর দৃষ্টি। তিনি কখনো নিজের ইচ্ছের কথা জোর করে জানাতেন না, কোথাও ছিল না জেদ বা জবরদস্তিব কোন চিহ্ন। তবু তাঁরই ইচ্ছায় তাঁরই প্রাণের প্রভাবে ছেলেরা চলেছে। কেউ এতটুকু প্রতিবাদ করতে পারেনি। বাইরে কঠিন ভেতরে কোমল এই অসামান্যা নারী রবীন্দ্রনাথেরও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। বহুদিন পরে কথাপ্রসঙ্গে

কবি রাণী চন্দকে বলেন,…"আমাদের গগনদেব মা ছিলেন, যাঁকে ভুলেও শিক্ষিতা বলা যাব না, কিন্তু কী সাহস আব কী বুদ্ধিতে তিনি চালিয়েছিলেন সবাইকে। তিন তিনটি ছেলেকে কী ভাবে মানুষ করে তুললেন।…ছেলেরা তাদের মাকে যা ভক্তি কবে অমন সচরাচব দেখা যায় না।"

সৌদামিনী শুধু ছেলেদের মানুষ কবেছিলেন তা নয ঋণের বোঝায় সংকটাপন্ন জমিদারীকেও একেবাবে নতুন করে দিযেছিলেন। তাঁব কথা মনে হলেই যেন 'যোগাযোগ' উপন্যাসের 'বড়বৌ' অর্থাৎ কুমুব মাকে মনে পড়ে যাব।

সর্বদিকে নজর রাখতে গিযে সৌদামিনী অবশ্য নিজের দিকে একেবাবেই তাকাতে পাবেননি। সাহিত্য বা শিল্পচর্চার নজির না থাকলেও নানারকম মেযেলী গুণের অধিকারী ছিলেন সৌদামিনী। মনে হয তাঁর নাতনীদের মধ্যে পবে যেসব গুণেব প্রকাশ হয়েছিল সবই তাঁর মধ্যে অল্পবিস্তর ছিল, নাহলে কারুব মধ্যে কোন গুণের সামান্য স্ফুলিঙ্গ দেখলেই তিনি তাকে চিনতেন কি করে! তাছাড়া তিনি বেশ চবকা কাটতে পাবতেন। তাঁব নিজের হাতে কাটা সুতোয় বোনা কাপড় শান্তিপুবী কাপড়ের মতো মিহি দেখাতো। নাতনীদেবও সবাইকে তিনি একটা করে চরকা কিনে দিযেছিলেন। রোজ সুতো কেটে তাদের দেখাতে হতো। হাতে তৈবি জিনিষ বা স্বদেশী কুটির শিল্পের প্রতিও তাঁব আগ্রহ ছিল। গ্রামাঞ্চল থেকে মেযেবা তাদেব হাতেব তৈবি খেলনা বা পুতুল বিক্রী কবতে এলে তিনি তাদের উৎসাহ দেবার জন্যে সব কিনে নিতেন। এমনকি স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিও তাঁর সহানুভূতি ছিল। অর্থ-সাহায্য ছাড়াও তাঁর বাড়িতে গোপনে অনুশীলন সমিতির কাজ হতো। এরকম ছোটখাটো অনেক ঘটনা দেখে বোঝা যায় সৌদামিনী প্রগতিশীলা ছিলেন না ঠিকই কিন্তু অসাধারণ এবং দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁকে এবং তাঁব মতো আবো কযেকজন বধূকে দেখে জানা যায়, ব্রাহ্ম সমাজে বা নারী প্রগতি-স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি নবজাগ্রত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যেসব মেয়েব যোগ ছিল না তাঁরাও কম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে যাননি। এঁদের কথা আলোচনা না কবে শুধু প্রগতিশীলা জ্ঞানদানন্দিনী-কাদম্বরী-স্বর্ণকুমারীব কথা মনে রাখলে ঠাকুববাড়ির

অন্দরমহলের. পরিচয় যেমন সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে না তেমনি জানা যাবে না এই মহীয়সীদের প্রভাবে এ পরিবারের পুরুষদের শিল্পীস্বভাব কি করে গড়ে উঠেছিল। যাক সে কথা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভাময়ী নাতনীদের সংখ্যাও কম নয়। উপযুক্ত পরিবেশে, প্রতিভাবান পিতামাতার প্রভাবে তাঁরাও অনেকেই নানান্ গুণের অধিকারিণী হয়ে উঠেছিলেন। ভিন্ন পরিবার থেকে আসা কয়েকজন নাতবৌও যে কৃতিত্বের পরিচয় দেননি তা নয়। আসলে এ সময় বাংলাদেশে অভাবনীয় নারীজাগরণের উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল। মেয়েরা নিজেরাই ঠেলেঠুলে বেরিয়ে এসেছিলেন বাইরে। প্রথম পর্যায়ে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের কাজকর্ম দেখে যেমন মেয়েরা সবাই হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এখন ঠিক সে অবস্থা রইলো না। মহর্ষির নাতনীদের সমবয়সী অনেকগুলি গুণবতী মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেল। অবশ্য ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাও যে দূরে সরে গেলেন তা নয়। তাঁরা এখন অস্পৃশ্যা মানবী নন বরং উঁচু মহলের আভিজাত্যের প্রতীক এবং অনুকরণযোগ্যা। সমাজ ধিক্কারের বদলে তাঁদের রুচিবোধের প্রশংসা করলো। শিল্পে-সাহিত্যে ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতির একটা নিজস্ব ছাপ পড়তেও শুরু হলো। বস্তুত: ১৮৭৫ থেকে ১৯২৫ এই পঞ্চাশ বছরটাকে যদি এক ঝলকে এক পলকে দেখে নেওয়া যেত তাহলে ঠাকুরবাড়ির সোনালি সফল দিনগুলোকেও একসঙ্গে দেখা যেত। বাংলার নারী সমাজেও এই সময় এসেছে যুগান্তর। ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরেও জ্ঞানদানন্দিনী-স্বর্ণকুমারী-মৃণালিনী-সৌদামিনীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রতিভা-ইন্দিরা-সরলা-শোভনারা। সবাইকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একসঙ্গে। কিন্তু আলোচনার সুবিধের জন্যে 'একের পর এক' নীতি মেনে নিতে হলো। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সঙ্গে এবার পাল্লা দিলেন অন্যান্য মেয়েরাও। সবার দানেই নারীপ্রগতি আজকের দিনে এত বেশি সার্থক হয়ে উঠেছে।

মহর্ষির নাতনীদের মধ্যে সবচেয়ে বয়সে বড়ো সৌদামিনীর মেয়ে ইরাবতী আর হেমেন্দ্রনাথের মেয়ে প্রতিভা। দৌহিত্রীদের সবাই না হলেও ঠাকুরবাড়িতে

যাঁরা মানুষ হয়েছেন তাঁদের আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে মনে করবো। যদিও ইরাবতীর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগ খুব বেশিদিনের নয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী ছিলেন। বিয়ে হয়েছিল পাথুরেঘাটার সূর্যকুমারের দৌহিত্র নিত্যরঞ্জনের সঙ্গে। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই নিত্যরঞ্জন থাকতেন কাশীতে। গোঁড়া হিন্দু পরিবার হওয়ায় তাঁরা অনেকদিন ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যোগ রাখেননি। ইরাবতী বাপের বাড়ি এসেছিলেন বিয়ের আঠেরো বছর পরে। তবে তাঁর যে একটি কল্পনাপ্রবণ মন ছিল সেটি ধরা পড়ে সেই ছোটবেলাতেই, যখন তিনি 'রাজার বাড়ি'র কথা বলে সমবয়সী মামাটিকে বোকা বানিয়ে দিতেন। তিনি হঠাৎ এসে বলতেন, 'আজ রাজার বাড়ি গিয়েছিলাম'। বালকের কল্পনা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ফুলে ফেঁপে উঠতো। তার মনে হতো, রাজার বাড়ি খুব কাছে, এই বড়ো বাড়িটারই কোন একটা জায়গায়, কিন্তু কোথায় সেটা। বালকের ব্যাকুল প্রশ্ন বুক চিরে উঠে আসতো, "রাজার বাড়ি কি আমাদের বাড়ির বাহিরে?"

ইরাবতী মজা পেয়ে বলতেন, "না, এই বাড়ির মধ্যেই।" তিনি জানতেও পারেননি এই ছোট্ট কথাটি তাঁর মামার মনে কী আলোড়ন জাগায়। কল্পনার সোপানে সেই প্রথম পদার্পণ! বালক শুধু ভাবতেন, "বাড়ির সকল ঘরই তো আমি দেখিয়াছি কিন্তু সে ঘর তবে কোথায়?" রাজা কে কিংবা রাজত্ব কোথায় সে কথা তিনি জানতে পারেননি; শুধু মনে হয়েছে, তাঁদের বাড়িটাই রাজার বাড়ি। রবীন্দ্রনাথের শৈশব-কল্পনা উজ্জীবনে ইরাবতীর ভূমিকাটিকে তাই আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

ইরাবতীর ছোট বোন ইন্দুমতীর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগ আরও কম। তাঁর স্বামীর নাম নিত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুরবাড়িতে দুই জামাই 'বড়ো নিত্য' ও 'ছোট নিত্য' নামেই পরিচিত ছিলেন। ইন্দুমতী থাকতেন সুদূর মাদ্রাজে। ছোট নিত্য সেখানকার ডাক্তার ছিলেন। সেখানে তাঁরা এ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ান সমাজের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতেন বলে ইন্দুমতী বিদেশী চালচলনে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন। তাঁর যতগুলি ফোটো আমরা দেখেছি সেগুলো সবই গাউন পরা বিদেশিনীর সাজে। ইন্দুমতীর এক মেয়ে লীলার বিয়ে হয়েছিল প্রমথ চৌধুরীর

ভাই মন্মথর সঙ্গে। চিত্রাভিনেত্রী দেবিকারাণী এই লীলারই মেয়ে।

প্রতিভা বা প্রতিভাসুন্দরী রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র পাঁচ বছরের ছোট। মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান প্রতিভা। সত্যিই প্রতিভাময়ী তিনি। হেমেন্দ্র তাঁকে সর্বগুণে গুণান্বিতা করে তোলার জন্যে একেবারে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তাই প্রতিভা প্রথম জীবনে অবকাশ পেয়েছেন খুব কম। সাদাসিধে বেথুন স্কুলের বদলে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন লরেটো হাউসে। লরেটোতে প্রতিভাই প্রথম হিন্দু (ব্রাহ্ম) ছাত্রী। তখনও মেয়েদের পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা চালু না হওয়ায় প্রতিভা কোন পরীক্ষা দিতে পারেননি তবে ওপরের ক্লাস পর্যন্ত উঠেছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রতিভা বা তাঁর বাবা হেমেন্দ্রনাথ কেউই এ সময় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার কথা ভাবেননি অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধ দরজা খোলবার প্রথম চেষ্টা করেন চন্দ্রমুখী বসু। তিনি সময়ের দিক থেকে প্রতিভার সমসাময়িক। মেয়েদের শিক্ষা প্রসারে চন্দ্রমুখীর দান অসামান্য। তিনি এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রথমে দেরাদুনের নেটিভ ক্রিশ্চান গার্লস মিশনারী স্কুলের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড হেরনের কাছে প্রার্থনা জানালেন। হেরন প্রথমে তাঁকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পরীক্ষা দেবার সংকল্প ত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু চন্দ্রমুখীর কাতর অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমতিও প্রার্থনা করলেন। সত্যিই তো, ছেলেরা যদি পরীক্ষা দিতে পারে তবে এই মেয়েটি পারবে না কেন? কি তার অপরাধ?

অপরাধ না থাকুক সহজে চন্দ্রমুখীকে অনুমতি দেয়নি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অনেক তর্কাতর্কির পর ১৮৭৬ সালের ২৫শে নভেম্বরের সিণ্ডিকেট সভা চন্দ্রমুখীকে এই শর্তে পরীক্ষায় বসতে দিতে রাজী হলো যে তাঁকে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে না এবং পরীক্ষকরা তাঁর খাতা দেখে যদি বা পাশের নম্বর দেন তবু পাশকরা ছাত্রদের তালিকায় তাঁর নাম থাকবে না। চমৎকার সিদ্ধান্ত! ধন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। চন্দ্রমুখী তাতেই রাজী হলেন এবং পাশও করলেন। এ সময়ও ঠাকুরবাড়ির কোন মেয়ে এগিয়ে এলেন না পরীক্ষা দিতে অথচ ঘরে বসে তখন প্রতিভা চন্দ্রমুখীর মতোই শিক্ষিতা হয়ে উঠেছেন। তাই ঠাকুরবাড়ির

মেয়েরা প্রথম স্কুলযাত্রিনীদের একজন হয়েও প্রথম কলেজে পড়া ছাত্রীব গৌরব থেকে বঞ্চিত হলেন।

প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট হিসেবেও চন্দ্রমুখীর নাম করা যায়। সে সময় তাঁর সঙ্গিনী ছিলেন মাত্র আব একজন, কাদম্বিনী বসু। পরে যিনি প্রথম মহিলা চিকিৎসক হয়েছিলেন। এব সবটাই যে শুধু এই দুটি মেয়ের চেষ্টায সম্ভব হয়েছিল তা নয। এদিকে অনেকেবই দৃষ্টি পড়েছিল। ঢাকার 'অবলাবান্ধব' দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যাযেব আপ্রাণ চেষ্টায মেযেরা একটা অতিরিক্ত টেস্ট পরীক্ষায বসার অনুমতি পেলেন। এবাবে পাশ করলেন কাদম্বিনী। তিনি কলেজে পড়ার জন্যে অনুমতি চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় শেষে সম্মতি দিল। তার পবের ইতিহাস তো সংক্ষিপ্ত। বেথুন কলেজেব একমাত্র ছাত্রী হিসেবে কাদম্বিনী এবং ফ্রিচার্চ অব স্কটল্যাণ্ড থেকে বি. এ. পড়লেন চন্দ্রমুখী। ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষাব ফল প্রকাশ হলে দেখা গেল সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেব মধ্যে প্রথম দুটি মহিলা গ্র্যাজুয়েটের নাম চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী। তখনও ইংলণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালযেব দরজা মেয়েদের জন্যে খুলে যায়নি। চন্দ্রমুখী পরে এম. এ পাশ করেন আর কাদম্বিনী হন চিকিৎসক। ভারত থেকে তাঁকে ডাক্তাব হবাব অনুমতি দেওযা হয়নি বলে তিনি বিলেত থেকে ডাক্তার হযে আসেন। সে যুগে এই দুজনকে দেখবার জন্যে বাস্তায লোকেব ভিড় জমে যেত। বিশেষ করে মেযেরা তাঁদের দেখতো শ্রদ্ধা মেশানো বিস্ময নিযে। এঁদের সঙ্গে প্রতিভার নামটি যুক্ত হলেই হযতো সব দিক দিযে সুন্দব দেখাতো কিন্তু পরীক্ষাব ব্যাপাবে ঠাকুববাড়িব মেযেরা বেশ খানিকটা পিছিযেই বইলেন। এগিয়ে গেলেন শিল্প-সংস্কৃতিব জগতে।

সঙ্গীতের জগতে বাঙালী মেয়েদের জন্যে আরেকটি মুক্তির পথ খুলে দিয়েছিলেন প্রতিভা। প্রাচীন প্রথা না মেনে হেমেন্দ্র তাঁর স্ত্রীকে গান শিখিযেছিলেন। প্রতিভা চর্চা কবেছিলেন দেশি-বিলিতি উভয সঙ্গীতেরই। শুধু তাই নয়, চিরকালেব ট্র্যাডিশন ভেঙ্গে প্রতিভা তাঁব ভাইয়েদেব সঙ্গে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইলেন মাঘোৎসবেব প্রকাশ্য জনসভায়। আর একটি নতুন

নক্ষত্রের আত্মপ্রকাশে খুশি হলেন সুধীসমাজ। মেয়েকে গান শেখানোর ব্যাপারে কার্পণ্য করেননি হেমেন্দ্র। বাড়ির ওস্তাদ বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে তালিম নেওয়া ছাড়াও বিদেশী গান ও পিয়ানো শিখতেন প্রতিভা। আরো নানারকম বাদ্যযন্ত্রও শিখেছিলেন। ১৮৮২ সালে লেখা হেমেন্দ্রের একটি চিঠিতে দেখা যাচ্ছে তিনি প্রতিভাকে বিলিতি গান সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন,

"…কেবল নাচের বাজনা ও সামান্য গান না শিখিয়া যদি Beethoven প্রভৃতি বড়ো বড়ো German পণ্ডিতদের রচিত গান বাজনা শিক্ষা করিতে পারো, এবং সেই সঙ্গে music theory শেখ তবেই আসল কর্ম হয়।"

প্রতিভা তাঁর বাবার ইচ্ছা সর্বাংশে পূরণ করে মেয়েদের মধ্যে গানের ব্যাপারে অভিজ্ঞ হয়ে উঠলেন। 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভায় তাঁর গান আর সেতার শুনে খুশী হয়ে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন তাঁকে দিলেন স্বরলিপির বই, রঘুনন্দন ঠাকুর দিলেন বিশাল তানপুরা। গান ছাড়াও আর একটা ব্যাপারে ট্র্যাডিশন ভাঙলেন প্রতিভা। চন্দ্রমুখী-কাদম্বিনী যেমন বাঙালী মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন প্রতিভা তেমনি সুযোগ করে দিলেন গান করার ও অভিনয় করার। এই দুঃসাহসিক নজির তাঁর কাকীমাদের ঘোড়ায় চড়া বা বিলেত যাওয়ার চেয়ে খুব কম সাহসের কথা নয়। তাঁর কাকীমা, পিসীমারা অভিনয় করেছিলেন ঘরোয়া আসরে। দর্শক হিসেবে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই আপনজন, চেনাশোনা মানুষ সুতরাং লজ্জা ছিল না। সাধারণ মানুষ, যাদের আমরা বলি পাবলিক, সর্বপ্রথম তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিভা। ঠাকুরবাড়ির যে কোন উৎসবে তাই মানুষ ভেঙ্গে পড়তো। তারা শুনতো বাঙালী মেয়েদের গাওয়া গান, অবাক হয়ে দেখতো মেয়েরা আসরে বসে গান গাইছে। তারপর 'বিদ্বজ্জন সমাগমে'র সভায় মেয়েরা অভিনয় করতেও এগিয়ে এলেন। সবার আগে প্রতিভা, 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সরস্বতী হয়ে।

রবীন্দ্রনাথ যখন বিলেত থেকে ফিরে এলেন তখন ঠাকুরবাড়িতে শুরু হয়েছে গীতিনাট্যের যুগ। স্বর্ণকুমারী ও জ্যোতিরিন্দ্রের লেখা 'বসন্ত-উৎসব' 'মানময়ী'র ঘরোয়া অভিনয় হয়ে গেছে কয়েকবার। এমন সময় রবীন্দ্রনাথ দেশী বিলিতি

সুর ভেঙ্গে লিখলেন একটি নতুন অপেরাধর্মী গীতিনাট্য। রামায়ণের সুপরিচিত রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকিতে রূপান্তরের কাহিনীটিকে তিনি বেছে নিলেন, এই নাটকে তিনটি নারী চরিত্র রয়েছে। বালিকা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। নাটক লেখার পরেই যখন রিহার্সাল শুরু হলো তখন রবীন্দ্রনাথ সরস্বতীর ভূমিকায় প্রতিভার অপূর্ব অভিনয় দেখে নাটকের সঙ্গে প্রতিভার নামটি জুড়ে নতুন নাম দিলেন "বাল্মীকিপ্রতিভা"।

এরপর স্থির হলো 'বিদ্বজ্জন সমাগম' সভায় 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয় হবে। সেদিনটা ছিল শনিবার। ১৬ই ফাল্গুন বাংলা ১২৮৭ সাল। সন্ধ্যেবেলা। বসন্তের মৃদুমন্দ দখিণা বাতাস বইছে। দর্শকরা উপস্থিত। এমন সময়ে শুরু হলো 'বাল্মীকিপ্রতিভা'। ডাকাতের আনাগোনা। গুরুগম্ভীর পরিবেশ। দর্শকেরা মুগ্ধ। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! ক্রৌঞ্চমিথুনের জায়গায় সত্যিকারের দুটো মরা বক। বকদুটো অবশ্য জোগাড় করে এনেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ছোট ভাইয়ের নাটক মঞ্চস্থ হবে, জ্যোতিরিন্দ্র মহা উৎসাহে পাখি শিকারে বেরোলেন। কিন্তু কোথায় পাখি? সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে খালি হাতে ফিরে আসছেন তখন দেখলেন একজন অনেকগুলো বক বিক্রী করতে যাচ্ছে। তার কাছ থেকে দুটো বক কিনে, মেরে বাড়ি নিয়ে আসেন। সেকালে অনেকেই স্টেজের মধ্যে বাস্তব জগৎকে টেনে আনতে চেষ্টা করতেন। শুধু সেকালে কেন? একালেও রিয়্যালিস্টিক স্টেজ করার চেষ্টা কম হয় না। স্টেজের মধ্যে ট্রেন-সেতু-বন্যা-গাড়ি এসব আনার মধ্যেও সেই একই মানসিকতা কাজ করছে। 'কালমৃগয়া'র অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটা পোষা হরিণকে স্টেজে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই জাতীয় জিনিষের সূচনা হয় বেঙ্গল থিয়েটারের 'পুরুবিক্রম' নাটকে। ছাতুবাবুদের বাড়ির শরচ্চন্দ্র ঘোষাল পুরু সেজেছিলেন। তিনি একটা সত্যিকারের সাদা তেজিয়ান ঘোড়ার পিঠে চেপে স্টেজে আসতেন।

'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনবত্ব ছিল অভিনেত্রীর আবির্ভাবে। হাত বাঁধা বালিকার ভূমিকায় সত্যিই একটি অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকা এসে বসলো।

প্রতিভাকে চিনতে পারলেন অনেকে। এই মেয়েটিই তো সেবার মুগ্ধ করেছিল গান শুনিয়ে, এবারও মুগ্ধ করলো সরস্বতী সেজে। নাটকের শেষে এক অনির্বচনীয় তৃপ্তির রেশ নিয়ে গেল সবাই। 'আর্যদর্শন' কাগজে যখন এই অভিনয়ের সংবাদ ছাপা হলো তখন দেখা গেল সমালোচক প্রতিভার অভিনয়ের প্রশংসা করে লিখেছেন, "শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা নাম্নী কন্যা প্রথমে বালিকা পরে সরস্বতীমূর্তিতে অপূর্ব অভিনয় করিয়াছিলেন।" প্রতিভা সৌভাগ্যবতী তাই প্রথম মঞ্চাবতরণের পর তাঁকে সহ্য করতে হয়নি অপমানের গ্লানি। বরং কলারসিকেরা তাঁকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিই জানিয়েছেন।

'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় কিন্তু আরও একটি নারীচরিত্র ছিল—লক্ষ্মী। এই প্রথমবারের অভিনয়ে খুব সম্ভব লক্ষ্মী হয়েছিলেন শরৎকুমারীর বড়ো মেয়ে সুশীলা। ইন্দিরা সেরকম ইঙ্গিতই করেছেন। অথচ 'আর্যদর্শনে'র সমালোচক লক্ষ্মীর কথা উল্লেখ করেননি দেখে অবাক হতে হয়। তখনকার দিনের পক্ষে লক্ষ্মীর ভূমিকা দেখেও তো মুগ্ধ হবার কথা। বাইরের রঙ্গমঞ্চে অবশ্য তখন বড়ো বড়ো অভিনেত্রীর আবির্ভাব হয়েছে, নটী বিনোদিনীর অভিনয়ে কলকাতা সরগরম। তবু কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে তখনও অভিনয়ের কথা ভাবতেই পারতেন না। মনে হয় সুশীলার অভিনয় খুব ভালো হয়নি। তবু তাঁর প্রথম প্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দন-যোগ্য। সুশীলার কথা এর পরেও আর শোনা যায়নি। তাঁরা ছিলেন চার বোন। অপর তিনজন সুপ্রভা, স্বয়ংপ্রভা ও চিরপ্রভা। শেষোক্ত দুজনের নাম ছাড়া আর কিছু জানা যায়নি তবে সুপ্রভা সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। ঠাকুর-বাড়িতে বাস করেও এঁরা কেউ চারুপাঠের বেশি লেখাপড়া যেমন শেখেননি তেমনি শিল্পকলার চর্চা করেছেন বলেও শোনা যায়নি। সুপ্রভা তারই মধ্যে অসাধারণ প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণা এবং সুরসিকা ছিলেন। বিখ্যাত শিল্পী অসিত হালদার তাঁর সন্তান।

ঠাকুরবাড়িতে সুশীলার মতো সুপ্রভাও দু একবার অভিনয় করেছিলেন। বোধহয় হিরণ্ময়ীর বিয়ের সময়। স্বর্ণকুমারীর লেখা 'বিবাহ উৎসবে'র অভিনয়ে সুপ্রভা সাজলেন নায়কের বন্ধু। ঠাকুরবাড়িতে প্রত্যেক বিয়েতে একটা করে

থিয়েটার হতো। অন্যান্য বড়ো লোকের বাড়িতে হতো বাঈনাচ বা পেশাদার যাত্রা ও থিয়েটার। মহর্ষি ভবনে বাঈনাচ কোনদিনই হতো না। তার বদলে ছেলেরা ও মেয়েরা একটা করে নাটক অভিনয় করতেন। এই অভিনয় আরো আবশ্যিক বা 'কম্পালসারি' হয়েছিল আরেকটা কারণে। সে সময় ঠাকুরবাড়িতে সব আত্মীয়স্বজন অবাধে আসতে পারতেন না এমনকি পাঁচ বা ছয় নম্বরের অধিবাসীরাও নয়। ইচ্ছে থাকলেও সামাজিক বাধা ছিল, মহর্ষি পরিবার ব্রাহ্ম, তাঁরা হিন্দু বিয়েতে যেখানে শালগ্রাম শিলা আছে সেখানে যাবেন না। অপরদিকে গুণেন্দ্র পরিবারও ওবাড়ির কাউকে নিমন্ত্রণ করতেন না পাছে অন্য আত্মীয়েরা ব্রাহ্মদের সঙ্গে পংক্তি ভোজনে না বসেন। অথচ কে না চায় আনন্দ অনুষ্ঠানে সবাই আসুক। তাই বিয়ের পরদিন কিংবা আট দিনের দিন একটা নাটক অভিনয় হতো এবং তাতে সবাই নিমন্ত্রিত হতেন। এ সময় মিষ্টান্ন বিতরণ হতো হাতে হাতে, পংক্তিভোজন না হওয়ায় জাত-পাঁতের বালাই নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতেন না। এই রকমই একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে সুপ্রভা সাজলেন নায়কের সখা। 'বিবাহ উৎসব' আরো একবার অভিনীত হয় সুপ্রভার বিয়ের সময়। বিয়ের কনে হয়ে যাওয়ায় সুপ্রভার ভূমিকাটি পান স্বর্ণকুমারীর ছোট মেয়ে সরলা।

'বিবাহ উৎসবে'র কথায় আরো কয়েকজনের কথা মনে পড়ে। একজন এ নাটকের নায়ক, তাঁর নামও সুশীলা তবে তিনি ঠাকুরবাড়ির মেয়ে নন, বৌ। দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী। অপরজন এ নাটকের নায়িকা সরোজাসুন্দরী। সরোজাসুন্দরী এবং উষাবতী দ্বিজেন্দ্রনাথের দুই মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়ের দৌহিত্র বংশে—মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মোহিনীমোহন ভারতীয় থিয়সফিস্ট আন্দোলনের উদ্যোক্তা, পরে তিনি দীর্ঘ সাত বছর আমেরিকায় বাস করেন। তাঁর দার্শনিক চিন্তা, কবিত্ব শক্তি আর ইংরেজি ভাষার ওপর চমৎকার দখল সেকালে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অন্যান্য গ্রন্থ রচনা ছাড়াও তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। এঁর আরেক ভাই রজনীমোহনের

সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল অবন-গগনের ছোট বোন সুনয়নীর এবং বোন হেমলতার সঙ্গে দ্বিপেন্দ্রনাথের বিয়ে হয় তাঁর প্রথমা স্ত্রী সুশীলার মৃত্যুর পরে।

সরোজা ছিলেন অসামান্যা রূপসী এবং সুগায়িকা। তাই 'বিবাহ উৎসবে' তিনি নিয়েছিলেন নায়িকার ভূমিকা। পরে অবশ্য সুগৃহিণী হিসেবে তিনি যতটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বহির্জগতে ততটা ছড়িয়ে পড়তে পারেননি। তবে সমাজসেবিকারূপে তাঁর দুই মেয়ে গীতা চট্টোপাধ্যায় ও দীপ্তি চট্টোপাধ্যায় সারাজীবন নিরলসভাবে বহু কাজ করে গিয়েছেন। ঊষাবতী গাইতেন কোরাসে। একবার 'কালমৃগয়া'য় তিনি ও ইন্দিরা সেজেছিলেন বনদেবী। ঠাকুরবাড়িতে এঁদের অভিনয় বা অন্যান্য ভূমিকা হয়তো খুব স্মরণীয় নয়। কিন্তু সম্মিলিতভাবে এঁরা ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলকে যেভাবে আলোকিত করে তুলেছিলেন সে কথা ভোলা যায় না। তাছাড়া কোনদিন যদি রবীন্দ্র নাটকের প্রতিটি অভিনয়ের পাত্র-পাত্রীদের খোঁজ করা হয় তাহলেও দেখা যাবে তাঁর প্রথম দিকের নাটক এবং গানকে বাড়ির ছেলেমেয়েরাই সবার সামনে তুলে ধরেছেন।

আবার 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র কথাতেই ফিরে আসা যাক। একবার বেশ বড়ো মাপের 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয়ের আয়োজন করা হলো। ১৮৯৩ সালে লেডি ল্যান্সডাউনের সম্বর্ধনা উপলক্ষে। এর আগে এক যুগ ধরে (১৮৮১-১৮৯২) 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র বহু মঞ্চাভিনয় হয়ে গেছে। প্রতিবারই সরস্বতী সেজেছেন প্রতিভা এবং বাল্মীকি রবীন্দ্রনাথ। এবার আমন্ত্রণ জানানো হলো বহু গণ্যমান্য ইংরেজ দর্শকদের। স্টেজ সাজাবার ভার দেওয়া হলো দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্যতম পুত্র নীতীন্দ্রনাথকে। তিনি প্রাণপণে স্টেজে 'ন্যাচারাল এফেক্ট' আনবার চেষ্টা করলেন। বারান্দা থেকে টিনের নল লাগিয়ে বৃষ্টির জল পড়ার ব্যবস্থাও হলো। সাহেবরা খুব খুশি। এবার হাত-বাঁধা বালিকা সাজলেন প্রতিভার সেজো বোন অভিজ্ঞা আর লক্ষ্মী সাজলেন সত্যেন্দ্র-দুহিতা ইন্দিরা। সরস্বতীর ভূমিকা তো প্রতিভার বাঁধা। সাদা সোলার পদ্ম ফুলে শুভ্র সাজে প্রতিভা যখন অস্ট্রিচ পাখির ডিমের খোলা দিয়ে তৈরি বীণাটি হাতে নিয়ে বসেছিলেন তখন প্রথমে

সবাই ভাবলো মাটির প্রতিমা। তাই শেষে প্রতিভা যখন উঠে এলেন তখন অডিয়েন্স মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল। এই অভিনয়টিব সাফল্য প্রমাণ করলো ঠাকুরবাড়ির শিল্পরুচির শুচিতা এবং মাধুর্য। নাটক এবং অভিনয় বললেই যে আদিরসাত্মক একটি প্রণয় কাহিনী বা ভক্তিরসাশ্রিত পৌরাণিক কাহিনী বেছে নেবার দরকার নেই সেকথাও সকলেই বুঝলো।

প্রতিভা পরবর্তী জীবনেও গানেব জন্যে অনেক সাধনা করেছেন। সৌভাগ্যক্রমে এঁকে কোন বাধা পেতে হয়নি। সবোজাব স্বামীব মতো প্রতিভার স্বামীও ছিলেন বিখ্যাত ব্যক্তি, ববীন্দ্র-সুহৃদ আশুতোষ চৌধুবী। দ্বিতীয়বার বিলেত যাবার সময় রবীন্দ্রনাথ আশুতোষের সঙ্গে পরিচিত হন। পাবনার বিখ্যাত চৌধুবী পরিবাবের সন্তান আশুতোষ এসেছিলেন ভিন্ন পরিবেশ থেকে। বন্ধনমুক্ত উদার সমাজ পরিবেশ বা সংস্কৃতির আলো কোনটাই তিনি প্রথম থেকে পাননি কিন্তু যা করেছিলেন তারও নজিব মেলে না। তাঁবা সাত ভাই-ই বিবিধ গুণেব অধিকারী ছিলেন। বিশেষ করে আশুতোষ ও প্রমথ-র তো কথাই নেই। বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁকে পাওয়া যায় সমালোচকরূপে। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'কে যথোচিত পর্যাযে সাজিয়ে তিনিই প্রকাশ করেন। শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁব সবচেযে বড়ো কৃতিত্ব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বছরে বি. এ. ও এম. এ. পাশ কবা (১৮৮০)। আশুতোষ বিলেত যাচ্ছিলেন বেশ কাঠখড় পুড়িযে। তাঁর দিদি প্রসন্নময়ীর লেখা 'পূর্বকথা' পড়ে জানা যায় আশুতোষের পথ মোটেই সুগম ছিল না। চৌধুরীবংশের মধ্যে আশুতোষই প্রথম বিলেত গেলেন। তার আগে তাঁদেব জেলাব আর কেউ বিলেত যাননি। ফলে 'জাত গেল', 'জাত গেল' রব উঠলো চাবদিকে। চৌধুরীরা কেউ প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে ওঠবার চেষ্টা না করাতে সমাজপতিবা আক্রমণ করলেন আশুতোষের বিধবা পিসীদের। তাঁদের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হলো। প্রত্যেকে পাঁচ কাহন কড়ি দিয়ে মাথা মুড়িয়ে তবে অব্যাহতি পেলেন। প্রসন্নমযী লিখেছেন, "তাঁহারা তো বালবিধবা, আশৈশব ব্রহ্মচর্য প্রতিপালন করিয়া চলিতেন, অকারণ কেন তাহাদিগের জাতি লইয়া টানাটানি পড়িয়া গেল, সেটা বুঝিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না ও নাই।"

আসলে এই ছিল বাংলা দেশের খাঁটি ছবি। সে সময় হিন্দুর ছেলে বিলেত গেলেই বাড়িশুদ্ধ সকলকে এমনি সামাজিক অত্যাচার সহ্য করতে হত। অথচ সময়ের দিক থেকে ১৮৮১ সাল খুব পুরনো নয়। এর আগে জ্ঞানদানন্দিনী দুটি অবোধ শিশু নিয়ে বিলেত ঘুরে এসেছেন। চন্দ্রমুখী পাশ করে গেছেন এনট্রান্স। কাদম্বিনীর সঙ্গে গ্র্যাজুয়েট হবার তোড়জোড় করছেন। প্রতিভা নেমেছেন অভিনয় করতে।

রবীন্দ্রনাথের সেবার বিলেত যাওয়া হলো না। কিন্তু আশুতোষের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। পরে বিলেত থেকে ফিরে আশুতোষ ঠাকুরবাড়ির অন্যান্যদের সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর সরল স্বভাব ও সাহিত্যানুরাগ ঠাকুরবাড়ির সকলেরই খুব ভালো লাগলো। আলাপ হলো প্রতিভার সঙ্গে। রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী প্রতিভার সঙ্গে এমন সোনার টুকরো ছেলেকে সুন্দর মানাবে, সুতরাং বিয়ের সানাই বাজতেও দেরী হলো না। এই বিয়েতে অত্যন্ত সুখী হয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। বলেছিলেন, "আশু আমার একটা অর্জন। অনেক সাধনায় প্রতিভা এমন পাত্রে পরিণীতা হয়েছে।" এ সময় একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। আমরা জেনেছি ইন্দিরার লেখা 'শ্রুতি ও স্মৃতি'র পাণ্ডুলিপি পড়ে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন সভায় বুঝি যাচ্ছিলেন ইন্দিরা, একই গাড়িতে উঠেছিলেন আশুতোষ। এ ঘটনায় কারুর কোন হাত ছিল না কিন্তু ভয়ে কাঠ হয়ে নীপময়ী ভাবলেন, 'জ্ঞানদানন্দিনী বুঝি তাঁর মেয়ের সঙ্গেই আশুতোষের বিয়ে দিতে চান'। প্রগতিসম্পন্না জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গে মনের মিল অনেকেরই হয়নি। তাই সন্দেহ। জ্ঞানদানন্দিনী তো হেসে আকুল। তাঁর মেয়ের বয়স কম, এর মধ্যে বিয়ে দেবেন কি? তবু সন্দেহ ঘোচে না। এরই মধ্যে মৃত্যু হয় হেমেন্দ্রনাথের। কিছুদিন পরে প্রতিভার বিয়ে হয়। অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছিল, আশুতোষের বাকি ছয় ভাইয়ের সঙ্গে প্রতিভার ছয় বোনের বিয়ে হবে কিনা? এঁদের মধ্যে তিন ভাইয়ের সঙ্গে আরো তিনজন ঠাকুরবাড়ির মেয়ের বিয়ে হয়েছিল কিন্তু তাঁরা কেউই প্রতিভার নিজের বোন ছিলেন না। এই বিয়ে উপলক্ষে দুটি পরিবারের যুবক-যুবতীদের অনেকেই গভীর মেলামেশা করেছিলেন। অনেকে

মনে করেন এর কাবণ ঠাকুরবাড়ির শিল্প-সংস্কৃতির আহ্বান আবার কেউ কেউ মনে করেন এর পেছনে ছিল ঠাকুরবাড়ির রূপবতী-গুণবতী শিক্ষিতা মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা। কারণ যাই হোক না কেন বাংলা দেশের সমস্ত শিক্ষিত সমাজই ঠাকুরবাড়ি সম্বন্ধে বিশেষত: এ বাড়ির বিদুষী সঙ্গীতজ্ঞা মেয়েদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। ইন্দিরা জানিয়েছেন, ঠাকুর এবং চৌধুরী পরিবাবের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা সব সময়েই যে সুখ পরিণতি লাভ কবেছিল তা নয়। এই সব ছোটখাটো ঘটনার ফাঁক দিযে আমরা মাঝে মাঝে সমাজেরও ছবিটা যেন দেখতে পাই।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রতিভার সত্যিকারেব অবদান হলো স্বরলিপি রচনার সহজতম পন্থাবিষ্কাব। তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি পদ্ধতি এবং স্বরসন্ধি প্রয়োগ পদ্ধতিতে যেমন নতুনত্ব এনেছিলেন তেমনি তাকে করে তুলেছিলেন সকলের ব্যবহারের উপযোগী। প্রতিভাব আগে কোন মহিলা স্ববলিপি নির্মাণের ব্যাপাবে এগিযে আসেননি।

জ্ঞানদানন্দিনীর 'বালক' পত্রিকায প্রতিভার স্ববলিপি পদ্ধতি প্রকাশ হতে থাকে। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগযা'র গানগুলিরও প্রথম স্বরলিপিকার হচ্ছেন প্রতিভা। শোনা যায, এ সময হেমেন্দ্রনাথের নির্দেশে তিনি বহু ব্রহ্মসঙ্গীত ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেব স্বরলিপি তৈরি কবেন। সংখ্যা আমরা গুণে দেখিনি তবে প্রতিভার এক ভাই হিতেন্দ্রনাথ ১৩১১-র আষাঢ় সংখ্যা 'পুণ্যে' জানাচ্ছেন যে এই সংখ্যা প্রায় তিনশো চারশো। কিন্তু শুধু স্ববলিপি নির্মাণ করলেই তো হবে না, গাইবে কে?

প্রতিভা না হয প্রকাশ্যে গান গেয়ে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা কবলেন, তাকে নিত্য নতুন রস সিঞ্চন করে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো! সে ভারও নিলেন প্রতিভাই। স্বরলিপি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে চললো গান শেখাবার চেষ্টা। তারও হাতে খড়ি 'বালকে'। সেখানে তিনি কাগজে কলমে খুললেন একটি গানের ক্লাস 'সহজ গান শিক্ষা'। 'বালক' ছোটদের কাগজ, ছোটদের দিয়ে শুরু করা ভালো তাই তিনি প্রথমে তাদেব বলে নিলেন গান কাকে বলে।

সেই বয়সেই প্রতিভা গানের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'গান মানুষের স্বাভাবিক'। হাসি-কান্নার সময মানুষের কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হয। তাই বোঝা যায় 'নানা ভাবের নানা সুর আছে', সেই সুবের চর্চা কবেই গানের উৎপত্তি হয়েছে। সঙ্গীতের সম্বন্ধে প্রতিভার এই সংজ্ঞা নির্ণয় তাঁর একান্ত নিজস্ব। পরিণত বয়সে তিনি আরও মৌলিক চিন্তার পরিচয দিয়েছিলেন।

গান এমন একটা জিনিষ যার জন্য শুধু জ্ঞান নয় রীতিমত চর্চার প্রয়োজন আছে। প্রতিভা সেই চেষ্টায় নিজের বাড়িতে প্রথমে 'আনন্দ সভা' পরে 'সঙ্গীত সংঘ' স্থাপন করেন। গান শেখার স্কুল হিসেবে 'সঙ্গীত সংঘ' খ্যাতিলাভ করে। এখানে প্রতিভা শেখাতেন খাঁটি ওস্তাদী হিন্দুস্থানী গান। যদিও বিদেশী সঙ্গীতেও তাঁর ছিল অবাধ অধিকার। বাঙালী মেয়েরা এই প্রথম ভালো করে গান শেখার সুযোগ পেল। অবশ্য 'সঙ্গীত সংঘে'র সঙ্গে 'সঙ্গীত সম্মিলনী' নামটাও অনেকেরই চেনা মনে হবে। সেটিও গানের স্কুল। স্থাপন কবেছিলেন লেডি বি. এল. চৌধুরী, বনোয়ারীলাল চৌধুরীব স্ত্রী প্রমদা চৌধুবী। এই দুটি স্কুলের সুযোগ হওয়ায় বাঙালী মেয়েরা অনেকেই গান শিখতে শুরু করেন। প্রতিভার স্কুলটির দেখাশোনার কাজে ইন্দিরাও এসে যোগ দিয়েছিলেন, ঘটনাসূত্রে তখন তিনিও এসেছেন চৌধুরী বাড়ির বৌ হয়ে।

গান শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা একটা সঙ্গীত বিষয়ক পত্রিকার কথাও ভাবছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু গানেব চর্চার জন্য ঐরকম একটা পত্রিকা থাকা খুবই প্রয়োজন। তাই 'আনন্দ সভা'র নামে প্রতিভা নতুন পত্রিকার নাম দেন 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা'। তবে কোন কিছু একা করায় প্রতিভার বড়ো সংকোচ তাই এবারও দলে টানলেন ইন্দিরাকে। যুগ্ম সম্পাদনায় 'আনন্দ সঙ্গীত' আট বছর সগৌরবে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় প্রতিভা শুধু নিয়মিত ভাবে স্বরলিপি প্রকাশ করতেন তা নয়, সেইসঙ্গে চলতো লুপ্ত সঙ্গীত পুনরুদ্ধারের চেষ্টা। শুধু কি সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা? প্রতিভা প্রাচীন সঙ্গীত শিল্পীদেরও বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে উদ্ধার করতে লাগলেন—তানসেন, সা সদাবঙ্গ, বৈজু

াওয়া নায়ক, মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও আরো অনেক সঙ্গীতস্রষ্টার ীবনী রচনা তাঁর সঙ্গীত সম্পর্কিত চিন্তার বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছে। আজ যখন কান প্রাণহীন যান্ত্রিক কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনি তখন বুঝতে পারি প্রতিভা কেন ঙ্গীতচর্চার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞদের কথা ভাবতেন, তাঁদের সঙ্গীত সাধনাকে াদর্শের মতো তুলে ধরতে চাইতেন। শিল্প ও শিল্পী উভয়কে না জানলে যে াধনা অপূর্ণ থেকে যায়। তাঁর চেষ্টায় বহু সঙ্গীতজ্ঞের জীবন ও সাধনার লুপ্ত ইতিহাস সংগৃহীত হয়েছে। গানের ক্ষেত্রে প্রতিভা তাঁর কাকা-জ্যাঠাদের মতো খ্যাতি পাননি বটে কিন্তু সঙ্গীত জগতে তিনি তাঁর গুরুজনদের মতোই সমান কৃতিত্বের অধিকারিণী। প্রতিভার মৃত্যুর পরে 'সংগীত সংঘে'র পুরস্কার বিতরণ ভায় তাঁর কাকা রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন তার মধ্যেই প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় লুকিয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "সঙ্গীত শুধু যে তাঁর কণ্ঠে আশ্রয় নিয়েছিল তা নয়, এ তাঁর প্রাণকে পরিপূর্ণ করেছিল। এরই মাধুর্য প্রবাহ তাঁর জীবনের সমস্ত কর্মকে প্লাবিত করেছে।"

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রতিভার প্রধান কৃতিত্ব স্বরসন্ধিসহ কয়েকটি রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বরলিপি রচনা করা। এর সার্থক উদাহরণ "কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ" গানের স্বরলিপি। সংস্কৃত স্তোত্রে সুর দিয়ে গাওয়ার পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব। তাঁর দেওয়া সুরে বেদগানের স্বরলিপিও তৈরি করেন প্রতিভা। মাঘোৎসবের সূচনা হতো একটি বেদগানের ভাবগম্ভীর পরিবেশ দিয়ে। কখনও 'যদেমি প্রস্ফুরন্নিব' কখনও 'ত্বমীশ্বরাণাং' আবার কখনও 'গীতা স্তোত্র' দিয়ে। প্রতিবারই প্রতিভা স্বরলিপি তৈরি করে অন্যদের গান শেখাতেন। তিনি নিজেও যে দু একটা গানে সুর দেননি তা নয়, 'ত্বমাদিদেব পুরুষপুরাণ' স্তোত্রে তিনি কেদারা রাগিণীর সুর বসান। সংখ্যায় খুব কম হলেও প্রতিভার নিজের লেখা গানও দুর্লভ নয় বিশেষ করে 'সাঁঝের প্রদীপ দিনু জ্বালায়ে' এবং 'দীনদয়াল প্রভু ভুলো না অনাথে' জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

প্রতিভার জীবনে গানের সঙ্গে মিশে ছিল আরো দুটি জিনিষ—ধর্ম ও ও জ্ঞানস্পৃহা। মহর্ষির অধ্যাত্মসাধনা এবং হেমেন্দ্রের উগ্র ধর্মানুরাগ সঞ্চারিত

হয়েছিল প্রতিভার জীবনে। তাঁর ভক্তিগীতি বা নববর্ষের বক্তৃতাগুলোর ওপর নজর বোলালেই বোঝা যাবে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিভার মনে কী গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঠিক সাহিত্যচর্চা না করলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর প্রতিভার বেশ দখল ছিল। তিনি ইংরেজি, ফরাসী, ল্যাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি নানা ভাষা যেমন শিখেছিলেন, তেমনি ইতিহাস-ভূগোল ও অন্যান্য বিদ্যাচর্চাতেও আগ্রহী ছিলেন। ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য মেয়েদের দু-চারটে লেখা যেমন ইতস্ততঃ চোখে পড়ে প্রতিভার লেখা সেরকম দেখা যায় না। তাঁর একটি বক্তৃতা সংগ্রহ 'আলোক' ছাপা হয়েছিল অনেকদিন আগে। তাঁর একটি প্রবন্ধের কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি।, সে অংশটির মধ্যেই প্রতিভার রচনারীতির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। প্রতিভা লিখছেন :

"ভালো চিন্তা হৃদয়কে অধিকার না করিলে ভালো হইবার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। চিন্তার ভালোমন্দ গতি আমাদের আচার ব্যবহারের গতি নিয়মিত করে। চিন্তা সংযত না হইলে আমাদের স্বভাব যথেচ্ছাচাবী ও শিথিল হইয়া পড়ে। কিন্তু কাহার চালনায এই চিন্তাকে আমবা সংযত করিতে পারি? কুপথ হইতে ফিরাইয়া লইতে পারি? সে সারথি কে? সে আর কেহ নয়——জ্ঞান।"

এই সংক্ষিপ্ত উক্তিই বিদুষী প্রতিভার জ্ঞানতৃষ্ণা ও সংযত চিন্তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। আপাততঃ আমরা প্রতিভার অন্যান্য বোনেদের কথায় আসি।

প্রতিভা যখন সংগীত চিন্তায় বিভোর, লুপ্ত সঙ্গীত শিল্পীদেব পরিচয় উদ্ধারে তৎপর ঠিক সেই সময় তাঁর মেজো বোন প্রজ্ঞাসুন্দরী ব্যস্ত ছিলেন আর একটা চির পুবনো অথচ চিরনতুন জিনিষ নিয়ে। দিদির মতো তিনিও লেখাপড়া শেখা, গান শেখা, স্কুল যাওয়া, ছবি আঁকা দিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন কিন্তু নদী যেমন এক উৎস থেকে বেরিযেও ভিন্নমুখী হতে পারে তেমনি প্রজ্ঞাও ধরলেন একটি নতুন পথ। ঠাকুরবাড়িতে সব রকম শিল্পচর্চার সুযোগ ছিল। মেয়েরাও শিখতেন

নানারকম কাজ। সুতরাং প্রজ্ঞার মন টেনেছিল রান্নাঘর। এমন আর নতুন কি? ঠাকুরবাড়িতে সব মেয়ে-বৌই অল্পবিস্তর রাঁধতে শিখতেন; তাব মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে গেছেন কাদম্বরী ও মৃণালিনী। শরৎকুমারী ও সরোজাসুন্দরীরও এ ব্যাপারে সুনাম ছিল। সৌদামিনীদেব প্রতিদিন একটা করে তরকারি রাঁধা শিখতে হতো। তবে আর প্রজ্ঞার নতুনত্ব কোথায? বলতে গেলে উত্তরাধিকার-সূত্রেই তিনি রান্না শিখেছিলেন। তা শিখেছিলেন ঠিকই। প্রজ্ঞার মা নীপময়ীও ভালো রাঁধতেন। মহর্ষিরও এ ব্যাপারে কম উৎসাহ ছিল না। অথচ তাঁদের বাড়িতে রোজকার ব্যঞ্জন ছিল "ডাল—মাছের ঝোল—অম্বল, অম্বল—মাছের ঝোল—ডাল"। বড়ি ভাজা, পোর ভাজা, আলু ভাতে ছিল ভোজের অঙ্গ। আসলে এ ব্যবস্থা ছিল বারোয়ারি। বৌয়েরা ঘরে ঘরে নানারকম তরকারি ও মিষ্টি তৈরি করতেন। তবে প্রজ্ঞার বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি শুধু নিজের হাতে রাঁধা খাবার প্রিয়জনদের মুখে তুলে দিয়ে নিরস্ত হননি। ঠাকুরবাড়ির চিরকেলে রেওয়াজ ছেড়ে নিজেদের আবিষ্কার করা পিঠে-পুলি-পোলাও-ব্যঞ্জন তুলে দিতে চেয়েছেন সকলেব মুখে। এখানেই তাঁর অনন্যতা। তাঁর দিদি যদি সঙ্গীত বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করে থাকেন তবে প্রজ্ঞা করেছেন গার্হস্থ্য বিজ্ঞানকে।

বাস্তবিকই রান্না এবং রান্নাঘর নিয়ে, কেতাবী ভাষায় রন্ধনতত্ত্ব ও রন্ধনবিদ্যা নিয়ে তিনি যত মাথা ঘামিয়েছেন তত চিন্তা আর কোন মহিলা করেছেন বলে মনে হয় না। ঘরের কোণে বসে রান্নার পরীক্ষা চালাবার সময় তিনি সেগুলো লিখে রেখেছিলেন ভাবীকালের আগন্তুকদের জন্যে। তাই তাঁর 'আমিষ ও নিরামিষ আহার'-এর বইগুলি এত নতুন হয়ে দেখা দিয়েছিল। আধুনিক যুগে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানেব বহু বই লেখা হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু পঁচাত্তর বছর আগে প্রজ্ঞার বইগুলি হাতে নিয়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। অবশ্য এ ব্যাপারে আরো দু একজনের নাম করা যায়। কিরণলেখা রায়ের 'বরেন্দ্র রন্ধন' ও 'জলখাবার', নীহারমালা দেবীর 'আদর্শ রন্ধন শিক্ষা' ও বনলতা দেবীর 'লক্ষ্মীশ্রী' রান্নার বই হিসেবে জনপ্রিয় হয়েছিল, তবে সে পরের কথা। প্রজ্ঞার রান্নার বই দুটির ভূমিকাদুটিকে আমরা একাধারে রন্ধনতত্ত্ব ও গার্হস্থ্য বিদ্যার আকর বলে ধরে

নিতে পারি। বিয়ের পরে বেশ গিন্নীবান্নি হয়েই প্রজ্ঞা এ কাজে হাত দিয়েছিলেন।

প্রতিভার মতো প্রজ্ঞারও বিয়ে হয়েছিল এক বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে। অসমিয়া সাহিত্যের জনক লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া তাঁর স্বামী। বিয়ের আগে লক্ষ্মীনাথের সঙ্গে তাঁর কোন সাক্ষাৎ হয়নি। লক্ষ্মীনাথ তাঁব আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন যে ঠাকুরবাড়িব এই গুণবতী, শিক্ষিতা, সুশীলা ও ধর্মপ্রবণা মেয়েটির ছবি দেখেই তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বিবাহে সম্মত হন। যদিও তাঁব নিজেব বাড়ি থেকে এসেছিল প্রচণ্ড বাধা। কারণ ঠাকুরবাড়িতে বিয়ে হওয়া মানেই ছেলেকে হারানো। তাই একমাসের মধ্যে বহু টেলিগ্রাম কলকাতা ও গৌহাটিতে আসা যাওয়া করলেও বিধির লিখন বদলালো না। ১৮৯১ সালের ১১ মার্চ, স্বপ্নরঙীন বাসন্তী সন্ধ্যায় সপ্তপদী গমনেব পব শুভদৃষ্টি। বেজবড়ুয়া দেখলেন প্রজ্ঞা তাঁর দিকে তাকিয়েই ফিক করে হেসে ফেললেন। হাসি ফুটলো লক্ষ্মীনাথেরও ঠোঁটের কোণে। পরে অবশ্য তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন প্রজ্ঞাকে, "শুভদৃষ্টির সময় ঐরকমভাবে হেসেছিলে কেন?" প্রজ্ঞার উত্তর, "বিয়ের অনেকদিন আগেই তোমাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম।" স্বপ্নে দেখা মুখটার সঙ্গে লক্ষ্মীনাথের মুখের হুবহু মিল দেখে হেসেছিলেন প্রজ্ঞা। লক্ষ্মীনাথের আঁকা এই সব ছোট ছোট কথার ছবি দেখে ধরে নিতে অসুবিধে হয় না দাম্পত্য জীবনে প্রজ্ঞা কতখানি সুখী ছিলেন। নিজের জীবনে পর্যাপ্ত সুখের সন্ধান পেয়ে তিনি বুঝেছিলেন গৃহকে সুখের আগার কবে তুলতে হলে গৃহিণীকে কোন দিকে নজর দিতে হবে। তাঁকে 'মায়ার খেলা'তে অভিনয় করতে দেখা গেছে, ছবি আঁকতে দেখা গেছে কিন্তু সব ছেড়ে তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন আপাত, অবহেলিত রান্নাঘরখানিকে।

রান্নাঘর নিয়ে প্রজ্ঞা ভাবতে শুরু করেন 'পুণ্য' পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে সঙ্গে। হেমেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই প্রকাশিত হতো 'পুণ্য' পত্রিকা। লিখতেন প্রজ্ঞার ভাইবোনেরা, প্রথম সম্পাদিকা ছিলেন প্রজ্ঞা নিজে। প্রথম থেকেই এর পাতায় পাতায় হরেক রকম আমিষ ও নিরামিষ ব্যঞ্জনের পাকপ্রণালী ছাপা হতে থাকে। সুগৃহিণীর মতো তিনি আবার তৎকালীন

াজার দরটিও পাঠিকাদের জানিয়ে দিতেন যাতে কেউ অসুবিধেয় না পড়েন। কালের সীমানা পার হয়ে আজ সে বাজার দর আমাদের মনে শুধু সুখস্মৃতি জাগায়। মাছের দাম ছিল অবিশ্বাস্য রকমের সস্তা—আধসের পাকা রুই তিন বা চার আনা, চিতল মাছ তিন পোয়া ছয় আনা, বড়ো বড়ো ডিমওয়ালা কৈ আট টার দাম নয় দশ আনা, একটি ডিম এক পয়সা, ঘি এক সের এক টাকা, দুধ এক সের চার আনা, টমেটো কুড়িটি দুই আনা—নাঃ, অকারণে মন খারাপ করে লাভ কি? শুধু এটুকু মনে রাখলেই হবে এই দামগুলো সঠিক বাজার দর কিনা ধনী গৃহিণী প্রজ্ঞা হয়তো যাচিয়ে নেননি। দরদাম করলে জিনিষপত্রের দাম আরো একটু কমতো।

'আমিষ ও নিরামিষ আহার'-এর তিনটি খণ্ড বেরিয়েছিল। প্রজ্ঞা ভেবে-ছিলেন পাকপ্রণালীর পরে লিখবেন গৃহবিজ্ঞানের বই। কিন্তু সে আর হয়ে ওঠেনি। এর ফলে অপূরণীয় ক্ষতি বয়ে গেল গৃহবিজ্ঞানের। প্রজ্ঞার মতো এত যত্নে রান্নার বই লেখার কথা হোমসায়েন্সের শিক্ষিকারাও ভাবেন বলে মনে হয় না। তিনি বইয়ের প্রথম দিকে খাদ্য, পথ্য, ওজন, মাপ, দাসদাসীর ব্যবহার, পরিচ্ছন্নতা সব ব্যাপারেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তৈরি করেছেন রান্নাঘরে ব্যবহৃত শব্দের পরিভাষা। হয়তো শব্দগুলো আমাদের অজানা নয় তবু এধরণের শব্দের সংকলন এবং পরিভাষা থাকা যে সত্যিই খুব প্রয়োজনীয় তাতে সন্দেহ নেই। কতখানি উৎসাহ এবং নিষ্ঠা থাকলে একাজ করা সম্ভব পরিভাষার দীর্ঘ তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে। প্রজ্ঞা চলিত এবং অপ্রচলিত কোন শব্দকেই অবহেলা করেননি। অধিকাংশই আমাদের পরিচিত শব্দ। যেমন—

বাখরা = পাপড়ি
চুটপুট্ = ফোড়ন ফাটার শব্দ
হালসে = কাঁচাটে বিস্বাদ গন্ধ
রুটিতোষ = সেঁকা পাঁউরুটি
পিটনী = যাহার দ্বারা মাংসাদি পেটানো হয

বালিখোলা—কাঠ খোলায় বালি দিয়া জিনিষ ভাজা

সিনা—বুক

চমকান—শুকনা খোলায় অল্প ভাজা

তৈ—মালপোয়া ভাজিবার মাটির পাত্র

তিজেল হাঁড়ি—ডাল বাঁধিবার চওড়া মুখ হাঁড়ি

তোলো হাঁড়ি—ভাত বাঁধিবাব বড়ো হাঁড়ি

খণ্ড কাটা—ডুমা ডুমা টুকবো কাটা

চিরকাটা—লম্বাভাগে ঠিক অর্ধেক করিয়া কাটা

ছুকা—ফোড়ন দেওয়া

রান্নাঘরে যে এত রকম শব্দ প্রচলিত আছে প্রজ্ঞার আগে তা কে জানতো? এসব শব্দও নিত্যব্যবহার্য তবু গার্হস্থ্য বিজ্ঞান লেখার সময় এ জাতীয় পরিভাষার প্রয়োজন অস্বীকার করা চলে না।

এছাড়াও আছে নানারকম 'প্রয়োজনীয় কথা'—গৃহিণীদের জ্ঞাতব্য নানারকম তথ্য—'বিনা পেঁয়াজে পেঁয়াজের গন্ধ করা' কিংবা 'ধরা গন্ধ যাওয়া'র মতো আরো অনেক কথা আছে। কজন আর জানে আদাব বসে হিং ভিজিয়ে রেখে সেই হিংগোলা নিরামিষ তবকারিতে দিলে পিঁয়াজের গন্ধ হয় কিংবা ডাল-তবকারি হাঁড়িতে লেগে গেলে তাতে কয়েকটা আস্ত পান ফেলে দিলে পোড়া গন্ধ কমে যায়। তরিতরকারি রোদে শুকিয়ে কি ভাবে অনেকদিন বেখে দেওয়া যায় সেকথা জানাতেও প্রজ্ঞা ভোলেননি। তবে এসব ছোটখাটো জিনিষ ছাড়া প্রজ্ঞা আরও একটা নতুন জিনিষ বাংলার ভোজসভায় এনেছিলেন। সেটি হলো বাংলা মেনু কার্ড বা তাঁর নিজের ভাষায় 'ক্রমণী'। বিলিতি ধরণের রাজকীয় ভোজে মেনু কার্ডের ব্যবস্থা আছে। প্রজ্ঞা স্থির করলেন তিনিও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের জন্যে ক্রমণীর ব্যবস্থা করবেন। ছাপা ক্রমণী যদি হাতে হাতে বিলি করা না যায় তাহলে সুন্দর করে লিখে খাওয়ার ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিলেও চলবে। শুধু নামকরণ করেই প্রজ্ঞা কর্তব্য শেষ করেননি। বাংলা ক্রমণী কেমন হবে, এক একবারের ভোজে কি কি পদ থাকবে, কোন্ পদের পরে কোনটা আসবে, কিংবা

কেমন করে লিখলে ব্যাপারটা আর্টিস্টিক হয়ে উঠবে সে কথাও ভেবেছেন। কয়েকটা ক্রমণী দেখলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা। প্রথমে একটা নিরামিষ ক্রমণী—

"জাফরাণী ভুনি খিচুড়ি
ধুধুল পোড়া শিম বরবটি ভাতে
পাকা আম ভাতে
পটোলের নোনা মালপোয়া
পাকা কাঁঠালের ভুতি ভাজা
কাঁকরোল ভাজা
ভাত
অবহব ডালেব থাজা
লাউয়েব ডালনা
বেগুন ও বড়ির সুরুয়া
ছোলার ডালের পোকা
বেগুনেব দোল্মা
আলুবখরা বা আমচুব দিযা মুগের ডাল
পাকা পটোলেব ঝুরঝুবে অম্বল
ঘোলের কাঁড়ি
রামমোহন দোল্মা পোলাও
নীচুর পায়স
নারিকেলের বরফি।"

যেন একটা আস্ত কবিতা। হঠাৎ চোখে পড়লে সেরকম ভুল হবারই সম্ভাবনা। যদিও নিরামিষ তবু সবস হযে ওঠে বসনা। সেকালের ভোজসভা সম্বন্ধেও একটা ধারণা গড়ে ওঠে। প্রজ্ঞা প্রতিটি রান্না নিজে হাতে রেঁধে তবে সেগুলি খাদ্য-তালিকাভুক্ত করতেন। অনেক রান্নাব আবিষ্কর্ত্রী তিনি নিজেই। মাঝে মাঝে সেগুলোর সঙ্গে যোগ করে দিতেন প্রিয়জনের নাম। যেমন, রামমোহন দোল্মা

পোলাও, দ্বারকানাথ ফির্নি পোলাও, সুরভি—তাঁর অকালমৃতা মেয়ের নাম।

আবার অনেক রকম উদ্ভট এবং নতুন ব্যঞ্জনও আছে। খেজুরের পোলাও, লঙ্কা পাতার চড়চড়ি, রসগোল্লার অম্বল, বিটের হিঙ্গি, পানিফলের ডালনা, ঝিঙা পাত পোড়া, মিছা দই মাছ, ঘণ্ট ভোগ, কচি পুঁই পাতা ভাজা, কাঁচা তেঁতুলের সরস্বতী অম্বল, আমলকী ভাতে, পেঁয়াজের পরমান্ন, কই মাছের পাততোলা, কাঁকড়ার খোলা পিঠে, মাংসের বোম্বাইকারী—আরো কত কী। ক্লাসে ওঠার মতো রান্না শেখারও ক্লাস আছে, "হিঙ্গি করতে শিখিলেই বুঝিতে পারিবে ইহা ঠিক যেন ডালনার এক ধাপ উপরে উঠিয়াছে অথচ কালিয়াতেও উঠিতে পারে নাই।' আরো দু একটা ক্রমণী দেখা যাক। আমিষ ক্রমণীর আকার খুব বড়ো নয়। যেমন—

"এস্পারোগাস স্যাণ্ডুইচ
শসার স্যাণ্ডুইচ
মাংসের স্যাণ্ডুইচ
মাছের স্যাণ্ডুইচ
পাউণ্ড কেক
স্পঞ্জ কেক
বিস্কুট
সিংগাড়া
ডালমোট
ঝুরি ভাজা
আইসক্রীম।"

আরেকটা—

"পাতলা পাঁউরুটির ক্রুটোঁ
জারক নেবু
বাদামের সুপ

ভেটকী মাছের মেওনিজ

মুরগীর হাঁড়ি কাবাব .

মটনের গ্রেভি কাটলেট

শবজী ও বিলেতী বেগুনের স্যালাড

স্নাইপ রোস্ট

আলুর সিপেট

উফ্‌স্‌ আলানিজ

ডেজার্ট

কফি।"

সে তুলনায় নিবামিষ ক্রনণীর আকাব বেশ বড়ো। গৃহিণীর কৃতিত্বও যেন বেশি।—

ভাত

আলু পোড়া, দুধ দিযে বেগুন ভর্তা, মূলা সিদ্ধ, আনারস ভাজা

মোচা দিয়া আলুর চপ

মুগের ফাঁপড়া

ডুমুরের ছেঁচকি মোচা ছেঁচকি

কুমড়া দিয়া মুগের ডালের ঘণ্ট

পালম শাকেব ঘণ্ট

উচ্ছা দিয়া মসুব ডাল

ওলার ডালনা

ঢ্যাঁড়সের ঝোল

ছানার ফুপু পোলাও

নিরামিষ ডিমের বড়ার কারী

করোলার দোল্মা আচার

আলুর দমপক্ত

কচি কাঁচা তেঁতুলের ফটকিরি ঝোল

নারিকেলের অম্বল

পাকৌড়ী

খইয়ের পরমান্ন

কমলী।”

আজকাল খুব বড়ো ভোজ সভাতেও পদের সংখ্যা এত বেশি হয় না। নিরামিষ ভোজসভাও আজকের দিনে অচল। যত বকম তরকারি, পিঠে পাযেস থালার পাশে সাজিয়ে দেওয়া যেত ততই সুগৃহিণীত্ব প্রমাণিত হতো। বাঙালী জীবনের শান্ত নিরুদ্বেগ স্বচ্ছলতার প্রতীক এই সব ভোজসভা। বাঙালী কোনদিনই ভোজনবীর ছিল না, ছিল ভোজনবসিক। তাদেব শিল্পবোধ স্থাযী জিনিষগুলোকে ছাড়িয়ে অস্থায়ী তাৎক্ষণিকতাব মধ্যেও রসের সন্ধান করেছে। আর বাঙালী মেয়েরা রান্নাঘরকে করে তুলেছে শিল্পমন্দিব। প্রজ্ঞা যে সব রান্নার কথা বলছেন এত না হলেও অধিকাংশের সঙ্গেই তখনকার গৃহিণীবা পরিচিত ছিলেন এবং নিজেরাও বাঁধতেন। তবে তাঁরা কেউ সেসব পাকপ্রণালী প্রজ্ঞার মতো লিখে অন্যের রান্না শেখার পথ সুগম করে যাননি। এক একটি বড়ো ক্রমণীতে ফুটে উঠেছে প্রজ্ঞার শিল্পবোধ ও সৌন্দর্যরুচি।

“কলাইশুটি দিয়া ফেনসা খিচুড়ি

পলতার ফুলুড়ি

বেশন দিয়া ফুলকপি ভাজা

কাঁচা কলাইশুটির ফুলুড়ি

পেঁযাজ কলি ভাজা

ভাত

ছোলার ডালের দুধে মালাইকারী

বাঁধাকপির ছেঁচকি

তেওড়া শাকেব চড়চড়ি

কচি মুলার ঘণ্ট

লাল শাকের ঘণ্ট

বাঁধাকপির ঘণ্ট

গাছ ছোলার ডালনা

মটর ডালের ধোঁকা

কমলানেবুর কালিয়া

ওলকফির কারী

পেঁয়াজের দোল্মা আচার

ফুলকপির দমপোক্ত

বেগুন দিয়া কাঁচা কুলের অম্বল

আনারসী মালাই পোলাও

ফুলিয়া।"

কিন্তু সব সময়েই কি এত বড়ো মাপের আয়োজন হতো? ছোটখাটো ক্রমণীও আছে। এখনকার তুলনায় সেও খুব ছোট নয়।—

"ডিম দিয়া মুলুকতানী স্থপ

ভাত

আলু ফ্রেঞ্চ স্টু

চঁওচঁও, বড় রুই মাছের ফ্রাই

মাংসের হুশনী কারী

পোলাও

ফ্রুট স্যালাড

ফল।"

কিংবা,

"অলিভ রুটি

নারিকেলের স্থপ

ধূম পক্ব ইলিশ

মুরগী বয়েল, হ্যাম।

মটনের কলার

ঠাণ্ডা জেলী ও ব্ল্যামজ
নারিকেল টফি, আদার মোরব্বা
কফি।”

আর নিরামিষ—

“ভাত
মাখন মারা ঘি, নেবু, নুন
নিমে শিমে ছেঁচকি ছোলার ডাল ভাতে
বেশন দিয়া শুল্‌ফা শাক ভাজি
ছোলার ডালের কারী কুমড়ো এঁতোর ফুলুরি
পুন্‌কো শাকের শশ্‌শরি
ভর্তাপুরী
পালম্‌ শাকের চড়চড়ি
থোড়ের ঘণ্ট
তিলে খিচুড়ি
ছানার ডালনা পাকা শশার কারী
পটোলের দোল্মা
তিল বাঁটা দিয়া কচি আমড়ার অম্বল
পাকা পেঁপের অম্বল
লক্ষ্ণৌ কড়ুই কাঁচা আমের পায়স।”

এখনকার দিনে প্রজ্ঞার বইটি দুষ্প্রাপ্য। সেজন্যই তাঁর কয়েকটি ক্রমণীর উদাহরণ তুলে দেওয়া হলো। এই ক্রমণী দেখে মনে হয় তখনও ভোজসভায় ফরাসী কায়দায় ইচ্ছা নির্বাচনের সুযোগ ছিল, না হলে এত ব্যঞ্জন এবং একই সঙ্গে ভাত, খিচুড়ি এবং পোলাওয়ের ব্যবস্থা থাকতো না।

প্রজ্ঞার রান্নার বই দুটি আমাদের মনে যে কৌতূহল জাগায় সেটি হলো ভাইঝির এই রন্ধন নৈপুণ্যে রবীন্দ্রনাথ কতখানি খুশি হয়েছিলেন! রান্না এবং নতুন খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ তো কম ছিল না। বহু মহিলাই তাঁদের স্মৃতিকথায়

এ কথা বলেছেন। কবি কি তাঁদের কাছে কখনো প্রজ্ঞার রান্নার গল্প করেননি? না, প্রজ্ঞা তাঁর কাকাকে কিছু রেঁধে খাওয়াননি? ভাইঝির 'ক্রমণী' আবিষ্কারে কাকার উৎসাহ ছিল কিনা কিছুই জানা গেল না। প্রজ্ঞা বিবাহসূত্রে অসমিয়া, স্বামীগৃহে যাওয়ায় তাঁর সঙ্গে কি কবির যোগ একেবারে ছিন্ন হয়েছিল? নয়তো উভয়ে উভয়ের সম্বন্ধে আশ্চর্যভাবে নীরব থেকে গেলেন কেন কে জানে! এবার অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।

হেমেন্দ্রনাথের মেয়েদের মাঝখানে আমরা আরেকজনকে পেয়েছি। তিনি আর কেউ নন সর্বজন-পরিচিতা সত্যেন্দ্র-জ্ঞানদানন্দিনীর একমাত্র মেয়ে ইন্দিরা। সময়ের দিক থেকে তিনি হেমেন্দ্রের সেজো মেয়ে অভিজ্ঞার 'বোন দিদি' অর্থাৎ পনেরো দিন আগে জন্মেছেন। সৌভাগ্যবশতঃ তিনিও দীর্ঘ জীবনের অধিকারিণী হওয়ায় ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের আর একটি উজ্জ্বলতম রত্ন হয়ে উঠেছেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছিন্নপত্রাবলীর প্রাপক। অন্য কোন ক্ষেত্রে যদি তাঁর কিছুমাত্র দান নাও থাকতো তাহলেও ক্ষতি ছিল না। কেননা, রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে যিনি এই অসাধারণ চিঠিগুলি লিখিয়ে নিতে পেরে-ছিলেন তাঁর অসামান্যতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগতেই পারে না। আর কেউই কবির "সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে" পারেনি। কিন্তু ইন্দিরার পরিচয় এখানেই শেষ নয় বরং শুরু।

ইন্দিরার সমস্ত কাজকর্মের মধ্যেও বড়ো হয়ে উঠেছিল তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। অপরূপ লাবণ্যময়ী ইন্দিরা তাই অনন্যা হয়েও সবার অতি আপন 'বিবিদি'তে পরিণত হয়েছিলেন। মনে হয় তিনি সেই জাতের মানুষ যাঁরা শুধুমাত্র তাঁদের জীবনযাপনের মধ্যেই সংসারকে মধুময় করে তোলেন। প্রতিদিনের জীবনযাত্রার পথে তাঁদের হৃদয়ের মাধুর্য আর পবিত্রতাই অপরের পথের দিশারী হয়ে ওঠে। মাথা তখন আপনিই নত হয়ে আসে সেই পরমতমার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শুরুতেই এ কথা কেন? ইন্দিরার সমগ্র জীবন যে "ভরা অশেষের ধনে" সুতরাং আবার পেছন ফিরে তাকানো যাক।

১৮৭৩ সাল। সন্তানসম্ভবা জ্ঞানদানন্দিনীর ইচ্ছে এবার মেয়ে হোক। ঘর আলো করা, কোলজোড়া। খুব সুন্দর দেখতে হবে। প্রাণভরে তাকে সাজাবেন। মায়ের ইচ্ছে অপূর্ণ রইলো না। মহারাষ্ট্রের কালাদ্‌গি শহরে ভূমিষ্ঠ হলো ঠাকুরবাড়ির একটি মেয়ে, আকাশ থেকে যেন নেমে এলো একটি তারা। কাটা কাটা ধারালো মুখশ্রী, সুন্দর গায়ের রঙ, বড়ো বড়ো দুটি উজ্জ্বল চোখ, রজনীগন্ধার মতো সতেজ সুন্দর দেহলতার অধিকারিণীর নাম রাখা হলো ইন্দিরা। কলকাতায় ইন্দিরার রূপের খ্যাতি কেমন ছড়িয়ে পড়েছিল তার একটি সমসাময়িক সাক্ষী উপস্থিত করি। বোধহয় ১৮৮৪ সাল হবে। সরস্বতী পূজোর দিন রবীন্দ্রনাথ এসেছেন এ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা দিতে, সঙ্গে ইন্দিরা।

প্রমথ চৌধুরী তখন ছাত্র। অনেকখানি হেঁটে প্রেসিডেন্সী কলেজের মাঠে বন্ধু নারায়ণচন্দ্র শীলের সঙ্গে দেখা। বন্ধুকে নারায়ণ সোৎসাহে জানালেন রবীন্দ্রনাথ এ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা দিচ্ছেন, সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। "চলো না, রাস্তাটা পেরিয়ে আমরা এ্যালবার্ট হলে যাই।" প্রমথ রাজী হলেন না বক্তৃতা শুনতে যেতে। বন্ধু বললেন, "রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা না শুনতে চাও, অন্তত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে দেখে আসি চলো। শুনেছি মেয়েটি নাকি অতি সুন্দরী।" রেগে উঠে গাছতলায় শুয়ে পড়ে প্রমথ বলেছিলেন, "পরের বাড়ির খুকি দেখবার লোভ আমার নেই।" কিন্তু অনেকেরই সেদিন সে আগ্রহ এবং কৌতূহল ছিল। পরে এই প্রমথর সঙ্গেই বিয়ে হয়েছিল ইন্দিরার। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'আত্মকথা'য় এই ঘটনাটির উল্লেখ করায় ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সম্পর্কে সমসাময়িক কালের আগ্রহ এবং কৌতূহলের একটা ছোট্ট ছবি আমরা দেখতে পেয়ে যাচ্ছি।

শুধু কি রূপ? ইন্দিরার গুণের সংখ্যা কম ছিল না। আরো একটা কাজ করেছিলেন তিনি। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে ইন্দিরাই সর্বপ্রথম বি. এ. পাশ করেন। এই পরিবার বাঁধাধরা শিক্ষাকে কোনদিন মূল্য দেননি। কিন্তু ডিগ্রীলাভ? তারও একটা মূল্য আছে বৈকি। বিশেষ করে সেযুগে। যখন গ্র্যাজুয়েট মেয়েদের দেখবার জন্যে রাস্তায় ভিড় জমে যেত। চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী কিছুদিন

আগেই ঠেলাঠেলি করে বিশ্ববিদ্যালয়েব বন্ধ দরজা খুলে ফেলেছেন। এবার সেই পথে অগণিত মেয়ের ভিড়। অবশ্য ইন্দিরারও আগে গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন স্বর্ণকুমারীব মেয়ে সরলা ঘোষাল। এবার খোদ ঠাকুরবংশের মেয়ে ইন্দিরা। তিনি লরেটো খেকে এনট্রান্স পাশ করে বাড়িতেই বি. এ. পড়েছিলেন ইংরেজীতে অনার্স ও ফবাসী ভাষা নিযে। ১৮৯২ সালে বি. এ. পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ কবে ইন্দিবা পান পদ্মাবতী স্বর্ণপদক। তাঁর আগে আবো এক ডজন মহিলা গ্র্যাজুযেট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছেন তবে তাঁরা কেউই ফরাসী ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করেননি। ইন্দিরাব আট বছর পরে আবার ফ্রেঞ্চ পডেছিলেন তারকনাথ পালিতেব মেযে লিলিয়ান পালিত, ভারতবর্ষের প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদেব মামলায যিনি খুব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুবনো কাগজপত্র দেখে জানা গেছে ১৮৮২ থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত মাত্র বারোজন মহিলা গ্র্যাজুয়েট হযেছিলেন। ইন্দিরা তেবো নম্বব। এঁদের মধ্যে একজন মাত্র ডব্‌ল্‌ এম. এ. পাশ করেন তাঁব নাম নির্মলবালা সোম। তিনি ১৮৯২-এ ইংরেজি ও ১৮৯৪-এ মর‍্যাল ফিলসফিতে এম. এ. পাশ কবেন। তবে এই সংখ্যা যে হু হু করে বাড়ছিল তাতে সন্দেহ নেই। নাহলে ১৮৯২-এব এই সংখ্যা ১৯১০-এ সাতান্ন জন মহিলা গ্র্যাজুয়েটে পৌঁছবে কি করে? ১৮৮৩ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে এম. এ. পাশ করেছিলেন আটজন মহিলা, এঁদেব কেউই ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

ইন্দিরা খুব ভালো ফরাসী জানতেন। ভাগ্যক্রমে তাঁর স্বামী প্রমথ চৌধুরীও ছিলেন ফবাসী ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁর লেখায় ফরাসী রুচির ছাপ আছে। ভালো করে লক্ষ্য কবলে ইন্দিরাব লেখাতেও প্রামথিক গদ্যরীতির কারুকর্ম চোখে পড়বে। গল্প-উপন্যাস না হলেও তাঁর যে কোন লেখা সরস-সহাস্য ও সুমিত লাবণ্যে সমুজ্জ্বল। প্রমথ চৌধুরীর অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব ইন্দিবার ওপর পড়া অসম্ভব নয় তবে যাকে বলে 'প্রসাদ গুণ' ইন্দিরার নিজস্বতায় সেটি প্রচুর মাত্রায় ছিল। প্রবন্ধ-গান-সমালোচনা-স্মৃতিকথা—বিষয় যাই হোক না কেন, সর্বত্র মিশে আছে তাঁর রম্য ব্যক্তিতার স্বাদ।

নিরপেক্ষভাবে ইন্দিরার কাজের বিচাব করতে বসলে মনে হয় যেন থৈ পাওয়া

যাচ্ছে না। অথচ স্মৃতি বিস্মৃতির মায়াজাল ছাড়িয়ে যেখানে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আমাদের নিজেদের স্বার্থেই সেই বিষয়গুলিকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। তিনি যে শুধু কয়েকটা বই লিখেছিলেন কিংবা গানের স্বরলিপি তৈরি করেছিলেন তা তো নয়, বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতকে তিনি যেভাবে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন তাতে তাঁর তুলনা মেলা ভার। বাংলায় যে কয়েকটি হাতে গোণা স্বল্পসংখ্যক মহিলা সত্যিকারের ভালো মননশীল প্রবন্ধ লিখতে পেরেছেন ইন্দিরা তাঁদের অন্যতম। ভাবতে অবাক লাগে লেখাব আশ্চর্য ক্ষমতা, কলমে অভাবনীয় জাদু থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর পিসীমা স্বর্ণকুমারীব মতো মৌলিক রচনায় হাত দেননি। কেন? কেন লেখেননি গল্প-উপন্যাস? প্রবন্ধ, সঙ্গীতচিন্তা, স্মৃতিকথা ও অনুবাদ এই চারটি শাখাতেই ইন্দিরার সাহিত্যকীর্তি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

অনুবাদের কাজটা বেশ কঠিন। কাবণ তাতে প্রাণের রস আনা যায না। কবির ভাষায় "তর্জমা মবা বাছুরেব মূর্তি", তা সেই 'মবা বাছুব'কেই প্রাণ দিতেন ইন্দিরা। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা তিনি অনুবাদ কবেছেন। কবি নিজেও স্বীকার করেছেন সে কথা। ইন্দিরা অনুবাদের ভাব নিলে তিনি যতটা নিশ্চিন্ত হতেন ততখানি ভরসা আর কারুর ওপর ছিল না। চিঠিতেও লিখেছেন, "তোর সব তর্জমাগুলিই খুব ভালো হয়েছে।...এইমাত্র তোব তর্জমাগুলি অপূর্বকে দেখালুম—সে বললে আমার কবিতার এত ভালো তর্জমা সে আগে আব দেখেনি।" [৬. ১. ১৯২৯] আবাব দেখা যাবে 'জাপান যাত্রী' অনুবাদেব ভারও কবি ইন্দিরাকে দিয়েই নিশ্চিন্ত হতে চান।

কবে থেকে অনুবাদ করা শুরু করেছিলেন ইন্দিরা? ১৮৯২ সালের 'বালকে' রাস্কিনের ইংরেজি বচনা তুলে দিয়ে এক প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন জ্ঞানদা-নন্দিনী। পৌষ সংখ্যায় পুরস্কার পেলেন যোগেন্দ্রনাথ লাহা। তাব অনুবাদের সঙ্গে আর একটা অনুবাদও ছাপা হলো। অনুবাদিকার নাম দেখা গেল "শ্রীমতী ইঃ—" সম্পাদিকা জানালেন "একটি অল্পবয়স্কা বালিকার বচনা।" অনেকের মতে এই 'শ্রীমতী ইঃ' যে ইন্দিরা তাতে সন্দেহ নেই। তখন থেকেই ইন্দিরার আত্ম-

গোপনের চেষ্টা শুরু হয়েছে। ফলে আজকের এই নিজের ঢাক নিজে পেটানোর কোলাহলে ইন্দিরা ঠিক কি করেছিলেন তাই জানা যাচ্ছে না। এমনকি তাঁর সমস্ত রচনার একটা তালিকাও বোধহয় এখনো তৈরি হয়নি। সাময়িক পত্রের পাতা থেকে সেসব সংগ্রহ করে একটা অখণ্ড গ্রন্থাবলী প্রকাশের চেষ্টা তো অনেক দূরের কথা।

রবীন্দ্র রচনার অনুবাদ ছাড়াও ইন্দিরা অনুবাদ করেন প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারী কথা'র। 'টেল্স্ অব ফোর ফ্রেণ্ডস্' বেশ উল্লেখযোগ্য অনুবাদ। এছাড়া তিনি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে যুগ্মভাবে অনুবাদ করেন মহর্ষির আত্মজীবনী "দি অটোবায়োগ্রাফী অব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ টেগোর"। এ তো গেল বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদের কথা। ইন্দিরা ফরাসী থেকে বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রেও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ফরাসী ভাষা সকলে জানেন না। ইন্দিরা ফরাসী ভালোই জানতেন। প্রমথ চৌধুরীর সান্নিধ্য তাকে আরো শাণিত করে তুলেছিল। তার যে চারটি অনুবাদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত সেগুলি হলো রেনে গ্রুসে-র 'ভারতবর্ষ', পিয়ের লোতির 'কমল কুমারিকাশ্রম', মাদাম লেভির 'ভারত ভ্রমণ কাহিনী' (কলম্বো থেকে শান্তিনিকেতন) এবং আঁদ্রে জীদের লেখা 'ফরাসী গীতাঞ্জলির ভূমিকা'।

ইন্দিরার প্রথম মৌলিক রচনা 'দশদিনের ছুটি' নামে একটা ভ্রমণকাহিনী 'বালকে' ছাপা হয়। এই দশদিনের ভ্রমণের আসল কথা তিনি জানিয়েছেন একেবারে জীবনের শেষপর্বে নিজের আত্মকাহিনী 'শ্রুতি ও স্মৃতি'তে। বিশেষ করে তাঁর আবদারেই রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দুই ভাইবোনকে নিয়ে গিয়েছিলেন হাজারিবাগে। কারণ, তখনকার দিনে কনভেন্টের এক একজন মেয়ের এক একজন সিস্টারের প্রেমে পড়ার রেওয়াজ ছিল। বোধহয় ভবিষ্যৎ জীবনের মক্‌সো স্বরূপ। তা যাই হোক, ইন্দিরার প্রেয়সী ছিলেন সিস্টার এ্যালাইসি। তাঁকে হাজারিবাগের কনভেন্টে বদলি করা হয়েছিল বলেই ইন্দিরার এই অভিযান।

প্রেমের কথা যখন উঠলোই তখন ইন্দিরার জীবনের কথাও এক ফাঁকে সেরে নেওয়া যাক। পূর্ণিমা ঠাকুরের লেখা ইন্দিরার জীবনকথা থেকে জানা যায়, তিনি

যখন স্কুলে যেতেন তখন ফটকের বিপরীত দিকের মাঠে এক দর্শনপ্রার্থী যুবক দাঁড়িয়ে থাকতো। কোন রকম আলাপ পরিচয় হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাটিকে, নিয়ে লিখে ফেলেছিলেন একটা গান—"সখি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে"। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা বাইরে বেরোতেন বা অভিনয় করতেন ঠিকই কিন্তু তাঁরা কোন অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে কথা বলতেন না। বেশ পরবর্তীকালে জসীমউদ্দীন যখন ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন তখনও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলেন। যাইহোক, ইন্দিরার এই নীরব দর্শনপ্রার্থীর সঙ্গে আকস্মিক-ভাবে দেখা হয়েছিল বহুকাল পরে। দুজনেরই বয়স তখন আশি পেরিয়ে গেছে। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র সদনে সেই ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁর ছেলের কাজের আবেদন নিয়ে। গল্পের মতো ঘটনা! তবু! কতদিন কেটে গেছে। দুজনেই অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। হয়তো কেঁপে উঠেছিল চোখের পাতা কিংবা গলার স্বর। দুজনেরই। দরকারি কথা তাড়াতাড়ি সেরে উঠে পড়েছিলেন ইন্দিরা। গল্পটা তাঁর আত্মকাহিনীতেও আছে।

ইন্দিরার পাণিপ্রার্থীর অভাব ছিল না। তার মধ্যে ছিলেন প্রমথ চৌধুরীও। কয়েক বছর আগে আশুতোষের সঙ্গে প্রতিভার বিয়ে হয়েছে। দুই পরিবারের মধ্যে সৌহার্দ্য গড়ে উঠলেও এই মেলামেশার ফল সব সময় ভালো হয়নি। কোন অজ্ঞাত কারণে উভয় পরিবারের সম্পর্কে চিড় ধরে। চৌধুরীদের কোন কোন ছেলে ব্রাহ্ম হয়ে যাওয়ায় এই তিক্ততা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে ওঠে। ইন্দিরা ও প্রমথের বিয়েতেও নানা রকম বাধা আসে। কিন্তু কোন বাধাই টেঁকেনি। বিয়ের প্রস্তাব প্রথমে জানান প্রমথ, তাতে সমর্থন ছিল ইন্দিরার, ঠাকুরবাড়ির আপত্তি তো ছিলই না। শুধু বিয়ের পরে নববধূ শ্বশুরবাড়ির পরিবর্তে গিয়ে উঠলেন ছোট ননদ মৃণালিনীর বাড়িতে। তারপর তাঁর নিজের বাড়ি কমলালয়ে। এরপরে তো একটানা কাজের ইতিহাস!

বাংলার নারী জাগরণের অন্যতম নেত্রী ইন্দিরাকে তাঁর মায়ের মতো পদে পদে বাধা পেতে হয়নি। তাই স্ত্রীশিক্ষা, নারীজাগরণ, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচার, মেয়েদের অধিকার ও কর্তব্য, আত্মরক্ষাসমিতি, সুবিধে-অসুবিধে, কাজকর্ম

এককথায় বলতে গেলে মেয়েদের সামগ্রিক ভূমিকার কথা নিরপেক্ষভাবে ভাবার অবকাশ ইন্দিরা পেয়েছিলেন। যেটা জ্ঞানদানন্দিনী কাদম্বরী কিংবা অন্য কেউ পাননি। কোনটা সত্যি ভালো আর কোন্‌টার সত্যি প্রয়োজন আছে আকস্মিক উত্তেজনাটা থিতিয়ে না গেলে সেটা ভালো বোঝা যায় না। ইয়ংবেঙ্গল গ্রুপকে যেমন নিছক সংস্কার ভাঙ্গার জন্যে কতকগুলো অর্থহীন কাজ করতে হয়েছিল তেমনি প্রথম যুগের মেয়েদেরও কিছু সাহস দেখাবার প্রয়োজন ছিল। দরকার ছিল কয়েকটি অমূল্য আত্মাহুতির। মেয়েদের চোখের সামনে নতুন নজির সৃষ্টি করবার জন্যে কাদম্বরীর অশ্বারোহণ, জ্ঞানদানন্দিনীর একলা বিলেত যাওয়া, কাদম্বিনীর ডাক্তারি পড়া, সরলা রায় ও অবলা বসুর শিক্ষা, চন্দ্রমুখীর এম. এ. পড়া, ব্রাহ্ম সমাজে চিকের বাইরে এসে উপাসনা করা, জামা জুতো পরে খোলা গাড়ি চড়ে বেড়ানোর দরকার ছিল বৈকি। খুবই দরকার ছিল। নইলে অন্য মেয়েদের মন থেকে অবরোধের পাহাড় নামবে কেমন করে? কিন্তু ইন্দিরা এঁদের পরের যুগের মানুষ। তিনি সেকেলে রক্ষণশীলতা আর একেলে উগ্র আধুনিকতা দুই-ই বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। সব জায়গাতেই তিনি উগ্রতাবিরোধী এবং মধ্যপন্থাবলম্বী। তাঁর নিজস্ব মত:

"সেকালের ধীরা-স্থিরাদের সঙ্গে একালের বাঁবা হতে হবে; অথবা সেকালের শ্রী ও হ্রীর সঙ্গে একালের ধী মেলাতে হবে—বঙ্কিমবাবু হলে যাকে বলতেন এখরে-মধুরে মেশা। এই সামঞ্জস্যই নারীজীবনের মূলমন্ত্র।"

ইন্দিরার প্রতিটি লেখার স্টাইল ঋজু ও স্বচ্ছ। তাঁর কাকার ভাষায় "সমুজ্জ্বল"। তিনি ইন্দিরার লেখা প্রবন্ধ পড়েও বুঝতে পারেননি এই 'স্টাইল' ইন্দিরার। কারণ খুব স্বাভাবিক। প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে এখনও পুরুষের অগ্রাধিকার সর্বজনস্বীকৃত। মেয়েরা যতই এগিয়ে যাক না কেন গভীর মনন ও চিন্তার ফসল ফলেছে পুরুষের কলমেই একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। বিশ্ব সাহিত্য সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। বাংলা দেশে তো হবেই। তবে এদেশ বড়ো আশ্চর্য দেশ! এখানে অসম্ভব বলে কিছু নেই। তাই পর্দার আড়ালে নিতান্ত অন্দরমহল থেকেও মাঝে মাঝে এমন একটি কূট বিচক্ষণতার পরিচয়

পাওয়া গেছে যাতে তাবৎ পুরুষ সমাজেরও তাক লেগে গেছে। মননের ক্ষেত্রেও কোন কোন মেয়ে এমন পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন যে তাঁকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে কেউ দ্বিধা করেননি। ইন্দিরা সেই বিরলতমাদেরই একজন। তাঁর লেখা 'নারীর উক্তি'র ছটি প্রবন্ধ, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ছটা দীর্ঘ প্রবন্ধে ইন্দিরার নারী সংক্রান্ত চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে।

আবার ইন্দিরা যখন স্মৃতিকথা লিখতে বসতেন তখন তাতে মিশতো গল্পের রস। প্রখর স্মৃতিশক্তির সাহায্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের বহু গান উদ্ধার করেছেন। না হলে অনেক গানেরই সুর যেত হারিয়ে। স্মৃতিকথা হিসেবে ইন্দিরার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা "রবীন্দ্রস্মৃতি"। পাঁচ ভাগে ভাগ করে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জড়িত সঙ্গীত, সাহিত্য, নাট্য, ভ্রমণ ও পারিবারিক স্মৃতির কথা বলেছেন। এতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের অনেক কথাই জানা যায়। স্মৃতিকথা লেখবার সময় ইন্দিরা সবসময় একটি বিশেষ রীতি মেনে চলতেন যাতে যাঁর কথা বলতেন তাঁর ঘরোয়া ব্যক্তিত্বের ছবি ফুটে উঠতো। এই ছোট ছোট ব্যক্তিত্বের সমষ্টিকে তিনি বলতেন "ছোট ফুলের শ্রদ্ধাঞ্জলি"। তাঁর শেষ রচনা 'শ্রুতি ও স্মৃতি' যেন রূপকথার ঝাঁপি। এটি ইন্দিরার নিজের কথা—শুরু হয়েছে তাঁর জন্ম থেকে আর শেষ হয়েছে দাদা সুরেন্দ্রনাথের পৌত্র সুপ্রিয়ের জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে। ঠাকুরবাড়ি এবং চৌধুরীবাড়ির বহু খবর এতে পাওয়া যাবে। গ্রন্থটি এখনও প্রকাশিত হয়নি, ফাইলবন্দী হয়ে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে পড়ে আছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে ইন্দিরার ভূমিকা যে কী এক কথায় তা বলা যাবে না। তাঁর দিদি প্রতিভা গানের জগতে মেয়েদের মুক্তি দিয়েছিলেন। আর ইন্দিরা উদ্ধার করেছিলেন প্রায় লুপ্ত প্রথম দিকের রবীন্দ্রসঙ্গীতকে। তাঁর চেয়ে পনেরো দিনের ছোট অভিজ্ঞার কণ্ঠেও রবীন্দ্রসঙ্গীত নতুন রূপ পেতে শুরু করেছিল কিন্তু অকালে মৃত্যু হওয়ায় অভিজ্ঞা স্থায়ীভাবে কিছু রেখে যেতে পারেননি। সে অভাব পূরণ করেছিলেন তাঁর 'বোনদিদি' ইন্দিরা। দেশী ও বিলিতি উভয় সঙ্গীতে তিনিও তালিম নিয়েছিলেন শৈশবেই। এমন কি যন্ত্রসঙ্গীতেও তাঁর

হাত ছিল পাকা। সেণ্ট পল্‌স্‌-এর অর্গানিস্ট স্লেটার সাহেবের কাছে পিয়ানো ও সিনর ম্যাঞ্জাটোর (Siguor Manzato) কাছে তিনি শিখেছিলেন বেহালা। ওস্তাদি হিন্দুস্থানী গান শেখেন বদ্রীদাস স্কুলেব তত্ত্বাবধানে। হেমেন্দ্রের মেয়েরা গান নিয়ে মেতে থাকলেও অভিজ্ঞা ছাড়া আর কেউ রবীন্দ্র-সঙ্গীত চর্চা করেননি। তাই ইন্দিরাকে একাই সব ভার নিতে হযেছিল। তিনি নিজেও পরিহাসতরল কণ্ঠে বলতেন, "আমাব জীবনেব যতদূর পর্যন্ত দেখতে পাই যেন সামনে এক বিস্তীর্ণ স্বরলিপির মরুভূমি পড়ে রয়েছে, তার মাঝে মাঝে রেফ্‌ ও হসন্তের কাঁটাগাছ।"

বাস্তবিকই ইন্দিরা যে কত গানের স্বরলিপি করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। শুধু সুর এবং স্বরলিপি রক্ষা করা নয় তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতেব তথ্য ও তত্ত্ব দুটোকেই সমৃদ্ধ করেছেন। একদিক থেকে স্বরলিপি উদ্ধার করে ও গান শিখিযে অপর দিকে সঙ্গীত সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখে। 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে ত্রিবেণী সঙ্গম' এমনই একটি ছোট্ট বই। এতে ইন্দিরা দেখিযেছেন রবীন্দ্রনাথ অপরের সুরে নিজের কথা গেঁথে গেঁথে কত নতুন গান সৃষ্টি করেছেন আবার পরেব কথায় তাঁর সুর দেওয়ার সংখ্যাও যে একেবারে নেই তা নয়। কবির যাবতীয় ভাঙ্গা গানেব একটা লিস্ট তৈরি করে তিনি দেখিযে দিযেছেন সামান্য অদলবদলের মধ্যে কবি কি অসাধ্য সাধন করেছিলেন। সঙ্গীত জগতে এই পুস্তিকাটি অমূল্য সংযোজন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিয়ে এ যুগের অনেকেই নানারকম আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে মহিলাদের সংখ্যা কম হলেও পুরুষদের সংখ্যা নগণ্য নয়। কিন্তু কেউই ইন্দিরার মতো রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে এত ব্যাপক আলোচনা বোধহয় করেননি। তাঁদের আলোচনারও আকর হিসেবে গৃহীত হয়েছে ইন্দিরার সঙ্গীতচিন্তা। যাইহোক, ইন্দিরার দেওয়া হিসেব থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথের দুশো সাতাশটা ভাঙ্গা গানেব বারোটির সুর নেওযা হয়েছে স্কচ ও আইরিশ গান থেকে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে হিন্দুস্থানী গানের দানও কম নয়। ভাবতে অবাক লাগে আমাদের চির পরিচিত "বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে"র উৎস "বাজে ঝননন মোরে পায়েলিয়া", "তুমি কিছু দিয়ে যাও"-এর উৎস "কৈ কছু কহরে" কিংবা "শূন্য

হাতে ফিবি হে নাথ”-এর উৎস “রুমঝুম বরষে” হতে পাবে। অপরের কথায় কবির সুর দেবার কথাও আছে। অক্ষয় বড়াল, সুকুমার রায, হেমলতা ঠাকুরেব গানে কবি সুব দিয়েছিলেন।

ইন্দিরাব লেখা রবীন্দ্রসঙ্গীত বিযযক প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক। বহু পত্রিকায় তিনি এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এদের মধ্যে ‘সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ’, ‘রবীন্দ্রসঙ্গীতেব শিক্ষা’, ‘রবীন্দ্রসঙ্গীতেব বৈশিষ্ট্য’, ‘রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতপ্রভাত’, ‘স্বরলিপি পদ্ধতি’, ‘শান্তিনিকেতনে শিশুদের সঙ্গীতশিক্ষা’, ‘হাবমনি বা স্বরসংযোগ’, ‘ববীন্দ্রসঙ্গীতে তানেব স্থান’, ‘ববীন্দ্রনাথের গান’, ‘বিশুদ্ধ ববীন্দ্রসঙ্গীত’, ‘হিন্দুসঙ্গীত’, ‘আমাদের গান’, ‘স্বরলিপি’, ‘দি মিউজিক অব রবীন্দ্রনাথ টেগোব’, ইন্দিরার সঙ্গীত চিন্তার পবিচয় বহন করে।

শুধু কাজ দিয়ে বোধহয় ইন্দিরাব বিচার করা যায় না। তিনি সারাজীবন নানারকম কাজ, মহিলা সমিতি, প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। কিছুদিনের জন্যে বিশ্বভাবতীর উপাচাযের পদও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। পেয়েছিলেন দুটি বিশ্ববিদ্যালয়েব দেওয়া সর্বোচ্চ সম্মান—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক এবং বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তমা। কিন্তু যাঁরা তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ছিলেন তাঁরা জানতেন ইন্দিরার তুলনায় এসব সম্মান-উপাধি-স্বর্ণপদক কত সামান্য কত তুচ্ছ। মর্ত্যের কুসুম দিয়ে কি স্বর্গের লক্ষ্মীকে সাজানো যায়?

এইখানেই ইন্দিরার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। কোন কাজ করে নয়, কোন কাজের মধ্যে নয, শুধু উপস্থিতি দিয়েই তিনি ভরে দিতে পারতেন সব শূন্যতাকে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-প্রয়াণের পব রবীন্দ্র ভাবধারাকে একটানা কুড়ি বছর ধবে বাঁচিয়ে রেখে তিনি তাকে চিরন্তনতা দিয়েছিলেন। সঙ্গে নিশ্চয় আরো অনেকে ছিলেন কিন্তু তাঁরা সঙ্গীমাত্র, তার বেশি কিছু নয়। ইন্দিবা একাই সব।

ইন্দিরাব কমনীয ব্যক্তিত্বে যে কমল হীরের দীপ্তি ফুটে উঠেছে তাকেই বলা যায় ‘কালচার’। এই কালচারের ছাপ ইন্দিরার সাজসজ্জায়-বাক্যবিন্যাসে-ঘরসাজানোয়-আচার ব্যবহারে-সাহিত্যচর্চায়-স্বামীসেবায়-গৃহিণীপনায়-সবুজপত্রে-

কমলালয়ে-শান্তিনিকেতনের আশ্রম কুটিরে সর্বত্র পড়েছিল। এই বিশিষ্টতাই তাঁর সবচেয়ে বড়ো দান। বাংলার নারীদের সামনে তিনি তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আদর্শ জীবনটিকে তুলে ধরেছিলেন। তাঁরই মধ্যে ফুটে উঠেছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

আবার হেমেন্দ্রনাথের মেয়েদের কথায় ফিরে আসা যাক। প্রতিভা ও প্রজ্ঞার আরো ছটি গুণবতী বোন ছিলেন। তাঁদের সেজো বোন অভিজ্ঞাসুন্দরী বেঁচে আছেন সকলের স্মৃতিকথায়। তাঁকে অনেকেই দেখেননি কিন্তু যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা আর ভোলেননি। সবাইকে অবাক করা এই মেয়েটিই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় ভাইঝি অভি। তাঁর গলায় নিজের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শিলাইদহে থাকতে থাকতে অভিজ্ঞার গান শোনবার জন্যে তাঁর মন উঠতো হু হু করে। ইন্দিরাকে লেখা চিঠিতেও সেই ব্যাকুলতার আভাস, "অভির মিষ্টি গান শোনবার জন্যে আমার এমনি ইচ্ছে করে উঠ্‌লো যে তখনি বুঝতে পারলুম, আমার প্রকৃতির অনেকগুলি ক্রন্দনের মধ্যে এও একটা ক্রন্দন ভিতরে ভিতরে চাপা ছিল।"

কি ছিল অভিজ্ঞার কণ্ঠে?

অকালে নিতান্ত অসময়ে হারিয়ে যাওয়া এই কিশোরীর কণ্ঠে কোন্ অনির্বচনীয় মাধুরী ধরা পড়তো, কে দেবে উত্তর? যাঁরা দিতে পারতেন তাঁরা সবাই তো পরলোকে। শোনা গেছে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গানগুলি অভিজ্ঞার কণ্ঠে মূর্তি লাভ করতো। ঠাকুরবাড়িতে তখন স্বর্ণযুগ চলছে। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির আপন খেয়ালে তন্ময়। একের পর এক লিখে চলেছেন 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা'।

করুণ গানে অভিজ্ঞার জুড়ি ছিল না। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র পর কবি লিখলেন 'কালমৃগয়া'। বিদ্বজ্জন সভায় আবার এলেন অতিথিরা। ১৮৮২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর, জমাট কুয়াশাভরা শীতার্ত সন্ধ্যা। তাঁদের সামনে শুরু হলো 'কালমৃগয়া'। বাল্মীকিপ্রতিভা'য় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন প্রতিভা, এবার মঞ্চে

অবতরণ করলেন অভিজ্ঞা। লীলার ভূমিকায় অভিজ্ঞার অভিনয় দেখে অনেকেই সেদিন চোখের জল রাখতে পারেননি। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন অন্ধমুনি আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথ। কিন্তু অভিজ্ঞার অভিনয় সবার মনে যতটা দাগ কেটেছিল তাঁর কাকারাও ততটা পা'রেননি। 'ভারতবন্ধু' কাগজের সমালোচক লিখেছেন, লীলার গান শুনলে "পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়।"

অভিজ্ঞার পাষাণ গলানো গান আবার শোনা গেছে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয়ের সময়ে। হাত বাঁধা বালিকা সেজে তিনি যখন গাইলেন, 'হা কী দশা হলো আমার' তখন বাঙালী দর্শকরা "কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন"—এ একেবারে অবনীন্দ্রনাথের নিজের চোখে দেখা। আরো কিছু দিন পরে অভিজ্ঞা একটু বড়ো হয়েছেন। কণ্ঠে মাধুরীর সঙ্গে মিশেছে দরদ। ভালোবাসার কুঁড়ি ধরলো তাতে। রবীন্দ্রনাথ এবার লিখলেন 'মায়ার খেলা'। কথা ও সুরের সত্যিকারের মিলন হলো যেন। তাকে আরো সুন্দর করে তুললো অভিজ্ঞার গান। ইন্দিরা ও তাঁর স্বামী প্রমথনাথের সাক্ষ্যে জানা যায়, অভিজ্ঞা একাসনে বসে 'বাল্মীকি প্রতিভা' বা 'মায়ার খেলা'র সমস্ত গান গাইতে পারতেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সমস্ত গান অভিজ্ঞার মতো মর্মস্পর্শী করে গাইতে প্রমথনাথ আর কাউকে শোনেননি। অপর দিকে 'মায়ার খেলা'র গান শুনে বহু দিন পরে প্রায়-বৃদ্ধ অবন ঠাকুরের স্মৃতি উদ্বেল হয়ে ওঠে, "হায়, যে ওসব গান গাইবে সে মরে গেছে। সেই পাখির মতো আমাদের ছোট বোনটি চলে গেছে।...সে সুরে যে গাইতো সে পাখি মরে গেছে।" অভিজ্ঞা তাই স্মৃতি হয়েও যেন স্মৃতি নন। যে একবার তাঁর গান শুনেছে সে-ই তাঁকে মনে রেখেছে।

'মায়ার খেলা'য় অভিজ্ঞা নিতেন শান্তার ভূমিকা এবং ইন্দিরা হতেন প্রমদা। শান্তার করুণ মধুর বিষণ্ণতা অভিজ্ঞার কণ্ঠে জীবন পেত। পরে বির্জিতলাও-য়ে আরেকবারের অভিনয়ে ইন্দিরা নিয়েছিলেন শান্তার ভূমিকা কারণ শান্তার ভূমিকাভিনেত্রী তখন আর ইহলোকে নেই। অভিজ্ঞা ছিলেন শান্ত, গম্ভীর, রোদনভরা বিষণ্ণ। কালব্যাধি যে তলে তলে বাসা বেঁধেছে সে কথা কেউ বুঝতে পারেনি। বিয়ের রাতে ঘটলো অঘটন। অনুষ্ঠানের শেষেই তিনি অসুস্থ হয়ে

পড়েন। হঠাৎ জ্বর, প্রবল জ্বর। দিনে দিনে অসুখ বেড়ে চলে এবং জানা যায় দুরারোগ্য ক্ষয় রোগ তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছে। চিকিৎসার অসাধ্য ; কৃশ-পাণ্ডুর চাঁদের মতোই একমাসের মধ্যে হারিয়ে গেলেন অভিজ্ঞা। মৃত্যু হলো জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই। চিকিৎসক স্বামী বধূকে আরোগ্য করবার সুযোগই পেলেন না।

অভিজ্ঞার মৃত্যুতে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের। সেই প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগে অভিজ্ঞার মতো প্রতিভাময়ী গায়িকা বেঁচে থাকলে কবি প্রয়োগের দিক থেকেও রবীন্দ্রসঙ্গীতকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারতেন। কিন্তু সে বুঝি হবার নয় তাই অকালে ঝরে পড়লো অস্ফুট কোরকটি, অকালে নিভে গেল বাংলা দেশের একটি রত্নপ্রদীপ। অভিজ্ঞার মৃত্যুর পরে কবি চারটি সনেট লিখেছিলেন— 'নদীযাত্রা', 'মৃত্যুমাধুরী', 'স্মৃতি' ও 'বিলয়'। নতুন করে কবির যেন মনে পড়েছিল মৃত্যুমাধুরীমাখা দুটি আশ্চর্য সুন্দর চোখ আর প্রভাত-পাখির মতো সুমধুর কণ্ঠের অধিকারিণী অভিজ্ঞাকে। এখানে একটা কথা বলে নিই। 'কবিমানসী' গ্রন্থের লেখক জগদীশ ভট্টাচার্যের মতে এই সনেট চারটি কবির "নতুন বৌঠানের স্মৃতিসুধায় ভরপুর"। কিন্তু একথা মেনে নিতে পারিনি। ক্ষিতিমোহন সেনের ডায়রিতে যে 'চৈতালি' কাব্য আলোচনার অনুলেখন রাখা আছে তাতেও দেখা যাবে কবি এই সনেটগুলো সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "আমার ভাইঝি অভির মৃত্যুর পরে লেখা"। অভিজ্ঞার মৃত্যুর পরে আর একজনও তাঁর কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আর কেউ নন, প্রমথ চৌধুরী, যিনি কোন রকম ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া অনাবশ্যক মনে করতেন। তাঁর কাছেও অভিজ্ঞা একটি বিস্ময়! তাঁর মনে হয়েছিল অভিজ্ঞা "শেক্সপীয়রের কল্পিত আরিয়েলের সগোত্র। অর্থাৎ অশরীরী সঙ্গীত।" বারো তেরো বছর বয়সের এই কিশোরী তাঁর মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছিলেন। প্রমথনাথের মনে হয়েছিল, "ইংরেজরা বলে whom the gods love die young। অভি ছিল সেই দেবানাং প্রিয় একটি বালিকা। কেন-না সে কখনো কিশোরী হয়নি।"

সময় কারুর জন্যে বসে থাকে না ; অভিজ্ঞার ঠিক পরের বোন মনীষাও বড়ো

হয়ে উঠেছেন। তাঁর দিদির রবীন্দ্রসঙ্গীতে এত নাম কিন্তু তিনি বেছে নিলেন বিদেশী যন্ত্রসঙ্গীতকে। বড়ো দিদি প্রতিভার মতো তিনিও খুব ভালো যুরোপীয় গান এবং পিয়ানো বাজাতে পারতেন। পরে পিয়ানোর দিকেই ঝোঁক থাকায় এদেশেব শ্রেষ্ঠ পিয়ানিস্টদের একজন হয়ে ওঠেন। তবে ভারতে মনীষা খুব পরিচিতা হয়ে ওঠেননি। কাবণ আর কিছুই নয় বিদেশী সঙ্গীতের চর্চা। অন্যান্য বোনেদের মতো তিনিও লরেটোয় পড়তেন, বাড়িতে চলতো ক্লান্তিবিহীন সঙ্গীতসাধনা। তবু দেশী গানেব সঙ্গে তাঁব অন্তবের যোগ ছিল না বললেই হয়। প্রতিভা গাইতেন বিলিতি গান, পিয়ানোয় বাজাতেন ওস্তাদি বাজনা, পরে তার ঝোঁক পড়ে হিন্দুস্থানী গানের ওপর। কিন্তু মনীষা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পিযানো চর্চা করেই কাটিয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথেব 'পাদপ্রান্তে রাখো সেবকে' ও দু তিনটি গানে পিয়ানোর সঙ্গত বসিয়েছিলেন কিন্তু সেগুলো তেমন জনপ্রিয় হয়নি। যেমন জনপ্রিয় হযনি 'তমীশ্বরাণাং' বেদমন্ত্রেব পিযানো সংগত। এব ফলে মনীষা বাঙালীদেব গানের জলসায় প্রায় অপবিচিতাই রযে গেছেন। আবো একটা কাবণও আছে। এক সময সাহেবিয়ানার অনুকরণে বাঙালীদেব ঘরে ঘরে পিয়ানোচর্চা শুরু হয়েছিল ঠিকই কিন্তু পিয়ানো কোনদিনই বাঙালীব ঘরের জিনিষ হয়ে ওঠেনি। এখন বিলিতি বাজনা সর্বস্বতাব যুগ, তবু পিয়ানো তার বিশাল আকার আর বিশাল দাম নিযে অভিজাত ড্রইংরুমের বাইরে বড়ো একটা এসে পৌঁছয়নি—তাব স্থান নিযেছে পিয়ানো-একর্ডিযান, গীটার প্রভৃতি ছোট ছোট যন্ত্র। তাই পিয়ানিস্টরাও সাধাবণ সমাজে পরিচিত নন। মনীষা তাঁর যোগ্য সম্মান পেযেছিলেন বিদেশে।

অভিজ্ঞার মৃত্যুর পরে তাঁব স্বামী দেবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মনীষার বিয়ে হয়েছিল। বিযের মাত্র একমাস পরেই বিদায় নিলেন অভিজ্ঞা। তাঁব বাসব-শয্যাই মৃত্যুশয্যায় পবিণত হলো। দেবেন্দ্রেব সেবা তাঁকে ফিরিযে আনতে পাবলো না। কিন্তু বোনের মৃত্যুব পর এই উদার উন্নতমনা যুবকটিকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন অভিজ্ঞাব দাদারা। তাঁরা প্রস্তাব করলেন তাঁদের বোন স্নেহ বন্ধন ছিঁড়ে চলে গেছেন কিন্তু দেবেন্দ্র যেন না যান। মনীষার সঙ্গে দেবেন্দ্রর

7, Norham Gardens,
Oxford.

28 Jan. 98

Dear Madam

Accept my best thanks for your music. It is very welcome to me as showing the result of a contact between Indian and our European scales and methods.

Would it not be possible to persuade a real Hindu musician to give us a translation of the Sangîta-ratnâkara with illustrations, or of some similar work on the ancient system of Hindu music. You might do a very useful work if you could help towards that.

Yours very faithfully
F Max Müller

ম্যাক্সমূলারের চিঠি

আবার বিয়ে দেওয়া হোক। আপত্তির কারণ ছিল না। শুধু একটু বাধা। মহর্ষি নাতনীদের বিয়েতে তিন হাজার টাকা যৌতুক দিতেন। এবার দেবেন্দ্রকে নতুন করে যৌতুক দিতে তিনি রাজী হলেন না। মনে হয়, নাতজামাইকে পরীক্ষা করবার জন্যেই। বিব্রত হলেন হিতেন্দ্র-ক্ষিতীন্দ্র-ঋতেন্দ্র। তাঁরা দেবেন্দ্রকে অনুরোধ জানালেন এ বিয়েতে রাজী হতে, পরে যেমন করে হোক তাঁরা এ টাকা জোগাড় করে দেবেন। দেবেন্দ্র এসব দাবি করেনইনি, তাই বিয়ে বন্ধ হলো না। সব দেখে সন্তুষ্ট হয়ে মহর্ষিও সমস্ত টাকা দিয়ে দিলেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত ডায়রি 'মহর্ষি পরিবারে' এ তথ্য পাওয়া গেছে।

মনীষা স্বামীর সঙ্গেই বিদেশে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর পিয়ানোয় নিখুঁত ইংলিশ নোটেশন শুনে য়ুরোপীয়রা যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন তেমনি বিস্মিত হয়েছিলেন পিয়ানোয় হিন্দু মার্গ সঙ্গীতের ভাব প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্যে। বিদেশে যাঁরা মনীষার পিয়ানো শুনেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মনীষী ম্যাক্সমুলার। মনীষাকে লেখা তাঁর একটি উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ চিঠি আজও রবীন্দ্রভারতী মিউজিয়ামে মনীষার নিখুঁত সুরসৃষ্টির নীরব সাক্ষী হয়ে আছে। তাতে জানা যায় শুধু য়ুরোপীয় সঙ্গীত নয় ভারতীয় সঙ্গীত বিশেষতঃ হিন্দু মার্গ সঙ্গীতের বিশুদ্ধ সুরসৃষ্টি দিয়ে মনীষা সমস্ত পশ্চিমী জগৎকে মুগ্ধ করেছিলেন।

মনীষাকে সাহিত্যচর্চা করতে দেখা না গেলেও 'পুণ্য' পত্রিকায় মাঝে মাঝে তাঁকে দেখা গেছে সেলাইফোঁড়াইয়ের কাজ শেখাতে। বিশেষ করে সেকালে বসবার ঘরে পুঁতির পর্দা ঝোলানো ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ। ঠাকুরবাড়িতেও এ প্রথা ছিল। মনীষা সেই পর্দা সেলাইয়ের বা বোনার পদ্ধতি, নক্সা প্রভৃতি ছবি এঁকে ঘর গুণে সেলাই দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। হেমেন্দ্রনাথের অন্যান্য মেয়েদের মধ্যেও এমনি নানান্ গুণের সমাবেশ দেখা গেছে। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা দেখিয়েছেন প্রগতির সঙ্গে শাশ্বতীকে বেঁধে রেখে কি করে সমাজকে গড়ে তোলা যায়। শুধু এই কারণেই বাঙালী মেয়েদের ওপর তাঁরা যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন আর কেউ তা পারেননি। লিলিয়ান পালিত, রমলা সিংহ, রাণী নিরুপমা, সুনীতি দেবী, সুচারু দেবী, মৃণালিনী

সেন ও আরো অনেকেই সেদিনকার ধনী সমাজে আলোড়ন জাগিয়েছিলেন, এনেছিলেন নতুন উদ্দীপনা কিন্তু তাঁদেব প্রভাব কি পডেছিল আমাদের সমাজে? না পড়ার কারণ তাঁবা ছিলেন আরো অনেক দূববর্তিনী। ববং প্রভাব ফেলেছিলেন সরলা রাষ, অবলা বসু, কুমুদিনী খাস্তগিব, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, চন্দ্রমুখী বসু—দলে দ.ল মেয়েবা এগিয়ে এসেছিলেন লেখাপড়া শিখতে।

হেমেন্দ্রনাথের পঞ্চম কন্যা শোভনাসুন্দবী। তিনি আবাব গান-বাজনাব চেয়ে লেখাপড়াতেই বেশি উৎসাহী। ঠাকুববাডিতে তখন বসের উৎসে ভাটা পড়তে শুরু করেছে, একেবাবে শুকিয়ে যাযনি এমনি সময়ে শোভনা বড়ো হয়ে উঠলেন আপন মনে। দিদিরা ব্যস্ত গান-বাজনা ছবি আঁকা কিংবা নতুন রবমের খাবার-দাবাব তৈরি কবতে, ছোট বোনেদেবও হযতো ওদিকেই ঝোঁক কিন্তু শোভনা স্বপ্ন দেখেন পিসীমার মতো বই লেখাব। কি সুন্দব গল্প! কেমন অবলীলায় লেখা? কি করে লেখিকা হওবা যায়? পড়তে পডতে শোভনা ভাবেন আর তারই ফাঁকে ইংবে.জি শেখাব ভিত গাঁথা হয়। হঠাৎ বিয়ে হযে গেল নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে, সুদূব জযপুবেব ইংবেজির অধ্যাপক। বাড়ি হাওডায। চার ভাইযেব বড়ো ভাই রাযবাহাদুর। নগেন্দ্রনাথ মেজো। সেজো ভাই যোগেন্দ্রনাথেব সঙ্গে বিয়ে হযেছিল শোভনার সপ্তম বোন সুষমার। বিয়েব প.র শোভনা গেলেন স্বামীর কর্মক্ষেত্রে। এক হিসেবে হযতো ভালোই হলো। কলকাতার মেয়েরা তখন এগিয়ে চলেছেন জোব কদমে। দুর্গামোহন দাসের মেয়েরা উঠে পড়ে লেগেছেন লোককল্যাণেব কাজে। সরলা স্থাপন করেছেন গোখেল মেমোবিয়াল, অবলা খুলেছেন ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়। ঠাকুরবাডির মেয়েরা সমাজেব মধ্যমণি। প্রতিভা, প্রজ্ঞা, ইন্দিরা তো আছেনই আরো আছেন হিরণ্ময়ী ও সরলা। আছেন মহারাণী সুনীতি, মণিকা, সুচারু, এসেছেন হেমলতা, প্রিয়ংবদা আরো কতজন। এদের মধ্যে নতুন কিছু করার কথা ভাবতেই পারতেন না শোভনা। তাই অনেক দূরে, নিভৃতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরিবেশে গিয়ে শোভনা সংগ্রহ করে আনলেন ডালি ভর্তি মরুকুসুম, সেই সঙ্গে

তাঁর লেখার হাতটি গেল খুলে। চোখ পড়লো এমন সব জিনিষের ওপব যাদের সবাই দেখেছে অথচ কেউ দেখেনি তাদেব ওপব।

পত্নীপ্রেমিক নগেন্দ্রনাথ উৎসাহ দিলেন। তাঁর মধ্যেও একটি কবিমন লুকিয়ে ছিল। মাইকেলেব অনুসবণে তিনি লিখেছিলেন 'যক্ষাঙ্গনা কাব্য'। কিন্তু সেসব এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয তাব চেযে শোভনার কৃতিত্ব অনেক বেশি। কি লিখবেন তিনি? স্বর্ণকুমারীর মতো গল্প? না না, সে যেন অসম্ভব। তার চেযে—তাব চেয়ে হারিযে যাওয়া-লুকিযে থাকা উপকথা-রূপকথাগুলোকে সংগ্রহ কবলে কেমন হয়? ঠাকুববাড়িব মেযে, গ্রাম বাংলাব সঙ্গে—লোকগাথার সঙ্গে পবিচয় কম। তাব চেয়ে বরং জয়পুরেব গল্প সংগ্রহ কবা যাক। আর এমনি কবেই শোভনা সত্যিকারেব পথ খুঁজে পেলেন। 'পুণ্য' পত্রিকায ছাপা হলো ভিন্ন স্বাদেব ভিন্ন পবিবেশেব কযেকটা গল্প—'ফুলচাঁদ', 'ডালিমকুমারী', 'গঙ্গাদেব', 'লুব্ধবণিক তেজারাম', 'দিলীপ ও ভীমবাজ', 'লক্ষটাকাব এক কথা'। সবই জয়পুরী গল্পেব ছাযায লেখা। প্রথমটা মনে হয়, স্বর্ণকুমারীব মতোই শোভনা ঢঙের বাজস্থান থেকে গল্প সংগ্রহ করেছেন। আসলে কিন্তু তা নয়। শোভনা মন দিয়েছিলেন উপকথা সংগ্রহে। পবে তিনি জয়পুরী প্রবাদ বা কহাবৎও সংগ্রহ করেন। সেই সঙ্গে মন দিলেন শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কেও। লেখার জন্যে লোকসাহিত্য থেকে উপকবণ নিবাচন যে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও মনোজ্ঞ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তখনকাব তুলনায তাঁব আগ্রহ বেশ নতুন ধরণের বলা বাহুল্য। কোন মহিলা তখনও লোককথা সংগ্রহ কববাব জন্যে বেরিয়ে পড়েননি। সব কাজে অগ্রণী ঠাকুরবাড়ির মেযে শোভনাই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন? লোককথার সবণি বেযেই তিনি পৌঁছোলেন প্রাচীন ভারতের পৌবাণিক সাহিত্যের জগতে।

জয়পুরী উপকথা সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে শোভনা সংগ্রহ করেছিলেন কহাবৎ বা জয়পুরী প্রবাদ। ১৯০০।১৯০১ সালে প্রবাদ সংগ্রহের দিকে বিশেষ কেউ নজর দেননি। অবশ্য লালবিহারী দে এবং আবো কযেকজন তখন বাংলা প্রবাদ সংগ্রহে মন দিয়েছেন। তবে ভিন্ন প্রদেশেব প্রবাদ সংগ্রহ করে তার অর্থ উদ্ধার,

অনুবাদ এবং বাংলায় সমার্থক প্রবাদ অনুসন্ধান করে শোভনা সত্যিই একটা নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেন। এইসব কহাবৎ-এ জয়পুর বা রাজস্থানবাসীর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ব্যঙ্গপ্রবণতা ও এ অঞ্চলের কিছু কিছু স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। আজকের দিনে অর্থাৎ শোভনার কহাবৎ সংগ্রহের প্রায় আশি বছর পরেও এই ধরণের প্রবাদ সংগ্রাহকের সংখ্যা খুবই কম। এবার কয়েকটা কহাবৎ শোনা যাক :—

মূল : "কাল কী জয়োড়ী গধেড়ী, পরসো গীত গাবে"

অনুবাদ : "কাল জন্মেছে গাধা, পরশুর গীত গাচ্ছে"

অর্থ : গর্দভ জন্মগ্রহণ করিয়াই পূর্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ অমঙ্গল ডাক ডাকিতে থাকে।

বঙ্গীয় প্রবচন : রাসভবিনিন্দিত স্বর

*　　　　*

মূল : জয়পুর কী কমাই ভাড়া বলিতা খাই

অনুবাদ : জয়পুরের উপার্জন ভাড়া ও ঘুঁটেতে ব্যয় হয়

অর্থ : জয়পুরে ঘর ভাড়া ও রন্ধনকাষ্ঠের মূল্য বেশি

*　　　　*

মূল : "সীতলা কুনসা ঘোড়া দে, আপ হী গধা চড়ে"

অনুবাদ : শীতলা ঘোড়া কোথা থেকে দেবে আপনিই গাধা চড়ে

অর্থ : নিজেই পায় না পরকে দেবে

জয়পুরের উপকথা-রূপকথা-প্রবাদ-প্রবচন ছাড়াও শোভনাকে আকৃষ্ট করেছিল জয়পুরী শিল্প—একেবারে ঘরোয়া শিল্প। ছেঁড়া কাগজ দিয়ে ধামা, চুপড়ী, থালা, বাটি, খেলনা, পুতুলকে ওখানে বলা হয় ডোমলা শিল্প। 'পুণ্য'র পাঠিকাদের তিনি 'ডোমলা'র কাজও শিখিয়েছিলেন। কিন্তু এগুলি সবই উপক্রমণিকা, এরপর শোভনা নামলেন তাঁর আসল কাজে।

এবারে শোভনা মন দিলেন নতুন দিকে। বাংলা ভাষা ছেড়ে তিনি ইংরেজীতে লিখতে শুরু করলেন ভারতের বেদ-পুরাণ-ইতিহাস-লোককথার গল্প।

ব্যাপারটা খুলেই বলা যাক। শোভনা মনে করতেন গল্প লেখার ইচ্ছে থাকলেও তাঁর কল্পনার দৌড় খুব বেশি নয়, কাজেই মৌলিক রচনার চেয়ে অনুবাদেই তাঁর হাত খুলবে বেশি। তাই প্রথমে তিনি সাহস করে অনুবাদ করে ফেললেন স্বর্ণকুমারীর জনপ্রিয় উপন্যাস 'কাহাকে'। ইংরেজি অনুবাদের নাম 'টু হুম'। খুব যে ভালো হলো তা নয়। অনুবাদকের তো কোন স্বাধীনতা নেই। স্বর্ণকুমারী নিজে যখন 'কাহাকে'র অনুবাদ করলেন 'এ্যান আন্‌ফিনিস্ট সং' নামে তখন সে অনুবাদ হয়ে উঠলো নতুন বই। যাই হোক, একই সঙ্গে শোভনা অনুবাদ শুরু করেছিলেন পুরনো দিনের গল্পের। এই ধরণের চারটি বই ছাপা হয়েছিল লণ্ডনের ম্যাকমিলান কোম্পানী থেকে।

প্রথম বই সম্ভবতঃ 'ইন্‌ডিয়ান্ নেচার মীথ্‌স্'। শোভনা লিখলেন ছোটদের মনের মতো ইংরেজিতে। 'ছোটদের' মানে এই নয় যে রসবর্জিত নীতিসার-সংগ্রহ—আসলে ইংরেজি ভাষাটা লিখলেন সহজবোধ্য ও সবার উপভোগ্য করে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, বেদ, উপনিষদ এবং লোককথা থেকে পঞ্চাশটি গল্প সংগ্রহ করে শোভনা লিখেছেন 'নেচার মীথ্‌স্'—অধিকাংশই সৃষ্টিতত্ত্বের দিকে তাকিয়ে লেখা। যেমন, 'দি অরিজিন অব তুলসী প্ল্যাণ্ট', 'দি অরিজিন অব ডেথ', 'দি অরিজিন অব ভলকানো', 'দি অরিজিন অব টোবাকো প্ল্যাণ্ট' ইত্যাদি।

"ইন্‌ডিয়ান্ ফেবল্‌স্ এ্যাণ্ড ফোকলোর" একই জাতের গ্রন্থ। শোভনা এ বইয়ের গল্প সংগ্রহ করেছেন মহাকাব্য, পুরাণ, কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র ও ভক্তমাল থেকে। সবশুদ্ধ গল্প আছে উনত্রিশটা। তার মধ্যে 'মীরাজ্ ব্রাইড্-গ্রুম' (ভক্তমাল), 'এ র‍্যাট স্বয়ম্বর' (পঞ্চতন্ত্র), 'একলব্য এ্যাণ্ড দ্রোণ' (মহাভারত), 'কাউ অব প্লেন্টি' (রামায়ণ) নিশ্চয় বিদেশী পাঠকদের বিস্মিত করেছিল। প্রায় প্রতিটা গল্পেই শোভনা বিস্ময়ের সঙ্গে আনন্দের খোরাক জুগিয়ে গিয়েছেন।

আর 'দি ওরিয়েণ্ট পার্লস্' রূপকথা সংকলন। শোভনা জয়পুরী উপকথা সংগ্রহ দিয়ে যে 'সাহিত্য-জীবন' শুরু করেছিলেন এখানেও তারই জের চলেছে। এবং এই চারটি বইয়েই ইতিহাস পুরাণ লোককথা সংগ্রহে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তবু সংস্কৃত সাহিত্য থেকে পৌরাণিক গল্প সংগ্রহ আর বাংলাদেশের

লোকের মুখে মুখে ছড়ানো রূপকথা সংগ্রহ অন্য জিনিষ। শোভনা এ সব গল্প সংগ্রহ করেন এক অন্ধ ভৃত্যের কাছ থেকে। তিনি এই রূপকথা-সংগ্রহ যদি বাংলাতেও লিখতেন তাও অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকতো। সেকালে ইংরেজিতে বই লেখার চল্ মেয়েদের মধ্যে ছিল। কনভেণ্টে পড়া, বিদেশিনী গভর্ণেসের কাছে মানুষ হওয়া মেয়েরা য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন হবেন এ আর বেশি কথা কি? তারকনাথ পালিতের মেয়ে লিলিয়ান, লর্ড সিন্‌হার মেয়ে রমলা কিংবা কুচবিহারের মহারাণী স্নীতি দেবীর দুই মেয়ে প্রতিভা ও সুধীরার কথাই ধরা যাক না কেন, তাঁদের চালচলনে সেদিন বিদেশিয়ানাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এঁরা লেখিকা হলে মনের কথা ইংরেজিতেই প্রকাশ করতেন তাতে সন্দেহ নেই। হেমেন্দ্রনাথের আট মেয়ে এবং ইন্দিরাও অভ্যস্ত ছিলেন বিদেশী চালচলনে। সুতরাং শোভনার পক্ষে ইংরেজিতে বই লেখা খুবই স্বাভাবিক। যেমন ইংরেজিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তরু দত্ত কিংবা সরোজিনী নাইডু। সরোজিনী শোভনার সমবয়সী কিন্তু শোভনার চেয়ে অনেক বেশি পরিচিতা, বিশেষ করে রাজনীতিক্ষেত্রে সরোজিনীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তাঁর কবিতার বই তিনটি 'দি গোল্ডেন থ্রেসোল্ড', 'দি বার্ড অব টাইম', ও 'দি ব্রোকেন উইঙ' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯০৫ থেকে ১৯২০ এই পনেরো বছরে 'গোল্ডেন থ্রেসোল্ডের' পুনর্মুদ্রণ হয়েছিল সাত আট বার। শোভনা এভাবে খ্যাতির চূড়া স্পর্শ করেননি, হয়তো সে ক্ষমতা তাঁর ছিল না। কিন্তু যেটুকু তিনি দিয়েছেন তারই বা মূল্য স্বীকার করে কে? একেবারে প্রথম থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত যে সব ভারতীয় রূপকথা সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে 'দি ওরিয়েণ্ট পার্ল্‌স্'-এর স্থান বেশ ওপরে। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে শোভনাই সবার পূর্ববর্তিনী। আরো আট বছর পরে ১৯২৩ সালে মহারাণী সুনীতি দেবীর 'ইন্‌ডিয়ান্ ফেয়ারি টেল্‌স্' লণ্ডন থেকে ছাপা হয়।

শোভনার পূর্ববর্তী রূপকথা সংগ্রাহকের সংখ্যাও বেশি নয়। তাঁদের নাম লালবিহারী দে 'ফোক টেল্‌স্ অব বেঙ্গল' (১৮৮৩), রামসত্য মুখোপাধ্যায় 'ইন্‌ডিয়ান্ ফোকলোর' (১৯০৪), কাশীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পপুলার টেল্‌স্ অব বেঙ্গল' (১৯০৫), ম্যাক্ কুলক 'বেঙ্গলি হাউসহোল্ড টেল্‌স্' (১৯১২), ডি. এন.

নিয়োগী 'টেল্‌স্ সেক্রেড এ্যাণ্ড সেকুলার' (১৯১২)। এর পরই প্রকাশিত হয় শোভনার 'দি ওরিয়েণ্ট পার্লস' (১৯১৫)। ১৯২০ সালে বেরোয় আরো দুটো বই ব্র্যাডলে বার্ট-এর 'বেঙ্গল ফোক টেলস্' এবং দীনেশচন্দ্র সেনের 'দি ফোক লিটারেচার অব বেঙ্গল'।

শোভনার বইয়ে রূপকথা আছে আঠাশটি। সব গল্পই শুরু হয়েছে 'Once upon a time' বলে রূপকথার আমেজে। যে সব গল্প আছে তার মধ্যে আমাদের পরিচিত ও অপরিচিত উভয় ধরণের রূপকথাই পাওয়া যাবে। 'দি ওয়াক্স প্রিন্স', 'দি গোল্ডেন প্যারট', 'দি হারমিট ক্যাট', 'এ নোজ ফর নোজ', 'আঙ্কল টাইগার', 'দি ব্রাইড অব দি সোর্ড' সকলের খুব ভালো লাগবে। তবে এসব রূপকথা যে বিদেশীদের একেবারে অপরিচিত তা হয়তো নয়, কারণ বিভিন্ন দেশের রূপকথার মধ্যে গল্পের অদৃশ্য যোগ রয়েছে।

আপাতভাবে স্বল্প পরিচিত 'টেলস্ অব দি গড্‌স্ অব ইন্‌ডিয়া'তেও নতুনত্ব আছে। এখানে দেবতাদের গল্প নির্বাচন করা হয়েছে ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। ইদানীংকালে বাংলায় 'প্রেমকথা' নাম দিয়ে কয়েকটি পৌরাণিক প্রেমকাহিনী প্রকাশ করা হয়েছে, যেমন—'ভারত প্রেমকথা', 'রামায়ণী প্রেমকথা', 'গ্রীক প্রেমকথা', 'আরণ্য প্রেমকথা' ইত্যাদি। এই লেখকদের অনেকেই হয়তো জানেন না তাঁদের অনেক আগে রামায়ণ-মহাভারত-বেদ-পুরাণ থেকে যুগল প্রেমের উৎস সন্ধান করেছিলেন শোভনা। ভারতের দেবদেবী সংক্রান্ত বইটির জন্যে শোভনা সংগ্রহ করেছেন তিরিশটি গল্প। তিনি কোথা থেকে কোন গল্প নিয়েছেন তার উৎস নির্দেশ করতেও ভোলেননি। নাম নির্বাচনও সুন্দর। ঋগ্বেদ থেকে তিনি নিয়েছেন পাঁচটি গল্প—'দ্যু ও পৃথিবী', 'যম ও যমী', 'ঋভুভ্রাতৃদ্বয় ও উষা', 'অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও সূর্যা' এবং 'বিবস্বান ও সরণ্যু'। মহাভারত থেকে সংগ্রহ করেছেন আরো চোদ্দটি গল্প। সেগুলি আমাদের খুবই পরিচিত, যেমন, 'পুরূরবা ও উর্বশী', 'সংবরণ ও তপতী', 'রুরু ও প্রমদ্বরা', 'সোম ও তারা', 'বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী', 'ইন্দ্র ও শচী', 'সাবিত্রী ও সত্যবান', 'বিষ্ণু ও লক্ষ্মী', 'শিব ও সতী', 'মদন ও রতি, 'অর্জুন ও উলূপী', 'ভীম ও তাঁর রাক্ষসী বধূ', 'বলরাম ও রেবতী',

'দময়ন্তী ও তাঁর দেব পাণিপ্রার্থী'। রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে 'রাম ও সীতার গল্প' এবং 'অগ্নি ও স্বাহার গল্প'। শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে নেওয়া হয়েছে 'চ্যবন ও সুকন্যা' এবং 'মিত্র, বরুণ ও অসির আখ্যান'। কালিদাসের কাব্য থেকে শোভনা নিয়েছেন 'কুমারসম্ভব', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' এবং 'মেঘদূতের গল্প'। 'যম ও বিজয়ার কথা' নেওয়া হয়েছে ভবিষ্যপুরাণ থেকে এবং 'বেহুলা ও লখীন্দরের কাহিনী' মনসামঙ্গল থেকে তিনি সংগ্রহ করেন। কোন কোন গল্প দু তিনটি বইয়ে আছে বলে তিনি তাদেরও উল্লেখ করেছেন, যেমন 'বিষ্ণু ও লক্ষ্মী' আছে মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে আবার 'শিব ও সতী' আছে মহাভারত ও ভাগবতপুরাণে। গল্প নির্বাচনে এবং তার উৎস নির্দেশে শোভনার এই সাবধানতা বিস্ময়কর। পরবর্তীকালে এই বইটি যতই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে এই জাতীয় গল্পের চাহিদাও ততই বেড়েছে।

শুধু বই লেখা নিয়েই মেতে থাকেননি শোভনা। মেতে উঠেছিলেন স্কুল নিয়ে। ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের স্কুল খোলার নেশা এক আশ্চর্য নেশা। সেই নেশা ছিল শোভনারও। তাঁর নিঃসন্তান জীবনের অনেকখানি কেটে যেত হাওড়া গার্লস্ স্কুলের তত্ত্বাবধানে। স্কুলে তিনি পড়াতেন ইংরেজি। এখনও ঐ স্কুলে তাঁর নামাঙ্কিত একটি রৌপ্যপদক স্কুলের সেরা ছাত্রীকে প্রতিবছর দেওয়া হয়। এ ছাড়াও তিনি খুলেছিলেন একটা ছোট্ট গানের স্কুল। বেশ চলছিল। আকস্মিকভাবে সব শেষ হয়ে গেল। সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু হলো শোভনার। শোকার্ত পত্নীপ্রেমিক নগেন্দ্রনাথের লেখা একটি শোকগাথা 'প্রেমাঞ্জলি' নামে ছাপা হলো, রবীন্দ্রনাথ তার ভূমিকায় লিখেছিলেন একটি ছোট্ট কবিতা 'শোভনা'।

শোভনাসুন্দরী ও সুষমাসুন্দরী দুটি কর্মব্যস্ত বোনের মাঝখানে একটু ক্ষীণ যতির মতো ছিলেন সুনৃতা। হেমেন্দ্রনাথের মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে অপরিচিতা। তাঁর জীবনদীপও নিভেছিল অভিজ্ঞার মতো নিতান্ত অসময়ে। তবে অভিজ্ঞার মতো ভাগ্যবতী নন তিনি। মৃত্যুর পরেও অভিজ্ঞা বেঁচে ছিলেন সবার স্মৃতিতে, সুনৃতাকে তাঁর নিকট আত্মীয়রাও মনে রাখেনি। হয়তো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে তিনিও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিতে পারতেন। এখন তাঁর সম্বন্ধে

প্রায় কিছুই জানা যায় না। তাঁর স্বামী নন্দলাল ঘোষাল ছিলেন বারুইপুরের প্রসিদ্ধ ঘোষাল পরিবারের সন্তান। পরে অবস্থা বিপর্যয়ে তাঁদের চলে যেতে হয় শ্যামনগরে। সুনৃতার সঙ্গে বাপের বাড়ির যোগ ছিন্ন হয় দারিদ্র্য ও দূরত্বে। তবে সুনৃতা এখনও বেঁচে আছেন 'পুণ্য' পত্রিকার পুরনো ফাইলে। আছেন নন্দলালও। তাঁরা দুজনেই সাহিত্যানুরাগী এবং 'পুণ্যে'র লেখক-লেখিকা ছিলেন। অবশ্য সুনৃতার মন ছিল প্রজ্ঞার মতো গৃহিনীপণায়। তাঁর ইচ্ছে ছিল 'পুণ্যে'র মাধ্যমে পাঠিকাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবেন নানারকম মুখরোচক আচার। আমের আচার, কুলের আচার, তেঁতুলের আচার প্রভৃতির প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশ করতেন সুনৃতা। সাহিত্য জগতে তাঁর ভীরুকুণ্ঠিত প্রবেশ একটিমাত্র রচনা নিয়ে "ব্রহ্মে শূলীনাথ"। বর্মায় শূলীনাথ শিব খুব বেশি পরিচিত নন। তথাগত মন্দিরের প্রাধান্যের মধ্যে শূলীনাথ কোন রকমে নিজের অস্তিত্বটুকু বাঁচিয়ে রেখেছেন। সুনৃতা তাঁর খবর পেলেন কি করে? বৌদ্ধ প্যাগোডার বদলে পুরনো মন্দিরের প্রতি আগ্রহ দেখে মনে হয় তিনি ঝুঁকেছিলেন মন্দির-শিল্প ও বৈশিষ্ট্যের দিকে। কিন্তু একটার বেশি প্রবন্ধ লেখা হয়ে ওঠেনি।

সুনৃতার ছোট বোন সুষমার মন প্রথম থেকেই বিদ্রোহী। তাঁর দিদিরা সবাই লরেটোতে পড়লেও সুষমা বাড়িতেই লেখাপড়া শিখতেন, সেই সঙ্গে স্বপ্ন দেখতেন সব বন্ধন ছিঁড়ে এগিয়ে যাবার। অগ্রগতির পথে প্রথম বাধা বিবাহ। সুতরাং সুষমা ঠিক করলেন বিয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির ট্র্যাডিশন আর মায়ের দৃঢ়তা ষোড়শী সুষমাকে নতুন পথে এগিয়ে যেতে বাধা দিল। নতুন ভাবে পথ দেখালেও ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা কেউই 'পরিণয়ে প্রগতি' দেখাতে পারেননি। প্রেম-ভালোবাসার ক্ষেত্রেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন কি? মনে পড়ে না। সুষমার বান্ধবী প্রথম মহিলা ঈশান স্কলার লিলিয়ান পালিত প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা এনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। কেশব সেনের নাতনীরাও কম যান না। কুচবিহারের রাজকন্যা প্রতিভা ও সুধীরা বিয়ে করেছিলেন জন ম্যাগার ও হেনরি ম্যাগারকে। সে নিয়েও কি কম

হৈ চৈ হয়েছে ? কিংবা হরিপ্রভা তাগেদা ? যিনি ১৯০৭ সালে প্রথম জাপানী স্বামীর ঘর করতে গেলেন জাপানে। সবাই চমকে উঠেছিল। কত আগ্রহ নিয়ে যে বাঙালী হরিপ্রভার লেখা 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা' পড়েছে তার তুলনা হয় না। সে তুলনায় ঠাকুরবাড়ির অনেক মেয়েই বেশ প্রাচীনপন্থী এমনকি ভিন্ন প্রদেশের বরের সঙ্গে বিয়ে হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাতে পূর্বরাগের ছিটেফোঁটা থাকতো না।

সুষমার বিয়ে হয়েছিল গতানুগতিকভাবে যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে। বুধবার ১৯০০ সালের ৭ই মার্চ। সুষমা তখন সবে ট্রিনিটি কলেজ থেকে পিয়ানোর পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছেন। য়ুরোপীয় ছাত্রীরাও পিয়ানোয় সুষমার কাছে হার মেনে-ছিলেন। কিন্তু গান-বাজনা বা সাহিত্য বা রান্নাঘর দিদিদের বাঁধাধরা গতের কোনটার মধ্যেই সুষমা নিজেকে বেঁধে রাখেননি। তিনি সব কিছু শিখে তারপর এগিয়ে যেতে চেয়েছেন নারী প্রগতির বন্ধুর পথে। পায়ে বেড়ি পড়লো। যোগেন্দ্রনাথ ব্যারিস্টার কিন্তু তাঁর মন ছিল অন্য দিকে। তিনি ভালোবাসতেন অঙ্ক কষতে। তাঁর 'মডার্ণ এরিথমেটিক' খুব জনপ্রিয় স্কুলপাঠ্য অঙ্কের বই। স্ত্রীর প্রগতির পথে কোন বাধা দেবার প্রশ্নই ওঠে না। তবু সুষমা যেন শান্তি পান না। এগিয়ে যাবার মতো একটা পথ ! একটা পথের খবর কি কেউ দিতে পারবে না ? চিন্তায় ঘুম আসে না। মনের মধ্যে গুমরে ওঠে বোবা কান্না !

অবশেষে পথের সন্ধান পেলেন সুষমা। কোথা থেকে হাতের কাছে এসে পড়লো 'আঙ্কল টম্‌স্ কেবিন' বইটা। পাতার পর পাতা এগিয়ে যেতে চোখের পাতা ভিজে ওঠে। এই বইয়ের লেখক কে ? হ্যারিয়েট বিচার স্টো ? তার মানে একজন মহিলা ? আচ্ছা তাঁর কি ঘর-সংসার নেই ? তবু কি করে তিনি এমন বই লেখেন ? সুষমা মাদাম স্টোর জীবনচরিত পড়তে বসেন আগ্রহ নিয়ে। অসীম আগ্রহ। অবশেষে একটা তৃপ্তির আমেজ নেমে আসে। হ্যাঁ, এই তো। এই তো পথের সন্ধান পাওয়া গেছে। হ্যারিয়েট যদি পেরে থাকেন সুষমাই বা পারবেন না কেন ?

সুষমা মন দিলেন নারী জাগরণের দিকে। প্রথমেই তিনি স্থির করলেন

'মেয়েরা জাগো' বা 'মেয়েদের জাগাতে হবে' এসব ধুয়ো না ধরে তাদের সামনে কতকগুলো উদাহরণ তুলে ধরবেন। যাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের যদি চোখের সামনে রাখা যায় তবে সবার পক্ষেই দাঁড়ানো সম্ভব। তাঁর মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব যিনি ঘুচিয়েছিলেন সেই মাদাম স্টোর কথাই সবার আগে লিখলেন সুষমা। সমসাময়িক বিচারে সেটা বেশ নতুনও বটে। এর আগে বাঙালীরা কেউ খ্যাতনাম্নী মহিলাদের জীবনী লেখায় তেমন আগ্রহ দেখাননি। আর সেরকম মেয়েই বা তখন কোথায়? আজ আমরা যাঁদের মহিয়সী বা প্রগতিশীলা বলে থাকি সমসাময়িককালে তো সেভাবে বিচার করা সম্ভব ছিল না। তাই সুষমা শুরু করলেন বিদেশিনীদের নিয়ে। ইচ্ছে ছিল বাংলায় বিদেশিনীদের কথা বলে ভারতীয়াদের নিয়ে লিখবেন ইংরেজিতে। একে একে 'পুণ্যে' ছাপা হলো 'হ্যারিয়েট বিচার স্টো', 'হ্যারিয়েট মার্টিনো', 'মাদাম দ্য স্টেল', 'সুইডিস গায়িকা লিণ্ডের জীবনী'। এসব জীবনী সংগ্রহ করে সুষমা দেখাতে চেয়েছিলেন সাহিত্যিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাঙ্গীতিক ক্ষেত্রে নারীর চরম সাফল্য। নিজের দেশের ললনাদের চোখ ফোটানোর জন্যে তো বটেই সেইসঙ্গে সুষমা কলম ধরেছিলেন তাদের জন্যেও "যাহারা বলেন যে স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধি পরিচালনা দ্বারা কোন কর্ম করিবার শক্তি নাই, মহিলাগণ কেবল সন্তান পালন করিতেই জানেন। স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা কিছুই করিতে পারেন না।" চোখ থাকতেও যারা দেখতে পায় না তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায়ই বা কি!

সুষমার লেখা এসব বাংলা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল 'পুণ্য' পত্রিকায়। বাংলা ভ্রমণকাহিনী ছাপা হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। তাঁর কাশ্মীর ভ্রমণকাহিনীতে পথের বর্ণনা ও সৌন্দর্যের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে কাশ্মীরবাসীর জীবনযাত্রা ও দুঃখদুর্দশার কথা। প্রায় একই সময়ে তিনি ইংরেজীতে লেখা শুরু করেন 'আইডিয়ালস্ অব হিন্দু উওম্যানহুড'। ভারতীয় নারীর আদর্শরূপে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সতী, সীতা, শৈব্যা, সাবিত্রী, দয়মন্তী ও শকুন্তলাকে। লেখা হয়েছিল তবে ছাপা হয়নি। আজো পাণ্ডুলিপি আকারেই জীর্ণ খাতাটি পড়ে আছে,

তাঁর নাতিদের কাছে। নারী নির্বাচনেও তিনি সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় দিয়েছেন। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দাম্পত্য প্রেমে যাঁরা উজ্জ্বল সেইসব নারীদের আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

সুষমার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল আরো কিছুদিন পরে। ১৯২১ সালে সাতটি সন্তানের জননী ও গৃহস্থবধূ হয়েও যখন তিনি নারীপ্রগতি ও শিক্ষাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে যাত্রা করলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। এর প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে জ্ঞানদানন্দিনীও একা গিয়েছিলেন ইংলণ্ডে। সে যাত্রাও ছিল দুঃসাহসিক তবে তার সঙ্গে সুষমার যাত্রার তুলনা হয় না। সুষমা গিয়েছেন বিজয়িনী বেশে এবং গিয়েছেন বক্তৃতা দিতে। না, না, সর্বপ্রথম ভারতীয় বক্তা নন সুষমা। তাঁর আগে মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রতাপ মজুমদার, স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় রেখে এসেছেন। শুধু পুরুষেরা নয়, ভারতীয় নারী রমাবাঈও গিয়েছেন আমেরিকায়। এঁদের পরে সুষমা। তবু 'Hindu poet and Philosopher' রবীন্দ্রনাথের ভাইঝিকে নিয়ে সাড়া পড়ে গেল যুক্তরাষ্ট্রে। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথকে যুক্তরাষ্ট্রের খবরের কাগজ কবি ও দার্শনিক রূপেই ব্যাখ্যা করেছে এবং সেই সঙ্গে সব সময় যোগ করা হতো 'হিন্দু' শব্দটি। সুতরাং 'Niece of Tagore' সবার মনেই প্রচণ্ড আগ্রহ ও উৎসাহ জাগালেন।

কেন সুষমা বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন? বেড়াতে? উঁহু, বেড়াতে নয়। সুষমার দিদি মনীষা ও শোভনা হয়তো বেড়াতেই গিয়েছিলেন, বেড়িয়ে-টেড়িয়ে ফিরে এসেছেন সেযুগের অনেক শিক্ষিতা এবং প্রগতিশীলা মেয়ের মতো। কিন্তু সুষমার কথা স্বতন্ত্র। ছোটবেলার সেই না-মেটা সাধ সার্থক করতে হবে না? ঘরে-বাইরে সমানভাবে কাজ করবার জন্যে তৈরি হলেন সুষমা। ছেলেমেয়েরা সবাই বড়ো হতে বাইরের জগতের দিকে একটু তাকাবার সুযোগ পেলেন এতদিনে। প্রথমে একটা ছোটখাটো স্কুল খুলে ফেললেন ১৯২২ সালে। একেবারেই মেয়েদের জন্যে। নাম 'বালিকা শিক্ষা সংঘ'। স্কুল খোলার পর সুষমা বুঝতে পারলেন ভারতে অশিক্ষিতার সংখ্যা কত বেশি! এতদিন তিনি

চিনতেন শিক্ষিত সমাজকে। এবার দেখলেন দেশের শতকরা নিরানব্বই জন মেয়েই নিরক্ষর। তাই তো প্রথম এম-এ পাশ চন্দ্রমুখী বসু এবং প্রথম ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখবার জন্যে ভিড় জমে যেত। জমবে না কেন? শিক্ষিতা মেয়ে কই, সে তো গোনাগুন্তি কয়েকটা পরিবারে। অথচ তখন বিদুষীর সংখ্যা বাংলা দেশে মোটেই কম নয়। চন্দ্রমুখী-কাদম্বিনীর যুগ অনেকদিন কেটে গেছে। অবলা দাস ও এলেন ঠ্যাক্রুর মাদ্রাজে মেডিকেল পড়তে যাওয়াও পুরনো খবর। তখন তটিনী গুপ্ত (দাস) সম্মিলিত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন, লিলিয়ান হয়েছেন ঈশান স্কলার, হিন্দু ঘরের বিধবা সরলাবালা মিত্র শিক্ষণশিক্ষার জন্যে বৃত্তি নিয়ে গেছেন ইংলণ্ডে। হরিপ্রভা গেছেন জাপানে। রাজনীতি ক্ষেত্রে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছেন কল্পনা দত্ত কিংবা বীণা ভৌমিকের মতো মেয়েরা। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে তো চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ারই কথা। সুষমার দিদিরাও শিক্ষিতা। ইন্দিরা আর সরলা রীতিমতো অনার্স গ্র্যাজুয়েট। সুতরাং স্কুল খোলার আগে সুষমা বুঝতেই পারেননি নিরক্ষর মেয়েদের সংখ্যা কত বেশি। শুধু স্কুল নয় এসময় সুষমা জড়িয়ে পড়েন 'উইমেন এডুকেশনাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া'র সঙ্গে। এই সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট হয়ে তিনি অশিক্ষিতা মেয়েদের জন্যে আরো বেশি ভাবনা-চিন্তা করার সুযোগ পেলেন।

প্রথমেই সুষমার চোখ পড়লো যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাভাবিকভাবেই নিঃস্ব ক্ষতবিক্ষত য়ুরোপের চেয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। তার ওপর সেখানে গিয়ে স্বামীজী যে উন্নতমনা ও উদারহৃদয় মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন সেকথাও সবার জানা, বিশেষ করে সুষমার কাকা রবীন্দ্রনাথ সেখানে বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন ১৯১৬ সালে। সুতরাং একবার সে দেশের উন্নতি ও নারীপ্রগতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আসার জন্যে সুষমা প্রস্তুত হলেন। সেখানকার মেয়েদের বহুমুখী জীবন-প্রবাহ এদেশের মেয়েদের যদি বিভিন্ন দিক থেকে প্রভাবিত করতে পারে তাহলে তো ভালোই হয়। আমেরিকায় সুষমা তাঁর পৈত্রিক উপাধিটি ব্যবহার করেছিলেন শুধু সহজে

পরিচিত হবার জন্য।

সুষমার বিদেশ সফর সাড়া জাগিয়েছিল। আমেরিকানদের মনে হয়েছিল এ আবার কি? তাঁরা যখন মিস মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' পড়ে ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে একটা ভাসা ভাসা ধারণা গড়ে নিয়েছেন তখন কোথা থেকে এলো এই গ্রহান্তরের মানবী? হিন্দু কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁদের মনকে নাড়া দিয়ে গিয়েছেন। এবার এসেছেন তাঁরই ভাইঝি, ভাইপো হলেও এতো চমকাতেন না আমেরিকার মানুষ। যতো না বক্তৃতা শোনার জন্যে হোক ভারতীয়াকে একবাব চোখে দেখবার জন্যে সবাই মনে মনে উৎসুক হয়ে উঠলেন।

সুষমা যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছলেন ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। আমেরিকার নরনারী অবাক হয়ে দেখলে শুচিস্মিতা লাবণ্যে পূর্ণতনু এক গরিয়সী তেজস্বিনীকে। যেন দৃপ্ত অগ্নিশিখা। বক্তার দিকে শ্রোতারা চেয়ে থাকতেন মুগ্ধ হয়ে। ঘনপক্ষ্ম কৃষ্ণভ্রমর বিশাল দুটি চোখ তুলে তিনি সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াতেন মঞ্চের ওপর। বিদেশীদের চোখে পড়তো "a sari of purple silk with sleeves of green embroidered in gold", আপনিই বুঝি উত্তেজনায় ঝিমঝিম করে উঠতো নীল রক্ত। বিস্ময় ঝরে পড়লো কলমের মুখে:

"Miss Tagore is a charming bit of the Orient in an occidental setting. Short of stature, quiet and demure, with lazy dark eyes that can flash fire when the occasion arises, it takes the native garb of India to really do justice to her Hindu beauty."

এরপর যখন নিখুঁত উচ্চারণে মিষ্টি অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সুষমা বক্তৃতা শুরু করলেন তখন উল্লাসের হিল্লোল বয়ে গেল শ্রোতাদের মধ্যে। এত সুন্দর স্পষ্ট উচ্চারণ, এত নিপুণ নিখুঁত? উচ্চারণ বিভ্রাটের জন্যে অধিকাংশ ভারতীয়ই বিদেশীদের মনে ছাপ ফেলতে পারেন না। সুষমা তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া মেশালেন কণ্ঠে। বিদেশী সাংবাদিকরা লিখলেন:

"She speaks softly, with never a trace of bitterness of the

lot of her people, and her expression never changes, except when her deep dark eyes seem to smile."

আসলে সুষমার চোখ দুটি আকর্ষণ করেছিল বিদেশীদের। অনেকেই লিখেছেন :

"Her eyes are very large, and very black."

'ডেলি টেক্সাসে'র সংবাদিক সুষমার বক্তৃতার প্রশংসা করে শেষে তো বলেই ফেললেন :

"Not only is Miss Tagore ably qualified to discuss this subject (The Ideals of India) through extensive study and experiènce; but she is also capable ot presenting it in clear and forceful English, which none of the people of India can do."

আমেরিকাবাসিনীদেরও নতুন লেগেছিল সুষমাকে। তাঁরা যখন শুনলেন সুষমা লম্বা চুল কাটতে রাজী নন বরং দীর্ঘ কেশকেই নারীর সৌন্দর্য মনে করেন তখন যেন চমকে উঠলেন। বিস্ময় চরমে উঠলো সুষমা রুজ্-লিপস্টিক ব্যবহার করেন না শুনে ; এমন কি তিনি ধূমপান করতেও রাজী নন। কেননা এ সবই সুষমার কাছে 'most unladylike'। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুটে এলো। সব উত্তরই তিনি দিলেন হাসিমুখে। হ্যাঁ, তিনি মনে করেন বৈকি শিক্ষার প্রয়োজন আছে। এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি দেখতেই তো এসেছেন। তবে তাঁর মতে 'ভারতীয় মেয়েদের বিবাহিত জীবনের জন্যেই শিক্ষা দেওয়া উচিত ; কারণ ভালো স্ত্রী ও ভালো মা হবার শিক্ষাই তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।' অর্থাৎ প্রথম জীবনে বিবাহ সম্বন্ধে তাঁব মনে যত বীতরাগই জমে থাকুক না কেন পরবর্তী জীবনে তিনি সনাতন ভারতীয় রীতিকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বের নানাবিধ সমস্যার সমাধান সম্পর্কেও তিনি তাঁর নিজস্ব অভিমত জানিয়েছিলেন আমেরিকার মেয়েদের :

"When women are united as wives, mothers and daughters they have more influence on men than has man

on woman. If we would only remember that we are all children of one God, our women united would establish world peace."

তিনি আরো বলেন :

"The supreme, traditional virtues of the Hindu woman are fidelity, sincerity and self sacrificing love. A wife subordinates her wishes to those of her husband."

সুষমার মতে :

"Real satisfaction lies in control and self restraint. Let us enjoy the material side of life, but not lose ourselves in its glamour."

এসব বক্তৃতার কথা প্রকাশিত হয়েছিল আমেরিকার বিখ্যাত কাগজের পাতায় পাতায়। কিন্তু তাঁর এসব বক্তৃতার প্রতিলিপি ভারতের কোথাও পাওয়া যায় না। আর একটু শোনা যাক সুষমার কথা। পশ্চিমের বিবাহ-প্রথার প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধা ছিল না। নিউইয়র্কের একটা হলে তিনি রক্তলাল শাড়ি পরে দৃপ্ত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাতারার মতো দুটি উজ্জ্বল চোখ তুলে যখন বললেন :

"Your idea of marriage, companionate marriage and love seems very strange to us. Your divorces startle us. We believe in the holiness of marriage, considering it a sacred and divine union of two souls. Our marriages are regarded as permanent; separation or divorce unspeakable, we stay married."

গুঞ্জন উঠলো, সে কী! এতদিন যে আমরা শুনেছি ভারতে মেয়েরা পুরুষের হাতের খেলার পুতুল! আর তাদের সম্মান? সে তো নেই বললেই চলে। এ কথাই তো আমরা জেনেছি। বিদেশিনীদের কথায় হাসি পায় সুষমার।

লেন, "আমাদের দেশের মেয়েরা অনেক বেশি প্রভাবশালিনী। তারা সৃষ্টির কাজে ঈশ্বরকে সাহায্য করে। তোমাদের কাছে ভগবান পিতা কিন্তু ভারতে আমরা তাঁকে বলি মা।" আর অত দূরে যাবার দরকার কি, সুষমা প্রশ্ন করেন তাঁদের, "এই যে আমি এত দূরে এসেছি, বাড়ি থেকে চোদ্দ হাজার মাইল দূরে, স্বামীর ওপর প্রভাব বিস্তার করবার ক্ষমতা না থাকলে পারতুম কি?"

আমেরিকায় সুষমা যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মধ্যে 'ভারতের নারী', 'নারী শিক্ষা', 'ভারতের আদর্শ', 'ভারতের দর্শন', 'বিশ্বভগ্নীত্ববোধ' (Universal Sisterhood), 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'মহাত্মা গান্ধীর দর্শন' ও 'বৈদিক সঙ্গীত' খুব জনপ্রিয় হয়। বারবার নানান্ জায়গা থেকে তাঁর ডাক আসে। শেষদিকে আরো দুটো বক্তৃতা দিয়েছিলেন 'মাই পিলগ্রীমেজ টু আমেরিকা' ও 'এ্যাডভানটেজ এ্যাণ্ড ডিজএ্যাডভানটেজ অব ইণ্টার ম্যারেজ বিটুইন ইন্দো-এরিয়ানস্ এ্যাণ্ড ইউরো-এরিয়ানস্'। প্রায় দু বছর ধরে বিদেশ সফর করে ঘরে ফিরে আসেন সুষমা ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে। সঙ্গে নিয়ে আসেন শিক্ষণ ব্যবস্থার রীতিপদ্ধতি, মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও দুর্লভ সম্মান। যুক্তরাষ্ট্রের আটত্রিশটি জায়গায় সুষমা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল অবশ্য শিক্ষা তাই তাঁকে 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ন্যাশনাল এডুকেশনে'র কনফারেন্সেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা গেছে। তিনি সব সময় বলেছেন শিক্ষার মতো প্রয়োজনীয় আর কিছুই নয়, 'The general education for the masses is more important than any kind of agitation for political change.' তাই কাকা রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনিও গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেননি। বলেছেন, "A word such as non-co-operation is meaningless to the great majority in India, education being permanent and political condition transitory."

ভারতবর্ষে ফিরে এসে সুষমা তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতাকে খুব বেশি কাজে লাগাতে পারলেন না কারণ তাঁর স্বামী ও এক কন্যার আকস্মিক মৃত্যু এবং দুই পুত্রের সন্ন্যাসগ্রহণ তাঁকে জটিল সমস্যার মুখোমুখি করে দিল। অবশ্য ভেঙে

পড়েননি সুষমা। শিক্ষা এবং স্কুল সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ছাপা হলো সংবাদপত্রে। জনশিক্ষা বিস্তারের জন্যে তাঁর চিন্তা এবং পরিকল্পনা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। তাঁর পরিকল্পনার প্রধান তিনটি পদক্ষেপ হলো :

১. ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অন্ততঃ ২০ জন সদস্য নিয়ে 'ভারতের গ্রাম নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি' নামে একটা সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২. প্রত্যেক প্রদেশে একটা করে প্রাদেশিক কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৩. যেখানে যেখানে ইউনিয়ন বোর্ড আছে এবং সেই বোর্ডের অধীনে যত গ্রাম আছে, তাদের প্রত্যেক গ্রামের এক একজন প্রতিনিধি নিয়ে প্রাদেশিক কমিটি খুলবে গ্রাম্য শিক্ষা কমিটি। এছাড়া গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়তে আসছে কিনা সেটা দেখার ভার থাকবে গ্রাম্য শিক্ষা কমিটির ওপর। স্থানীয় চাঁদায় পাঠশালার জিনিষপত্র কেনা হবে, ক্লাস হবে খোলা হাওয়ায়, গাছের নীচে। আর যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত শিক্ষক না পাওয়া যায় তাহলে তাঁকে সামান্য পারিশ্রমিক অর্থাৎ নগদে না হোক চাল ডাল জিনিষপত্র দিতে হবে। প্রত্যেক জমিদারকে দিতে হবে পাঁচ বিঘা জমি আর প্রত্যেক প্রদেশের জন্যে দরকার হবে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা।

মনে রাখতে হবে, সুষমা যখনকার কথা ভেবেছেন তখন ভারতের শাসক বিদেশী। সুতরাং সরকারী সাহায্যের কথা তিনি ভাবেননি। তাঁর এই পরিকল্পনার মধ্যে পল্লীচিন্তা এবং শিক্ষাবিস্তারের বাস্তবানুগ ধারণার ছাপ স্পষ্ট। এখনকার দিনে বয়স্ক শিক্ষার প্রসারের কথাও ভাবা হচ্ছে। গ্রামের মধ্যে থেকেই এ ধরনের কমিটি গড়ে উঠলে শিক্ষার প্রসার আরও সহজ হবে বলেই মনে হয়। এর পরেও সুষমা দীর্ঘদিন ছিলেন। ইদানীংকালে আমেরিকায় নারীমুক্তি আন্দোলনের ঝড় তুলেছিলেন বেটি ফ্রিডান, গ্লোরিয়া স্টেনেম ও কেটি মিলেট—কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে সুষমা আর নারীমুক্তি নিয়ে চিন্তা করেননি। কেউ তাঁর মতামতও জানতে চাননি। অথচ এসময় তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, স্কুলে পড়িয়েছেন কিন্তু সবই নীরবে প্রায় নিভৃতে। দুঃখের বিষয় এই যে, আন্তর্জাতিক নারীবর্ষেও সুষমা রয়ে গেলেন সবার অলক্ষ্যে।

সুষমা সম্বন্ধে আর একটি কথা বলে আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাব। তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ 'আমেরিকায় বেদান্ত ধর্মের প্রভাব ও সমাদর'। প্রবন্ধটি তৎকালীন কোন কাগজে ছাপা হয়নি বলে পাণ্ডুলিপি আকারেই পড়ে আছে। খানিকটা বাদ দিয়ে ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'চতুরঙ্গে' ছাপা হলেও আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে সুষমার মূল রচনাটি। কারণ এতে সুষমা স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত কিছু খবর দিয়েছেন। যদিও এ খবর আমাদের অজানা নয় তবু তিনি আমেরিকায় গিয়ে স্বামীজীর সংবাদ সংগ্রহ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন জেনে ভালো লাগে বৈকি। রামকৃষ্ণ মিশন এবং সন্ন্যাসীদের প্রতি সুষমার শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রও রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুষমার সঙ্গে আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী পরমানন্দ, ভগিনী দেবমাতা ও ভগিনী দয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। যাইহোক, ভারতবর্ষে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ স্বামীজীব আমেরিকাবাস ও ভ্রমণ সম্পর্কে নানারকম কুৎসা রটাচ্ছিলেন। দু একটি সংবাদপত্রও এ ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ইচ্ছে করেই এ সব কুৎসাকে প্রশ্রয় দিতে থাকলেও খবরের কাগজের এসব সংবাদ অধিকাংশ ভারতবাসীকে মর্মাহত করেছিল। দুঃখ পেয়েছিলেন সুষমা। তাই আমেরিকায় গিয়ে তিনি এই পূতচরিত্র সন্ন্যাসীর মিথ্যা দুর্নাম সম্বন্ধে বহু খোঁজ করেন। সুষমার অনুসন্ধান ব্যর্থ হয়নি। আমেরিকার বিভিন্ন মানুষ বিশেষতঃ মহিলারা জানান স্বামীজীর নামে যা কিছু রটানো হয়েছে সবই মিথ্যা এমনকি তার পেছনে তদানীন্তন সরকারেরও চক্রান্ত রয়েছে। স্বামীজীর প্রতি সুষমার শ্রদ্ধা এবং তাঁব এই অনুসন্ধান স্পৃহা আমাদেরও মুগ্ধ করে।

আট বোনের মধ্যে সবার ছোট বোন সুদক্ষিণা। পোষাকী নাম পূর্ণিমা। জন্মের পরই বাবাকে হারিয়ে সুদক্ষিণা বড়ো হয়েছিলেন দাদা-দিদিদের আদর যত্নে। বাপের বাড়িতে যতদিন ছিলেন ততদিন তাঁকে চেনাই যায়নি। চাঁদের ষোলোকলার মতো যখন তাঁর রূপ আর অভিমান দুকূল ছাপিয়ে বন্যার মতো

ছড়িয়ে পড়লো তখন যেন সবার চোখ খুললো। তাই তো! এ যে রাজারাজড়ার ঘরে যাবার উপযুক্ত। সুদক্ষিণা কি শুধু সাধারণ ঘরের শিক্ষিত ছেলের জীবনসঙ্গিনী হবেন, না হতে পারেন? তাঁর জন্যে খুঁজতে হবে মনের মতো বর। অচিরেই পাওয়া গেল। বুধাওনের অধিবাসী হরদৈ জেলার জমিদার পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ পাণ্ডে। শোনা যায়, জমিদার হওয়া সত্ত্বেও তিনি নাকি ছিলেন আই-সি-এস অফিসার। হিন্দুস্থানী কেতায় পালকি চেপে উত্তর-প্রদেশে স্বামীর ঘর করতে চলে গেলেন সুদক্ষিণা। ঠাকুরবাড়ির একটি স্ফুলিঙ্গ গিয়ে পড়লো অনেক দূরে। তারপর দাবানলে যখন পরিণত হলেন তখন জ্বালাপ্রসাদ পরলোকে।

সুদক্ষিণার কার্যক্ষেত্র উত্তরপ্রদেশের হরদৈ-বুধাওন-শাজাহানপুরে, তাই বাংলা দেশে তিনি একরকম অপরিচিতা। আমরা সুনৃতার মতো তাঁকেও পাই 'পুণ্য' পত্রিকার পাতায়। রান্নার 'লক্ষ্ণৌ' প্রণালী লিখতেন তিনি। প্রজ্ঞার মতো হয়তো তাঁরও রান্নার হাতটি ভালো ছিলো কিংবা বাপের বাড়ির দেশের লোকের মুখে শ্বশুরবাড়ির দেশের সুখাদ্য তুলে দেবার স্বাভাবিক ইচ্ছেয় তিনি কলম ধরেছিলেন। নয়তো রান্নাঘরের ঘোমটা ঢাকা বৌটির ভূমিকায় তাঁকে মানায় না।

জ্বালাপ্রসাদ সস্নেহে স্ত্রীকে জমিদারী পরিচালনা শিখিয়েছিলেন। তাঁর কাছে সুদক্ষিণা শিখেছিলেন ঘোড়ায় চড়া ও বন্দুক ছোঁড়া। অর্থাৎ উগ্র আধুনিকারা সেকালে যা যা শিখতেন সে সবই শিখেছিলেন তিনি। ইংরেজি বলতেন মেম সাহেবের মতো। স্বামীর মৃত্যুর পরে ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি গ্রামে-গ্রামান্তরে গিযে নিজেব জমিদারী দেখে আসতেন। বিধবা হয়েছিলেন মাত্র সাতাশ বছর বয়সে। কার্বাঙ্কল হয়ে হঠাৎ জ্বালাপ্রসাদের মৃত্যু হয়। সবাই ভেবেছিল স্বদেশ থেকে এতদূরে অল্পবয়স্কা নিঃসন্তান বিধবা—বিরাট জমিদারীটা এবার লাটে উঠতে দেরী হবে না। সাহেব-মহলেও আলোড়ন জাগেনি তা নয়। বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী, রূপসী বিধবা, ভরা যৌবন—কিন্তু হতাশ হতে হলো সবাইকে। শোনা যায়, একজন ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মচারী নাকি পাণিপ্রার্থনা

করেছিলেন সুদক্ষিণার। দোষ ছিল না তাতে। সুদক্ষিণা কর্ণপাত করেননি। তবে এ সবই শোনা কথা। নিশ্চিত কি ঘটেছিল তা জানাবার মতো কেউ আর ইহজগতে নেই। অবশ্য এসব কথাকে অবিশ্বাস করারও কোন কারণ নেই। সুদক্ষিণা ছিলেন সত্যিকারের দোর্দণ্ডপ্রতাপান্বিত জমিদারের দোর্দণ্ডপ্রতাপান্বিতা পত্নী। তাঁর প্রতাপে ইংরেজ অফিসাররাও তটস্থ হয়ে থাকতেন।

সুদক্ষিণা ইংরেজ কর্মচারীদের ওপর এত প্রতাপ দেখাতেন কি করে? কেন ভয় পেতেন না কাউকে? শোনা গেছে, জ্বালাপ্রসাদের পিতা সিপাহী-বিদ্রোহের সময় কয়েকজন ইংরেজকে আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেন তাই এর পুরস্কাররূপে তিনি লাভ করেন একটা বিশেষ অধিকার। তাঁর জমিদারীকে কোন কারণে নীলামে চড়ানো চলবে না। ব্রিটিশ-আইন তাদের প্রতিজ্ঞা রেখেছিল। ফলে সুদক্ষিণা এবং জ্বালাপ্রসাদের শক্তি অনেক বেড়ে যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর জমিদারীর ভার হাতে এলেও সুদক্ষিণা ইংরেজ কর্মচারীদের মনে মনে বেশ অপছন্দ করতেন যদিও প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে যোগ রাখতেন ঠিকই কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি বা বেচাল দেখলে তৎক্ষণাৎ ওপরে নালিশ জানাতেন। তাই ইংরেজ রাজকর্মচারীরা পারতপক্ষে তাঁকে চটাতেন না।

শোনা গেছে, সুদক্ষিণা তাঁর জমিদারীতে ছিলেন 'মুকুটহীন রাণী'। ব্রিটিশ শাসকেরা তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন 'কাইজার-ই-হিন্দ' খেতাব। দিতে চেয়েছেন 'মহারাণী' খেতাব। একবার নয় তিন তিনবার। প্রতিবারই প্রত্যাখ্যান করেন সুদক্ষিণা। কি হবে ওদের দেওয়া খেতাব নিয়ে? কি সম্মান বাড়বে? 'মাঝে থেকে আমার জমিদারীতে ওদের উৎপাত বাড়বে'। তার চেয়ে এসব দরকার নেই। তিনি থাকতেন তাঁর নিজের সন্তানতুল্য প্রজাদের নিয়ে। অন্ত গ্রামে বা অন্য জমিদারীতে ডাকাতি হয়, অনাচার হয়। সুদক্ষিণার জমিদারী এসবের উর্ধ্বে। প্রজারা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলতো, 'রামরাজত্বে বাস করি'। তিনি বেছে বেছে কয়েকটা ডাকাতকে নিয়ে তৈরি করেছিলেন ভয়ানক রক্ষীবাহিনী। নিজে ঘোড়ায় চেপে বন্দুক হাতে যেতেন গ্রাম দেখতে। লোকে বলতো অভ্রান্ত নিশানা। রাইফেল্‌ স্যুটিংয়ের প্রতিযোগিতায় তিনি ইংরেজ পুরুষ প্রতিযোগীদেরও

হারিয়ে দিতেন। এমন জগদ্ধাত্রীর মতো তেজস্বিনী মেয়ে যেন বাংলাদেশেও খুব বেশি নেই। অবশ্য বাঙালী মেয়েরা জমিদারী চালনায় চিরকালই দক্ষ। রাণী ভবানী বা রাণী রাসমণির কথা আমরা জানি। তাঁরাও বিচক্ষণতার সঙ্গে জমিদারী চালাতেন। সুদক্ষিণা জমিদারী পেয়েছিলেন খুব অল্পবয়সে তায় বিদেশে, তবু কোন অসুবিধে হয়নি।

জমিদারী দেখা ছাড়াও সুদক্ষিণা মন দিয়েছিলেন জনকল্যাণে ও লোক-সেবায়। তার জন্যে বলাবাহুল্য, পারিবারিক ট্র্যাডিশন অনুযায়ী তিনি একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন উত্তর প্রদেশের অশিক্ষিত ও অনুন্নত মানুষের জন্যে। ঐ সব অঞ্চলে তখন মেয়েরা একেবারে অন্ধকারে বাস করতো। সুদক্ষিণা তাদের মধ্যেও শিক্ষাপ্রসারের চেষ্টা শুরু করলেন। তবে অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন 'ইংরেজি হঠাও' আন্দোলন শুরু হলো তখন সুদক্ষিণা আপত্তি জানালেন। 'ইংরেজ হঠাও' তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু 'ইংরেজি হঠাও' কেমন কথা! সে তো একটা দরকারি ভাষা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে সে। প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বললেন যে, ইংরেজি না পড়ানো হলে তাঁর স্কুল তিনি তুলে দেবেন। সাহেবী চালচলনে অভ্যস্থ সুদক্ষিণাকে তাই ভুল বোঝা সম্ভব ছিল। অথচ সমসাময়িক সমস্ত ইংরেজ রাজকর্মচারী জানতেন সুদক্ষিণার মতো ইংরেজবিদ্বেষী আর জুটি নেই।

আগে বলেছি, সুদক্ষিণার পোষাকী নাম ছিল পূর্ণিমা। এই নামে তিনি একটি গানে সুর দিয়েছিলেন। সেই সুরের নাম 'দি ইন্‌ডিয়ান্‌ ভিলেজগার্ল'। রেকর্ডে এই অর্কেস্ট্রা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল কিন্তু সুদক্ষিণা এর কৃতিত্ব সবটাই দিতে চাইতেন তাঁর দাদা হিতেন্দ্রনাথকে। সম্ভবতঃ হিতেন্দ্রের নির্দেশেই তিনি এই রেকর্ডটির সুর সৃষ্টি করেন।

মহর্ষির পৌত্রীদের মধ্যে বাকি রইলেন আর তিনজন, রবীন্দ্রনাথের তিন কন্যা। কিন্তু কবির মেয়েদের আগে আরও দুজনের কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। এঁরা দুজন আর কেউ নয়, স্বর্ণকুমারীর দুই গুণবতী মেয়ে হিরণ্ময়ী ও

রলা। সময়ের দিক থেকে তাঁরা প্রতিভা, ইন্দিরা, সরোজা, প্রজ্ঞাদের সমসাময়িক। আসলে হিরণ্ময়ী ও সরলা ঘোষাল বংশের মেয়ে কিন্তু তাঁদের ঠাকুরবাড়ির মেয়ে হতে তেমন বাধা ছিল না। বরং তাঁরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে হিসেবেই সর্বজনপরিচিত। সেটাই স্বাভাবিক। হিরণ্ময়ী ও সরলার শৈশব কেটেছে এই বিশাল মায়াপুরীর সোনালি দিনগুলোতে। স্বর্ণকুমারী থাকতেন তিন তলার এক অংশে। মেয়েরা থাকতেন বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে। পরে স্বর্ণকুমারী ও জানকীনাথ যখন অন্য বাড়িতে গিয়েছেন তখনও তাঁরা প্রতিদিন আসতেন ঠাকুরবাড়িতে কিংবা ঠাকুরবাড়ি থেকে কেউ না কেউ যেতেন তাঁদের বাড়ি। সুতরাং হিরণ্ময়ী ও সরলা ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের সদস্যা রূপেই পরিচিত।

হিরণ্ময়ী ছিলেন সব কাজেই মায়ের যথার্থ সঙ্গিনী। 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনায়, 'সখিসমিতি' পবিচালনায় স্বর্ণকুমারী হিরণ্ময়ীর সাহায্য পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি। কিন্তু হিরণ্ময়ীব হাতে যখন 'ভারতী' সম্পাদনার ভার এলো তখন তিনি প্রবাসিনী সরলাকেও সম্পাদনার কাজে টেনে নিলেন। তাই দেখা যাবে হিরণ্ময়ীর সব কাজেই জড়িয়ে আছেন সবলা। এমনকি কর্মজীবনের শুরুতেও তাঁরা দুই বোনে মিলে মেয়েদের জন্যে একটা পাঠশালা খুলেছিলেন কাশিয়াবাগানে, তাঁদের নিজের বাড়িতে। এখনকার বয়স্ক শিক্ষার আদিরূপ বলা যায় সেটাকে। তাঁদের বাড়ির পুকুরে জল নিতে আসতো পাড়ার বৌ-ঝিরা। তাদের মধ্যে থেকে গোটা কুড়ি কুমারী ও বালবিধবা নিয়ে এই স্কুল শুরু হয়েছিল। প্রধান শিক্ষিকা হিরণ্ময়ীর তখন বয়স চোদ্দ-পনেরো বছর। সহশিক্ষিকা সরলা দশে পড়েছেন। দুজনে মিলে ছাত্রীদের শেখাতেন বাংলা, ইংরেজি, গান আর সেলাই। বিকেল সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত রোজ এই স্কুল বসতো। জোড়াসাঁকো থেকে যাঁরা আসতেন তাঁরা ছাত্রীদের পরীক্ষা নিতেন। একবার রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে প্রাইজ বিতরণ করানো হয়।

বিয়ের পরে হিরণ্ময়ী তাঁর মায়ের 'সখিসমিতি'কে একটু অদলবদল করে 'বিধবা শিল্পাশ্রমে' পরিণত করেন। 'সখিসমিতি'র তখন জীর্ণাবস্থা। ইতিপূর্বে হিরণ্ময়ী

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বরানগরের একটি বিধবা শিল্পাশ্রমের সঙ্গে পরিচিত হন। তারপর তিনি 'সখিসমিতি'কেও নতুন আদলে গড়ে তৈরি করলেন 'বিধবা শিল্পাশ্রম'। তাঁর মৃত্যুর পরে এই আশ্রমের নাম হয় 'হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রম'। মেয়েদের হাতের কাজ, সেলাই প্রভৃতির জন্যে এখান থেকে মেডেল দেওয়া হতো। গগনেন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে সুজাতাও এখান থেকে মেডেল পেয়েছেন হাতের কাজের জন্যে।

হিরণ্ময়ীর সামাজিক কাজকর্মের আড়ালে লুকিয়েছিল একটি শিল্পীসত্তা। বেথুন স্কুল থেকে মাইনর পরীক্ষা পাশের পর হিবণ্ময়ী আর স্কুলে পড়েননি তবে সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। 'সখা', 'বালক' ও 'ভাবতী'তে তাঁর অনেক লেখা ছাপা হয়। সে সব লেখা আজো পুরনো পত্রিকার পাতাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। কেউ সযত্নে সংগ্রহ করে প্রকাশ করার চেষ্টা করেননি। 'ভারতী' সম্পাদনা করবার সময় তিনি একাই সব কিছু দেখাশোনা করতেন। প্রবাসিনী সরলা ছিলেন নামে মাত্র যুগ্ম-সম্পাদিকা। কাজ হিরণ্ময়ীকেই করতে হতো। তাঁর নিজের লেখা 'ভাবতী'তে আছে বোধহয় চব্বিশটি। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি রাশিয়া নিয়ে লেখা। প্রবন্ধগুলি মৌলিক নয়, অনুবাদ—তাহলেও ভাষার ওপর তাঁর দক্ষতা ও বিষয় নির্বাচনের ক্ষমতা প্রশংসার যোগ্য। 'রুশিয়া', 'রুশিয়ার কারাগার', 'রুশিয়ার বাণিজ্য', 'রুশিয়ার ভাষা ও বাণিজ্য', 'রুশিয়ার শাসনপ্রণালী' বেশ মননধর্মী রচনা।

হিরণ্ময়ীর মৌলিক রচনা কয়েকটি সনেট। সরলার ভাষায় বলা যায় যেমন কারুর কারুর গানের গলা মিষ্টি ও করুণ অথচ সে বড় গাইয়ে নয় তেমনি হিরণ্ময়ীর কবিতাগুলোও করুণ-মধুর। 'ভারতী'র প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক অনুরাগ। তাই তার ভার নিয়েও মনে জমেছিল শংকা। কি জানি কি হয়? তিনি অনেক চেষ্টা করে 'ভারতী'র ভার তুলে দিলেন তাঁর মামা রবীন্দ্রনাথের হাতে। কবি ভার নিয়েছিলেন মাত্র এক বছরের জন্যে। তারপর কি হবে? সে কথাই হিরণ্ময়ী প্রকাশ করেছেন একটি সনেটে। তাতে তিনি বলেছেন 'রবি যদি অস্ত যায় আসে অন্ধকার, তবু রব কাছে,' বাস্তবিকই পরম আদরে তিনি

রবিহারা 'ভারতী'কে তুলে নিয়েছিলেন বুকে। তাঁর জীবৎকালে 'ভারতী'র সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়নি। 'ভারতী' যখন বন্ধ হয়ে যায় হিরণ্ময়ী তখন পরলোকে।

স্বর্ণকুমারীর মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনা ও দেশভক্তির উন্মেষ দেখা দিয়েছিল তার পূর্ণ বিকাশ ঘটলো তাঁর মেয়ে সরলার মধ্যে। তাঁর মতো তেজস্বিনী নারী বিরল—যেন কোষমুক্ত কৃপাণলতা, বাংলার 'জোয়ান অব আর্ক,' 'ভারতের প্রথম চারণী'। সাহিত্য-সঙ্গীত-স্বাদেশিকতার ত্রিধারাকে তিনি বইয়েছিলেন এক খাতে, তবে আমাদের মনে হয় সঙ্গীত ও সাহিত্য দুই-ই তাঁর স্বদেশচেতনাব অনুগামী। সরলার প্রথম জীবন কেটেছিল জোড়াসাঁকোতে আর সব বোনেদের মতোই—শুধু মনে ছিল একটা চাপা বেদনা। লেখাপড়ায় মগ্ন মা তাঁকে ভালোবাসেন না। বাসেন না কি আর? তবে বহিঃপ্রকাশটা বড়ো কম। সেকেলে অভিজাত পরিবারের এই তো দস্তুর! একান্নবর্তী বিশাল পরিবার। সেখানে মা কেন মেতে থাকবেন নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে? তাদের জন্যে তো দেখাশোনা করবার জন্যে ঝি আছে। ঠাকুরবাড়িব ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে এক বা একাধিক খাস চাকর বা খাস ঝি থাকতো। ছেলেদের জন্যে চাকর, মেয়েদের ঝি আর দুগ্ধপোষ্যদের জন্যে দুধ মা—এর নড়চড় হতো না। সব দেখে মনে হয় সেকালের বড়লোকদের বাড়িতে শিশুরাই ছিলো সবচেয়ে অসহায়। অবশ্য সরলা দেখতেন তাঁর মা-মাসীরা নিজেদের সন্তানদের সম্বন্ধে যতটা উদাসীন ছিলেন মামীরা অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ির বৌয়েরা তা ছিলেন না। তাঁরা বাইরে থেকে আসতেন ভিন্ন পারিবারিক ধারা নিয়ে, সন্তানদের টেনে নিতেন বুকে। তাদের জন্যে দুধ মা বা খাস ঝি-চাকর থাকলেও মাতৃস্নেহে ভাঁটা পড়তো না। দুঃখ শুধু সরলার। ক্ষুব্ধ অভিমানে ছোট্ট বুকটা ভরে উঠতো।

হয়তো মায়ের উদাসীনতা অভিমানী মেয়ের বুকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস সৃষ্টি করেছিল, তাই সরলা মন দিয়েছিলেন লেখাপড়ার দিকে। মাত্র তেরো বছর বয়সে বেথুন থেকে এনট্রান্স পাশ করে সরলা বোধহয় প্রথম সবার চোখে পড়লেন, এমনকি মায়েরও। তাই তো! কখন বড়ো হয়ে উঠলো সরলা? রূপের প্রতি-

যোগিতায় পিছিয়ে থাকা সরলা এগিয়ে গেলেন সবার আগে। ঠাকুরবাড়িতে এর আগে কোনো মেয়ে পরীক্ষায় বসেনি। শুধু এনট্রান্স নয় সরলা এরপর পাশ করলেন বি. এ। সতেরো বছর বয়সে। বেথুন কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে। ইন্দিরা তখনও পরীক্ষা দেননি। সরলা সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পান পদ্মাবতী স্বর্ণপদক। তিনিই এ মেডেল প্রথম পান। সংখ্যার দিক থেকে তিনি ছিলেন সপ্তম মহিলা গ্র্যাজুয়েট। এরপর তিনি ভেবেছিলেন সংস্কৃতে এম. এ. পড়বেন, নানা কারণে পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। বিষয় নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য থেকেই সরলার খেয়ালখুশি ও জেদের পরিচয় পাওয়া যায়। বি. এ. পড়বার আগে তিনি স্কুলে পড়েছিলেন সায়েন্স। সে সময় মেয়েদের সায়েন্স পড়ার সুযোগ ছিল না তাই সরলা জেদ করে দাদাদের সঙ্গে ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারের সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশনের সান্ধ্য লেকচারে যাবার অনুমতি নিলেন। সেখানে সরলা একমাত্র ছাত্রী, তাই তিনি বসে থাকতেন অধ্যাপকদের ঘরে। তাঁরা ক্লাসে এলে সরলাও আসতেন। দুপাশে দুই দাদা—জ্যোৎস্নানাথ ও সুধীন্দ্রনাথ। তিনটে স্বতন্ত্র চেয়ার থাকতো সামনের লাইনে, সেখানে বসতেন দুপাশে দুই দাদাকে নিয়ে সরলা আর বাকী ছাত্ররা বসতো বেঞ্চে। আড়ালে ফিসফিস করে দুই দাদাকে দেখিয়ে ছেলেরা বলতো 'বডি গার্ড্‌স্'। কিন্তু এত কাঠ খড় পুড়িয়ে যে সায়েন্স পড়া, সেই সায়েন্সের ওপর কোনো আকর্ষণই ছিল না সরলার। থাকলে তিনি কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বা অবলা বসুর মতো চিকিৎসক হতে চাইতেন। মনে রাখতেন ঐ দুটি মহিলার অবিস্মরণীয় ডাক্তারী পড়ার কাহিনীকে। কাদম্বিনীকে দেখে মনে হয় কোন বাধাই বুঝি বাধা নয়। অবলাও কম যান না, তিনি মাদ্রাজে গিয়েও ডাক্তারী পড়তে রাজী হয়েছিলেন। এমনকি স্বর্ণকুমারীর মতো বিজ্ঞানমনস্কতা থাকলেও সরলা বিজ্ঞানচর্চায় অনেক উন্নতি করতে পারতেন। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির কোনো মেয়েই বিজ্ঞান সচেতনতার পরিচয় দিতে পারেননি। পরবর্তী যুগেও তাঁরা শুধু চর্চা করেছেন সাহিত্য ও শিল্পকলার। আর সরলার আগ্রহ ছিল অন্য দিকে তাই তিনি বিচিত্র বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন।

শুধু লেখাপড়া নয়, গানেও সরলার আগ্রহ কম নয়। ছোটবেলা থেকেই তিনি বাংলা গানে ইংরেজি কর্ড ব্যবহার করে ইংরেজি 'piece' রচনা করতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা গানের স্বরলিপি তৈরি করা ছাড়াও তিনি কয়েকটা গানকে 'য়ুরোপান্বিত' করলে কবি খুব খুশি হয়ে ওঠেন। 'সকাতরে ঐ কাঁদিছে' গানটিকেও সরলা যখন রীতিমতো একটা ইংরেজি বাজনার 'piece'-এ পরিণত করলেন তখন সেটা পুরোদস্তুর ব্যাণ্ডে বা পিয়ানোতে বাজাবার যোগ্য হলো। উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র পিয়ানো সংগত তৈরি করতে। সেও হলো। সরলার তখন বয়স মাত্র বারো। কবি তাঁকে জন্মদিনে উপহার দিলেন একটা য়ুরোপীয় গান লেখার খাতা। দিয়ে বললেন, "এইতে লিখে রাখ, ভুলে যাবি।"

সরলার সঙ্গীতচর্চা মহর্ষিরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি তাঁকে হাফেজের একটি কবিতায় সুর বসাতে দিলেন। এক সপ্তাহ পরে সরলা বেহালা বাজিয়ে গেয়ে শোনালেন হাফেজ। দেবেন্দ্রনাথ মজে মজে শুনলেন। খুব ভালো গান না হলে তিনি শুনতে চাইতেন না। বাড়ির লোকদের মধ্যে তিনি ভালো-বাসতেন রবীন্দ্রনাথের গান আর প্রতিভার পিয়ানো বাজানো শুনতে। যাইহোক, সরলার গান শুনে শুধু খুশিই হলেন না গায়িকাকে উপহার দেবার ব্যবস্থাও করলেন। এলো হাজার টাকা দামের হীরে-চুনি সেট করা জড়োয়া নেকলেস। ঘরোয়া সভায় নেকলেসটি সরলার হাতে তুলে দিয়ে মহর্ষি বললেন, "তুমি সরস্বতী! তোমার উপযুক্ত না হলেও এই সামান্য ভূষণটি এনেছি তোমার জন্যে।"

গান সংগ্রহ ও সুর সংগ্রহ ছিল সরলার নেশার মতো। বাউল গান, আর দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতে ভরা একটি গানের ডালি তিনি উপহার দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। কবি সেই গানকে ভেঙে-ভেঙে অনেক নতুন গান সৃষ্টি করেছেন। ইন্দিরাও এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গমে'। সরলার নানা সুরে রবীন্দ্রনাথ নিজের কথা বসিয়ে যে গান রচনা করেন সেগুলো হচ্ছে, 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে', 'এসো হে গৃহদেবতা', 'এ কি লাবণ্যে', 'চিরবন্ধু

চিরনির্ভর' ইত্যাদি।

এ তো গেল গানের কথা। তিনি নিজেও গান লিখতেন এবং সেইসব দেশাত্মবোধক গান প্রচুর উন্মাদনা সৃষ্টি করতো। কিন্তু সে প্রসঙ্গে আমরা পরে যাবো। আপাততঃ সরলার সাহিত্যচর্চার কথা সেরে নিই। এত কাজের ফাঁকে সরলা লিখেছেনও প্রচুর। বারো বছর বয়সেই একটা কবিতা লিখে পুরস্কার পেয়েছিলেন 'সখা' পত্রিকা থেকে। প্রথম প্রবন্ধ 'মাতাপিতার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য'। সেই শুরু, তারপর থেকে তো নিয়মিত লিখছেন 'ভারতী'তে। প্রথমবারে যুগ্ম সম্পাদিকা থাকার সময় না হলেও পরে এককভাবে 'ভারতী' সম্পাদনার সময় তিনি লিখতেন প্রচুর। এসময় তিনি মহীশূর থেকে ফিরে এসেছেন। বছর কয়েক আগে তিনি এম. এ. পড়া ছেড়ে মহীশূরের মহারানী গার্লস্ স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে যান দক্ষিণ ভারতে। ঠাকুরবাড়িতে এও নতুন ঘটনা। বাইরের অনেকেও সরলার চাকরি করতে যাওয়াটা ভালো চোখে নেয়নি। 'বঙ্গবাসী' কাগজ ফোঁস করে মন্তব্য করলো, "এ ঘরের মেয়ের একলা একলা বিদেশে চাকরি করতে যাওয়ার দরকারটা কি? খাওয়া পরার তো অভাব নেই? কেন খামোখা নিজেকে বিপদগ্রস্ত করা?" এই ছিল সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। যেন খাওয়া-পরার প্রয়োজনই সব। এঁরা মেয়েদের এগিয়ে যাওয়াকে চিরকাল সন্দেহের চোখে দেখে এসেছেন। আর ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের তো কথাই নেই। এদের কার্যকলাপ তাঁদের একেবারেই ভালো লাগেনি। মনে হয়েছে সব তাতেই বাহাদুরি দেখানোর চেষ্টা! কিন্তু ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা এগিয়েছেন প্রাণের দুর্বার আবেগে। বিপদকে তুচ্ছ করেছেন সরলা, তিনি কি ঘরে বসে থাকতে পারেন? আর তিনি তো একলা নন আরো কত মেয়েই এগিয়ে গেছেন। তিনি যখন মহীশূর গেলেন তার আগেই সেখানে গিয়েছেন কুমুদিনী খাস্তগির।

যাইহোক, দেশে ফিরে আবার 'ভারতী' নিয়ে বসলেন সরলা। কাগজে একেবারে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেন "আগামী মাসে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি সামাজিক প্রহসন লিখবেন।" কাগজ পড়ে তো রবীন্দ্রনাথের চক্ষুস্থির।

সে কি? তিনি কিছুই জানেন না আর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে গেল! বকতে আরম্ভ করলেন, "কেন তুই আমাকে না জানিয়ে বিজ্ঞাপন দিলি? আমি লিখব না।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত লিখতেই হলো। সরলা নতুন সম্পাদিকা, তাকে বিপদে ফেলতে মন চাইলো না। লেখা হয়ে গেল 'চিরকুমারসভা'। তবে সরলার এই রকম কাজের জন্যে কিংবা লেখার তাগিদে কবি পরবর্তীকালে বেশ বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যাবে সরলার খুব একটা দোষ ছিল না। সম্পাদিকা হিসেবে সরলা খুবই বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেন। লেখকদের পারিশ্রমিক দেবার প্রবর্তন করেন তিনিই। 'ভারতী'কে নানাভাবে তিনি সার্থক করে তুলেছিলেন। 'বালক', 'সাধনা' বা 'পুণ্যে'র মতো'ভারতী' শুধু ঠাকুরবাড়ির কাগজ হয়ে যে থাকেনি সে কেবল সরলার গুণে। তিনি গুণী লেখকদের খুঁজে বার করতেন এবং সুযোগ দিতেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। শরৎচন্দ্র বোধহয় সবে তখন গল্প লেখা শুরু করেছেন। কুণ্ঠা যায়নি। রয়েছেন বর্মায়। সেইসময় তাঁর মামা 'বড়দিদি' গল্পটির পাণ্ডুলিপি দিয়ে এলেন 'প্রবাসী'তে। কিছুদিন পড়ে থাকার পর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেটি ফেরৎ দিলেন অমনোনীত রচনা বলে। সুরেন গঙ্গোপাধ্যায় আর কি করেন। তিনি সেটি নিয়ে এলেন 'ভারতী'র অফিসে। সে সময় সরলা পঞ্জাব থেকে এসেছেন কিছুদিনের জন্যে। 'ভারতী'র সুব্যবস্থা করতে। তাঁকে গল্পটি দেখানো হলো। তিনি পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললেন, 'চমৎকার! এক কাজ করো, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় তিন মাসে ছাপাও। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় নাম দিও না, সকলে মনে করবে রবীন্দ্রনাথের লেখা। আমাদের দেরির ত্রুটি ঘুচবে এবং গ্রাহক-গ্রাহিকা বাড়বে। আষাঢ় সংখ্যায় 'বড়দিদি' শেষ হবে, আর সেই সংখ্যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখকের নাম ছাপবে।' তাই হলো এবং দেখা গেল সরলার সব অনুমানই সত্যি। অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন 'বড়দিদি'র কথা। বিস্মিত রবীন্দ্রনাথ জানালেন লেখক তিনি নন, তবে নিঃসন্দেহে কোন শক্তিশালী লেখকের লেখা। তিনিও কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্র ও আরো অনেকে। নাম না থাকায়

'বড়দিদি' ক্রমশই কৌতূহল বৃদ্ধি করে এবং এরপর শরৎচন্দ্রের প্রতিষ্ঠাও সহজ হয়ে গেল।

শোনা যায় এই 'ভারতী' সম্পাদনাসূত্রেই সরলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের। বিপত্নীক, উন্নতরুচি, সাহিত্যপ্রেমিক প্রভাতকুমারের সঙ্গে বোধহয় সরলার বিবাহের কথাবার্তাও হয়েছিল এবং নিজেকে আরো যোগ্য করে তোলার জন্যে প্রভাতকুমার ব্যারিস্টার হবার জন্য বিলেত যাত্রা করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিয়ে হয়নি। প্রভাতকুমারের গোঁড়া হিন্দু জননীর প্রবল বিরোধিতায় বিয়ের প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। আরো কয়েকজনের নামও শোনা গেছে সরলার 'ভাবী বর' হিসেবে। তবে মনে হয়, এ সবই অলীক কল্পনা। আমাদের দেশে বয়স্থা অনূঢ়া মেয়েকে নিয়ে জল্পনা করা চিরকেলে স্বভাব। সরলা বহুদিন অবিবাহিতা ছিলেন, প্রায় তেত্রিশ বছর। বিয়ের বয়স হিসেবে বয়সটা আজকের যুগেও বেশি। তাই কথা তো উঠবেই। আসলে এ ব্যাপারে প্রথম দিকে সরলারও আগ্রহ ছিল না। স্বদেশপ্রেমিকা তেজস্বিনী মেয়েকে দেশের কাজে কুমারী রাখাব আগ্রহ ছিল স্বর্ণকুমারীরও। এমনকি মহর্ষিও প্রস্তাব করেছিলেন সরলার বিয়ে হবে খাপখোলা তলোয়ারের সঙ্গে। ফলে বয়স বাড়ে। শেষে যার সঙ্গে সরলার বিয়ে হলো তিনি সত্যিই সরলার যোগ্য স্বামী, পঞ্জাবের বিপ্লবী নেতা খাপখোলা তলোয়ারের মতো তেজস্বী রামভজ দত্ত চৌধুরী।

ভারতীতে সরলা নিজেও নানারকম রচনা লিখতেন। গান-কবিতা-গল্প-উপন্যাস-রম্যরচনা-সমালোচনা-অনুবাদ—আর বাকী রইল কী! স্মৃতিকথা? তাঁর শেষ জীবনে লেখা 'জীবনের ঝরাপাতা' একটি অসাধারণ রচনা। সমসাময়িক-যুগের দর্পণ বললেও অত্যুক্তি হবে না। এছাড়া তাঁর সংস্কৃত কাব্য আলোচনা করে লেখা কয়েকটা প্রবন্ধ 'রতিবিলাপ', 'মালতীমাধব', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'মৃচ্ছকটিক' অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশ মজুমদারকে এই প্রবন্ধগুলো সম্বন্ধে বলেছিলেন, "লেখিকার বয়স বিবেচনা করিলে বলিতে হয় ও বয়সে আমাদেরও অমন লেখা সহজ হইত না। তাঁহার

সমালোচনা পড়িয়া নাটকগুলি আবার নতুন করিয়া পড়িতেছি।" সরলার সব লেখার সংকলন আজো প্রকাশিত হয়নি।

মৌলিক রচনা হিসেবে সরলার প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা 'প্রেমিক সভা'—লেখকের নামহীন লেখাটি বেশ প্রশংসা পায়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অভিনন্দন জানিয়ে ভাগ্নীকে লিখলেন, "নাম দিসনি বলে তোব এ লেখাব ঠিক যাচাই হলো। নতুন হাতের লেখার মতো নয়, এ যেন পাকা প্রতিষ্ঠ লোকেব লেখা। এ যদি আমারই লেখা লোকে ভাবতো, আমি লজ্জিত হতুম না।" এর চেয়ে বড়ো কমপ্লিমেণ্ট আর কি হতে পারে? এরপর সরলা কয়েকটা গল্প লেখেন। 'নববর্ষের স্বপ্ন' গল্পটা তিনি লিখলেন দুভাবে—একবার করুণ আরেকবার মজার। এ জাতীয় গল্প লেখার সূচনা এদেশে সরলাই করেছেন। একই কাহিনী নিয়ে দুভাবে গল্প লেখার পদ্ধতি বেশ নতুন।

কিন্তু আগেই বলেছি সরলার জীবনে সাহিত্য বা সঙ্গীত প্রধান নয়। তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড়ো ছিল তাঁর স্বদেশপ্রেম। সাহিত্য বা সঙ্গীত তাঁকে স্বদেশহিতৈষণার পথে সাহায্য করেছিল কিংবা বলা যায় সরলা তাঁর রাজনৈতিক কাজে এ দুটিকে ঠিকমতো ব্যবহার কবতে পেরেছিলেন। ঠাকুরবাড়ির কোন ছেলেও তখন সরলার মতো চরমপন্থী রাজনীতি নিয়ে মেতে ওঠেননি। সৌম্যেন্দ্রনাথ এসেছেন অনেক পরে। সরলার মধ্যে স্বদেশচেতনাব আগ্রহ জাগিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বাবা-মা। জানকীনাথ ছিলেন ভারতীয় কংগ্রেসের মেরুদণ্ড। স্বর্ণকুমারী প্রথমে হিন্দুমেলায় যোগ দিয়ে মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম স্বদেশিয়ানার সূচনা করেন। তাঁর 'সখিসমিতি', 'শিল্পমেলার' মধ্যেও স্বদেশপ্রেমের বীজ লুকিয়েছিল। সরলা সরাসরি এলেন রাজনীতিতে। ১৮৯৫ সাল থেকেই তিনি 'ভারতী'র মারফত বাঙালী যুবমানসকে বীর্যমন্ত্রে দীক্ষা দেবার চেষ্টা করেন। 'মৃত্যুচর্চা', 'ব্যায়াম চর্চা', 'বিলাতি ঘুষি বনাম দেশী কিল', বাঙালীর মুমূর্ষু আত্ম-সম্মানকে জাগিয়ে দিল। সুস্থ সবল জীবন যাপন ও অপমানের প্রতিরোধে মৃত্যুও ভালো এই বোধে সবাই উদ্বুদ্ধ হতে শুরু করলো। সারা দেশে বইলো উদ্দীপনার জোয়ার। দলে দলে স্কুল কলেজের ছেলেরা এলো সরলার কাছে।

সরলা তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে বেছে বেছে একটা দল করলেন। ভারবর্ষের একখানি মানচিত্র তাদের সামনে রেখে প্রতিজ্ঞা করাতেন তনু মন দিয়ে ভারতের সেবা করার। শেষে হাতে একটি রাখি বেঁধে দিতেন তাদের আত্মনিবেদনের সাক্ষী হিসেবে। অবশ্য সরলার এই সমিতি ঠিক গুপ্ত সমিতি ছিল না তবে মুখে মুখে রটানো বারণ ছিল।

বছর কয়েক পরে এই লাল সুতোর রাখিবন্ধন দেশময় ছড়ালো রবীন্দ্রনাথের জন্যে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের দিনে তিনি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবার হাতে পরিয়ে দিলেন মিলনরাখি। সরলার রাখিবন্ধনের কথা মনে হলেই মনে পড়ে যায় চার অধ্যায়ের এলাকে। তার হাতের রক্ততিলক ছেলেদের মনে দারুণ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতো। এই জাতীয় দলনেতৃত্ব ঠাকুরবাড়িতেই প্রথম নয় বাংলাদেশেও প্রথম। বিদেশেও কি সুলভ ছিল? ইংলণ্ডে তখন মেয়েরা ভোটাধিকারের জন্যে লড়াই করছেন। কল্পনা করা যায় না, ঠিক সেই সময়ে ছেলেদের বীর্যমন্ত্রে দীক্ষিত করছেন একটি বাঙালী মেয়ে।

'ভারতী' সম্পাদনাসূত্রে সরলা এ সময় পরিচিত হয়েছিলেন আরো দুটি অলোকসামান্য প্রতিভার সঙ্গে—স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। স্বামীজী চেয়েছিলেন সরলা বিদেশে যাবেন ভারতীয় নারীর প্রতিনিধি হয়ে। প্রতীচ্যের মেয়েদের শোনাবেন প্রচ্যের আধ্যাত্মিক বাণী। চিঠিতে লিখেছিলেন :

"যদি আপনার ন্যায় কেউ যান তো ইংলণ্ড তোলপাড় হইয়া যাইতে পারে, আমেরিকার কা কথা!"

স্বামীজীর আশা অবশ্য সফল করতে পারেননি সরলা, কারণ তিনি তখন বিদেশ যেতে পারেননি। তবে স্বামীজীর স্বপ্ন আংশিকভাবে সফল করেছিলেন সুষমা। তাঁর আমেরিকাযাত্রার কথা আগেই বলেছি। সরলা ঝড় তুলেছিলেন বাংলায়, পঞ্জাবে, সারা ভারতবর্ষে।

এর মধ্যে হঠাৎ একটা সভানেতৃত্বের আহ্বান এলো। সরলা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। মহীশূর ঘুরে এসেছেন বটে, তা বলে কলকাতা শহরে প্রকাশ্যে ছেলেদের সভায় যোগ দেওয়া! এ যে কল্পনার অতীত! মাঝে মাঝে স্বামীজীর

আশ্রমেও গিয়েছেন কিন্তু তখন সঙ্গে থাকেন মামাতো দাদা সুরেন কিংবা অগ্নি-শিখার মতো অলোকসামান্যা নিবেদিতা। তবু রাজী হতে হলো। তাঁর নির্দেশে সভা হলো পয়লা বৈশাখ। ঐ দিন যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। উৎসবের নাম হলো প্রতাপাদিত্য উৎসব। তাঁর জীবনী আলোচনা করে ছেলেরা দেখালো লাঠি খেলা, কুস্তি, বকসিং!

দিন বদলেছে বলে সরলাকে বিরূপ সমালোচনা শুনতে তো হলোই না উল্টে কাগজে কাগজে সমালোচনার বদলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শোনা গেল। "মরি মরি কি দেখিলাম! এ কি সভা! বক্তিমে নয়, টেবিল চাপড়াচাপড়ি নয়—শুধু বঙ্গবীরের স্মৃতি আবাহন, বঙ্গযুবকদের কঠিন হস্তে অস্ত্রধারণ ও তাদের নেত্রী এক বঙ্গললনা…দেবী দশভূজা কি আজ সশরীরে অবতীর্ণা হইলেন?"

কিংবা, "কলিকাতার বুকের উপর যুবক সভায় একটি মহিলা সভানেত্রীত্ব করিতেছেন দেখিয়া ধন্য হইলাম।"

আসলে সরলা বাঙালী মানসিকতার গতিপ্রকৃতিকে ঠিকমতো ধরতে পেরে-ছিলেন। যুক্তির চেয়ে আবেগ উত্তেজনায় তারা মেতে ওঠে বেশি। তাদের জাগাতে হলে তাদের প্রবণতার পথ ধরেই এগোতে হবে। তাই তিনি বীরাষ্টমী, রাখিবন্ধন, প্রতাপাদিত্য উৎসব, উদয়াদিত্য উৎসবের সূচনা করে নিজের বাড়িতে শরীর চর্চার আখড়া খোলেন। তবে এই প্রতাপাদিত্য উৎসব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সরলার বিরোধ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যকে জাতীয় বীর বলে গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না কারণ তাঁর চারিত্রিক আদর্শ মহান নয়। 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' তিনি প্রতাপাদিত্যকে সেভাবেই এঁকেছেন। অথচ সরলা সেই ব্যক্তিকে নিয়ে, যাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সত্যিই আছে কিনা বিচার না করে, মেতে ওঠায় তিনি বিরক্ত হন। সরলার উত্তর, তিনি প্রতাপাদিত্যকে নীতির নিক্তিতে বিচার করেননি, করেছেন রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক দিয়ে। 'একলা এক জমিদার হয়ে তিনি যে মোগল বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, নিজের নামে সিক্কা চালিয়েছিলেন সে কথা তো সত্যি'।

সব মিলে সরলা এক বিশাল কর্মযজ্ঞ বাঁধিয়ে দিলেন। এর ওপর ছিল তাঁর গান! সে যেন রুদ্রবীণার ঝঙ্কার! ১৯০১ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে গাওয়া হয় তাঁর নিজের গান 'নমো হিন্দুস্থান'। প্রবল উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়লো। বিবেকানন্দের আলমোড়া আশ্রমের অধিনেত্রী মিসেস সেভিয়ার গান শুনে সরলাকে বলেছিলেন, "আর কিছু না শুধু যদি জাতীয় গান গেয়ে ফেরো, তুমি ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে, সমস্ত দেশকে জাগাতে পারবে।" কিন্তু সরলা নিজে সন্ত্রাসবাদীদেব সঙ্গে মিশে যেতে পারেননি। পেরেছিলেন নিবেদিতা। সবলা চেয়েছিলেন যুবমানস গড়ে তুলতে, তাদের ধমনীতে শক্তি সঞ্চার করতে। খুন বা স্বদেশী ডাকাতিতে তাঁর সমর্থন ছিল না। শারীর শিক্ষা, আখড়া স্থাপন, লাঠি খেলা, কুস্তি, তলোয়ার শিক্ষা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপন প্রভৃতি কাজেই তাঁর উৎসাহ। পঞ্জাবেও তাঁর সংগঠন শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশের মেয়েরা এ সময় অভূতপূর্ব স্বাদেশিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে যে তাঁরা খুব বেশি এগিযে ছিলেন তা নয়, কিন্তু দেশের কাজে সাড়া দিয়েছিলেন সবাই। বেশির ভাগ এসেছিলেন সাধারণ সমাজ থেকে। তুলনায় উচ্চবিত্ত সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সংখ্যা কম। সরলা অবশ্য ব্যতিক্রম। তাঁর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভরে উঠলো স্বদেশী জিনিযে। এ সময তাঁর 'ভারতী' আর সরযূবালা দত্তেব 'ভারত-মহিলা' পত্রিকা ভার নিয়েছিল জাতীয়তাবোধে মেযেদের উদ্বুদ্ধ করবার। তাঁরা সফল হয়েছিলেন নিশ্চয়, না হলে স্বদেশী আন্দোলনে মেয়েরা এমন গৌরবময় ভূমিকা নেবেন কেন? নাটোরের মহারাণী গিরিবালা দেবী, অবলা বসু, সরোজিনী বসু বা 'বঙ্গলক্ষ্মী', ননীবালা দেবী, দেশবন্ধুর বোন উর্মিলা দেবী, শ্রীঅরবিন্দের বোন লতিকা ঘোষ—সকলেই এগিয়ে এসেছিলেন রক্তাক্ত শপথ নিতে। সরোজিনী বসু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতদিন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না হয় ততদিন তিনি সোনার বালা পরবেন না। তবে এসব ঘটনা পরের কথা। সরলা তখন আর বাংলার প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নেই। চলে গেছেন পঞ্জাবে। এ সময় সর্বভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালী-মেয়েরা বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেননি। হায়দ্রাবাদে সরোজিনী নাইডু, মাদ্রাজের

ম্যাজিস্ট্রেট যতীন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী বিভাবতী কিংবা এলাহাবাদে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দুই মেয়ে সীতা ও শান্তা স্বদেশী আন্দোলনে প্রবাসে কিছু কিছু আলোড়ন জাগিয়েছিলেন। সরলা ঝড় তুলেছিলেন পঞ্জাবে। লাহোরে প্রায় পাঁচশো জন বাঙালী যুবক সংগ্রহ করে তিনি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন।

রামভজের সঙ্গে বিয়ের পরে সরলার কর্মজীবন শুরু হয় পঞ্জাবে। রাজনৈতিক জীবনে রামভজ ছিলেন সরলার মতোই তেজস্বী ও চরমপন্থী। বাংলার বাঘিনী যেন খুঁজে পেল যথার্থ দোসর। তবে পঞ্জাবে সরলা শুরু করলেন সমাজ সেবা। 'সখিসমিতি' আর 'বিধবা শিল্পাশ্রমে'র মধ্যে যে অভাব ছিল সেটা পুরণ করবার জন্যে তিনি স্থাপন করলেন 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল'। নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পর্দানশীন মেযেদের শিক্ষা দেওয়াই ছিল এব মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই, প্রথমে এলাহাবাদে, পরে বিভিন্ন প্রদেশে এর শাখা খোলা হয। কলকাতা শাখার ভার ছিল কৃষ্ণভামিনী দাসের ওপর। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি ও তাঁর সহকারিণীরা কলকাতায় প্রায় তিন হাজার অন্তঃপুরবাসিনীকে লেখাপডা শিখিয়েছিলেন। বিধবা হবার পর সরলা আবার ফিরে এসে মহামণ্ডলেরই আরেকটা শাখা স্থাপন করেন 'ভারত স্ত্রীশিক্ষা সদন'। এঁদেব চেষ্টায কলকাতায় পর্দাপ্রথা খুব দ্রুত উঠে যায়। মেয়েদেব স্কুলের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীরাও দলে দলে আসে স্কুলে ভর্তি হতে। শিক্ষার সুবিধের জন্যে মহামণ্ডল থেকে এ সময় বেবিক্রেস আর মেয়েদের হস্টেল খোলাব ব্যবস্থাও হয়েছিল।

পঞ্জাবে সরলার কার্যকলাপ খুব স্পষ্ট নয়। সেখানে রামভজেব উপযুক্ত সহধর্মিনী হয়ে তিনি 'হিন্দুস্থান' পত্রিকাটির ভার নেন। শোনা যায়, লাহোবের চিফ কোর্ট আদেশ দিয়েছিল যে পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হিসেবে রামভজের নাম থাকলে তাঁর ওকালতির লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে। সরলা প্রস্তাব করলেন পত্রিকায় তাঁর নাম দেওয়া হোক। তাই হলো। 'হিন্দুস্থানের' একটা ইংরেজি সংস্করণ বার করে সরলা তাতে জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রকাশ করতে থাকেন। রৌলট এ্যাক্ট চালু হলে 'হিন্দুস্থান' বন্ধ করে প্রেস

বাজেয়াপ্ত করা হলো, রামভজ নির্বাসিত হলেন। একাকিনী সরলা শক্ত হাতে হাল ধরে পঞ্জাবের বিদ্রোহকে নিয়ে গেলেন পরিণতির পথে। পঞ্জাবের ব্রিটিশ অত্যাচার চরমে উঠলো জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে। এসময় সরলাকেও গ্রেপ্তারের কথা হয়েছিল, কিন্তু তখনও পর্যন্ত ব্রিটিশ আইনে রাজনৈতিক কারণে মেয়েদের আটক করার নিয়ম চালু হয়নি।

এরপর থেকে সরলা মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের অতিমাত্রায় সমর্থক হয়ে পড়লেন। তাই চরকা-খদ্দর প্রবর্তনেও সরলা গান্ধীজীর ডান হাত। স্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁকে বাংলাদেশে দেখা যায় সমাজসেবিকারূপে। কিন্তু বাঙালীর কাছে তাঁর প্রথম জীবনের তেজস্বিনী মূর্তিটিই বেশি আদর পেয়েছে।

মহর্ষি ভবনে যখন গুণবতী মেয়েদের ভিড় তখন পাশের বৈঠকখানাবাড়িতেও দুটি পিঠোপিঠি বোন বড়ো হয়ে উঠেছেন। তাঁরা গুণেন্দ্রনাথের মেয়ে বিনয়িনী ও সুনয়নী। এখন আর সৌদামিনীর দুঃখ নেই। তাঁর তিন ছেলে বড়ো হয়েছেন। অবন-গগনের ছবি ফিরিয়ে এনেছে দেশের সম্মান। অবশ্য সে পরের কথা। তার অনেক আগেই বেজেছিল বিনয়িনীর বিয়ের সানাই, বড়ো করুণ সুরে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল খুব ধুমধাম করে বিয়ে হবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। গুণেন্দ্রনাথের ছত্রিশ বছরের জীবন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। 'কেউ জানলে না কিসের দুর্দমনীয় বেগ তাঁকে এমন নির্মমভাবে আত্মহত্যার পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।' এ উক্তি গুণেন্দ্র-দৌহিত্রী প্রতিমার। মায়ের অভিমান ও বেদনার স্পর্শ পেয়েছিলেন তিনি, নয়তো মাতামহকে দেখবার কোন সুযোগই তাঁর হয়নি। গুণেন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুর পর খুব সাধারণ ভাবে বিয়ে হলো বিনয়িনীর। হ্যাঁ, পূর্বনির্ধারিত পাত্র শেষেন্দ্রভূষণের সঙ্গেই। তারপর?

তারপর আবার কি? মসৃণভাবে দিন কেটে গেছে ঘর-সংসার, জপ-তপ আর রান্না-বান্না নিয়ে। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা সবাই বিকেলে গা ধুয়ে পছন্দমতো খোঁপা বাঁধতেন। তারপর শিউলি বা নটকানরাঙা শাড়ি পরতেন সুন্দর করে।

রূপটান সেরে মোমরাট, কাজল প্রভৃতি দিয়ে প্রসাধন সেরে আসতেন কর্তৃ-ঠাকরুণকে সাজ দেখাতে। তিনি প্রত্যেকের খোঁপায় জড়িয়ে দিতেন ফুলের মালা। হয়তো এ নিয়ম অন্যান্য সাবেকী বাড়িতেও ছিল। বিনয়িনী খোঁপা বাঁধতে পারতেন সুন্দর করে। বোনঝি-ভাইঝিদের চুলে ফুটে উঠতো নানান্ রকম ছাঁদ—বেনেবাগান, মনভোলানো, ফাঁশজাল, কলকা, বিবিয়ানা আরো কত কী! হয়তো বিনয়িনী চিরকাল এভাবে সবার চোখের আড়ালে থেকে যেতেন যদি না তাঁর নিজের লেখা আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিটি অকস্মাৎ পাওয়া যেত। এটি এখনো অপ্রকাশিত আকারে তাঁর পৌত্র শ্রীসুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের কাছে রয়েছে। তিনি তাঁর ঠাকুরমার হাতে লেখা জীর্ণ খাতাটি পান পিসীমা প্রতিমা ঠাকুরের কাছ থেকে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 'ঠাকুরমা' বললুম বটে তবে ঠাকুরবাড়িতে পিতামহীকে বলা হতো 'দাদু' আর পিতামহ হতেন দাদামশায় বা কর্তাবাবা। 'দাদু'র বদলে সম্ভ্রমে ঠাকুরমাকে অনেক সময় বলা হতো কর্তামা।

বিনয়িনী তাঁর জীবনী, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'কাহিনী', লেখা শুরু করেন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে। খাতার ওপরে ১৯১৬-১৭ লেখা থাকলেও তিনি 'কাহিনী' শুরু করেন আরো পরে। ১২৮০ থেকে ১৩৩০-এর জীবনবৃত্তে তিনি 'কাহিনী' লেখেন ১৩২৫ সালে, মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে। এ বয়সে তাঁর নিজের কথা বলতে ইচ্ছে করলো কেন তা তিনি নিজেই জানেন না। ঠাকুরবাড়িতে আত্মকাহিনী লেখার রেওয়াজ বহুদিনকার। মহর্ষিভবনে পুরুষরা তো বটেই মেয়েরাও আত্মকথা লিখতে এগিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য আত্মজীবনী রচনায় মেয়েদের পথ দেখিয়েছিলেন রাসসুন্দরী দেবী, তিনি ঠাকুরবাড়ির কেউ নন। প্রমথ চৌধুরীর মনে হয়েছিল, "বাংলা ভাষায় আত্মজীবনী লেখেন শুধু মেয়েরা"। বলাবাহুল্য এই মন্তব্যের কারণও রাসসুন্দরী। কেশব সেনের মা সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মচরিত আর একখানি উল্লেখযোগ্য বই। বিনয়িনী 'কাহিনী' লেখার আগে সৌদামিনীর পিতৃস্মৃতি, স্বর্ণকুমারীর 'সেকেলে কথা' বেরিয়ে গেছে। এদের যে কোন একটা বিনয়িনীর মনে আগ্রহ জাগাতে পারে। তবে লেখবার সময় তিনি কাউকে অনুকরণ না করে নিজের মনে নিজের কথা বলে গিয়েছেন।

নিয়মিত লেখাপড়ার চর্চা না থাকলেও বিনয়িনীর সাদামাটা আটপৌরে ধরণের লেখার হাতটি ভালো—কৃত্রিমতার স্পর্শ নেই। যেন আপন মনে আয়নায় নিজের মুখ দেখা। সহজ, স্বচ্ছ, স্বচ্ছন্দ। প্রথমদিকে খানিক বাপের বাড়ির কথা লিখে বিনয়িনী লিখেছেন শ্বশুরবাড়ির কথা। অনেক তথ্য আছে তবে সব ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে তাঁর ধর্মপরায়ণা ভক্তিনত রূপটি। ধর্মচেতনার উন্মেষ হয়েছিল শৈশবেই। মায়ের কথামতো ভোরবেলায় উঠে বাগান থেকে ফুল কুড়িয়ে আনতে হতো দুবোনকে। কার্তিক মাসে হতো শ্রীধর ঠাকুরের পুজো। ভোর ছটার মধ্যে ফুল নিয়ে তাঁরা হাজির হতেন ঠাকুরঘরে। বড়ো পিসী কাদম্বিনী নানা ভাবে ঠাকুরকে সাজাতেন। কোনদিন হলদে কলকে, কোনদিন রক্তকরবী, কোনদিন সাদা রজনীগন্ধা দিয়ে সাজিয়ে ভাইঝিদেব ডেকে দেখাতেন। পাঁচ নম্বর বাড়ির এই ছবিটি আমরা পেয়েছি বিনয়িনীর ডায়রি 'কাহিনী' থেকেই। দুটো বাড়ির মেয়েদের জীবনে এই যে আকাশ-পাতাল বিভেদ সেটা বেশি করে ধরা পড়ে ইন্দিরা-প্রতিভা-প্রজ্ঞা-সুষমার জীবন-যাত্রার সঙ্গে বিনয়িনী সুনয়নীর জীবনযাত্রার তুলনা করলে। নতুন উদ্যমের পাশে পুরনো নিস্তরঙ্গ জীবনের এমন অবস্থান আর দেখা যাবে না।

বিনয়িনীর লেখা সর্বত্রই আশ্চর্য রকমের সাবলীল। স্বামীর মৃত্যুর কথাও তিনি ব্যক্ত করেছেন শান্তভাবে। পড়তে পড়তেই বোঝা যায় বিনয়িনী লিখেছেন একেবারে নিজের জন্যে। আর কারুর জন্যে নয়। একটু তাঁকে অনুসরণ করা যাক:

"আগের দিন থেকে তাঁর অসুখ বেড়েছে। আমাকে কোথাও উঠে যেতে বারণ করলেন।...পরদিন বিকেল ছটার সময় অকস্মাৎ তিনি চলে গেলেন। হাতে আমার হাত রেখে কি যেন বলে গেলেন সেটি আমি অনেক করেও বুঝতে পারলাম না। জীবনের সমস্ত সুখ এই সঙ্গে শেষ হলো।...তখন আমার যে ধৈর্যগুণ এলো, এখন মনে হলে আশ্চর্য হয়ে থাকি। মনে হলো এই যে যাওয়া আসা এ তো কতকগুলো তৃণগুচ্ছ নদীর ঢেউয়ে কখনও একত্র হচ্ছে আবার সরে যাচ্ছে। এর জন্যে এত কাতরতা হচ্ছে কেন?"

একজন সাধারণ নারীও যে শোকের সময় মাঝে মাঝে নির্বেদ বৈরাগ্যের সন্ধান পায় তার দ্বিতীয় প্রমাণ বিনয়িনী। এর আগে পুত্রশোকে আচ্ছন্ন প্রফুল্লময়ীও দুঃখের মধ্যে হারানিধি সন্তানের বিচ্ছেদ ভুলতে পেরেছিলেন। যাইহোক, বিনয়িনীর 'কাহিনী'র আরো একটি গুরুত্ব আছে। যতদূর মনে হয়, অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর ধারে' এবং 'আপনকথা' ও প্রতিমা ঠাকুরের 'স্মৃতিচিত্র' লেখার প্রেরণা যুগিয়েছিল বিনয়িনীর আত্মকাহিনী। কেউ একজন পুরনো কথা বলতে বসলে সকলেরই স্মৃতি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এখানে সেই পুরনো কথা বলবার দায়িত্ব প্রথমে নিয়েছিলেন বিনয়িনী।

দিদির মতো সুনয়নীও ঘর-সংসার, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে থাকতে ভালো-বাসতেন। তারই ফাঁকে ফাঁকে তিনি আঁকতেন রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী, বালগোপাল, ননীচোরা, কৃষ্ণযশোদার ছবি। কি করে ছবি আঁকতে হয় সুনয়নী শেখেননি। দুই দাদাকে নিবিষ্ট মনে দক্ষিণের বারান্দায় বসে ছবি আঁকতে দেখে দেখে একটু বেশি বয়সে আপন মনেই ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন। ছবি আঁকা তো নয় আঁকা-আঁকা খেলা। আগে থেকে কিছু না ভেবে তূলি বুলিয়ে জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ধোয়া—তারই মধ্যে কখনো আভাস এলো নাদুসনুদুস বালগোপাল কেষ্টঠাকুরের, কখনো লাজুকলতা কনে বৌয়ের হেসে ওঠা চোখ দুটির—আগে থেকে কিচ্ছু বোঝা যায় না। কিন্তু শিল্পী দাদাদের কোন প্রভাব সুনয়নীর ছবিতে নেই। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার নব উদ্বোধনের যুগে তিন ভাইবোন বেছে নিলেন তিনটি পথ। অবনীন্দ্র গ্রহণ করলেন পারশিয়ান ও মোগল টেকনিক। গগনেন্দ্র নিলেন জাপানী ও কিউবিস্টিক ধারা আর সুনয়নী একেবারে জনসাধারণের আর্ট অর্থাৎ পটশিল্পের ভিত্তির ওপর আঁকলেন তাঁর একান্ত নিজস্ব ছবি। পটের ছবির সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ টানা টানা দীঘল দুটি কালো চোখের গহিন ছায়ায়। সুনয়নীর ছবিতেও স্বভাবশিল্পী পটুয়াদের আঁকা চোখদুটি চোখে পড়ে। এ ধরনের চোখ আঁকার ব্যাপারে সুনয়নী যামিনী রায়েরও পূর্ববর্তিনী।

সুনয়নী ছবি আঁকতেন আপন খেয়ালে। তিনিই বাঙালী মহিলা চিত্রশিল্পীদের

পথিকৃৎ। তখনকার দিনে যে মেয়েরা ছবি আঁকতো না তা নয়। বিশেষ করে যাঁরা পশ্চিমের 'ফ্যাশান দুরস্ত' ছিলেন তাঁদের তো কথাই নেই। ঘোড়ায় চড়া, ইংরেজিতে কথা বলা, পিয়ানো বাজানোর মতোই ছবি আঁকাটাও ছিল তাঁদের গুণের নিদর্শন। ঠাকুরবাড়ির ট্র্যাডিশন ভেঙে হেমেন্দ্রনাথও তাঁর স্ত্রী ও মেয়েদের ছবি আঁকা শিখিয়েছিলেন। প্রতিভার আঁকা দু একটা ছবি ছাপা হয়েছিল 'পুণ্যে'। প্রজ্ঞার আঁকা দু তিনটে পোর্ট্রেট বেশ ভালো হয়েছিল। সুতরাং ছবি আঁকার চেষ্টা যে সুনয়নীর পক্ষে খুব নতুন তা নয়। নতুন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর নতুনত্বে। এতদিন যাঁরা ছবি এঁকেছেন তাঁরা আঁকার চেয়ে বেশি ওপরে ওঠেননি। মানুষ বা প্রতিকৃতি যাই হোক না কেন তারই অনুকরণ করেছেন তাঁরা। নীপময়ী, প্রতিভা, প্রজ্ঞা সম্বন্ধেও একথাই খাটে। কিন্তু সুনয়নী যা দেখলেন তাই আঁকলেন না। ছবির সঙ্গে মিশে রইলো এক অধরা সৌন্দর্য। তাই তাঁর ছবিতেই প্রথম দেখা দিল স্বকীয়তা। প্রথম প্রথম তিনি ছবি নিয়ে দেখাতে যেতেন দাদাদের।

"দেখ তো দাদা কেমন হয়েছে।"

দাদারা উৎসাহ দেন। কখনো বলেন 'ভালো'। কখনো বলেন 'বাঃ'। কখনো বলেন 'এঁকে যা, তোর হবে'। সুনয়নী এঁকে চলেন। ঘর ভরে ওঠে ছবিতে। এর মধ্যে একটা ছবি 'অর্ধনারীশ্বর'। দেখে খুশি হয়ে উঠলেন গগনেন্দ্র। অবনীন্দ্র তখন সরকারী আর্ট কলেজের সঙ্গে যুক্ত। তাঁকে বললেন, "ওকে একটা সার্টিফিকেট লিখে দাও।"

অবনীন্দ্র অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করছিলেন সুনয়নীর ছবি। এবার বললেন, "ও যে ধারায় ছবি আঁকছে তার জন্যে আমায় আর সার্টিফিকেট লিখে দিতে হবে না। পরে দেশের লোকের কাছ থেকে ও নিজেই সার্টিফিকেট আদায় করে নেবে।"

সত্যিই তাই নিয়েছিলেন সুনয়নী। দেশের সম্মান, বিদেশের সম্মান সবই পেয়েছিলেন। তবু তাঁর জীবন ছিল সহজ ও অনাড়ম্বর।

সুনয়নী কি কোন বাধা পেয়েছিলেন? মনে তো হয় না। একলা ঘরে গিন্নী

ছিলেন তিনি। বিয়ে হয়েছিল সেই বিখ্যাত চাটুজ্জ্যে পরিবারে, যেখানে দুই বৌ হয়ে গিয়েছিলেন সরোজা ও উষা। সুনয়নীর স্বামী রজনীমোহন অবশ্য পাঁচ নম্বর বাড়িতেই থাকতেন। বাপের বাড়িতেই শ্বশুরবাড়ি হওয়ায় সুনয়নী অন্যান্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে পিয়ানোয় সুর তুলতেন, ডিক্সনারী দেখে ইংরেজি শিখতেন আর ছবি আঁকতেন। আরেকটা কাজেও সুনয়নীর উৎসাহ ছিল। তিনি মেয়েদের দিযে নাটকাভিনয় করাতেন। মহর্ষিভবনের মতো এ বাড়িতে স্ত্রীপুরুষ সবাই মিলে নাটক করতেন না। বরং মেয়েদের নাটকে মেয়েরাই সাজতেন পুরুষ। একবার জ্ঞানদানন্দিনীর উৎসাহে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় হলো। রাজা সাজলেন বিনয়িনী। রানী গগনেন্দ্রের স্ত্রী প্রমোদকুমারী, মন্ত্রী সমরেন্দ্রের স্ত্রী নিশিবালা, বাসবদত্তা সুনয়নী ও চ্যুতলতিকা অবনীন্দ্রের স্ত্রী সুহাসিনী। ছোট মেয়েদের নিয়েও সুনয়নী করাতেন 'আলিবাবা', 'মৃণালিনী' বা অন্য কিছু। রবীন্দ্রনাথ বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে এঁরা এক্সপেরিমেণ্ট করেননি, এমনকি অবনীন্দ্রনাথের লেখাও না। তাই বোঝা যায় এবাড়ির অন্দরমহলের সুরটি বাঁধা ছিল সাবেক কালের সঙ্গে।

সুনযনীকে ছবি আঁকায় কেউ বাধা দেয়নি। সমাজ এখন উদার হয়েছে। আর সুনয়নীব ছবিও তো ঠাকুর দেবতার ছবি। তারই মধ্যে দেখা দিল তাঁর নিজস্ব ধারা। সুনয়নীর ছবি বিদেশীদেরও চোখে পড়েছিল। সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন স্টেলা ক্রামরিশ। তিনি ছবির আলোচনা করলে সেই লেখা পড়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন শ্রীমতী ককশীটার। লণ্ডন উইমেন্‌স্ আর্ট ক্লাব থেকে তিনি সুনয়নীর ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন ১৯২৭ সালে। বিদেশীরাও মুগ্ধ হলো। তূলির টানে কোন দুর্বলতা নেই, নেই সংশয়ের অবকাশ। সবচেয়ে সুন্দর দুটি চোখ। দীঘল, মায়াময়, স্বপ্নরঙীন। এ চোখ বুঝি পাশ্চাত্ত্য প্রথাসিদ্ধ নয়, তবুও ভীষণ রকম বাস্তব। সম্পূর্ণ বিদেশী প্রভাবমুক্ত সুনয়নী যেন নতুন শিল্পরীতিরই প্রবর্তন করলেন। ফ্রান্স এবং জার্মানী থেকেও আহ্বান এসেছিল। তবে সুনয়নী এত প্রদর্শনীর কথা ভাবতেন না। ভালো লাগতো, আপন খেয়ালে আঁকতেন, বিলিয়ে দিতেন প্রিয়জনদের। এত খ্যাতি, এত সম্মান কিন্তু তাতে

সুনয়নীর চিত্রভাষা বদলালো না। সেই রূপকথা, কথকতা, পাঁচালি, পুরাণ, মহাকাব্য, আলপনা, নক্‌শী কাঁথা, বাউল, বোস্টম, আরব্য রজনীর গল্পই জুড়ে রইলো তাঁর ছবির জগৎ। শিব, কৃষ্ণ, লক্ষ্মীর ছবির সংখ্যাই বেশি। হরপার্বতী, অর্ধ-নারীশ্বর এবং রাধাকৃষ্ণেরও একাধিক ছবি আছে। অসংখ্য ছবি, কিন্তু সবার মধ্যেই যেন লৌকিক সারল্যের স্পর্শ মাখানো রয়েছে। ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায়ের মতে সুনয়নীর ছবিতে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই; দক্ষ হাতের খেলা নেই, কোন রঙের আড়ম্বর নেই—আছে একটি সহজ সোজা মন ও চোখের দৃষ্টি। একথা আরো মনে হয় সুনয়নীর কবিতা পড়লে। ঠাকুরবাড়ির অধিকাংশ মেয়েদের মতো তিনি গান জানতেন, কবিতা লিখতেন। প্রকাশ্যে নয় গোপনে। তাই বিনয়িনীর আত্মকাহিনীর মতোই সেগুলো আত্মগোপন করে আছে খাতার পাতায়। আমরা তাঁর পুত্রবধূ মণিমালা দেবীর সৌজন্যে দুটো কবিতা দেখেছি। একটা তুলে দিচ্ছি। দুটিতেই রয়েছে এক অনাবিল সারল্য। সেকেলে শিশুপাঠ্য কবিতার সঙ্গে সুনয়নীর কবিতার মিল আছে। অথচ তিনি রবীন্দ্র-কাব্যের সঙ্গে ভালোমতই পরিচিত ছিলেন। অন্যদের কবিতাও পড়েছেন। কিন্তু তাঁর নিজের কবিতা আশ্চর্যভাবে সরলীকৃত। মাটি ঘেঁষা। প্রাণবন্ত। শৈশবচেতনায় মগ্ন। এবার কবিতা:

"সারাদিন বসি গগনের মাঝে
আলোকের খেলা করিয়া শেষ
সাঁঝের বেলায় চলে দিনমণি
ক্লান্ত শরীরে আপন দেশ।
গ্রামের পথটি আঁধারে ঢাকিল
ছেলেরা চলিল আপন ঘর
প্রদীপ জ্বালিয়া কে রেখে দিয়েছে
আলপনা দিয়ে দুয়ার পর।
বধূটি চলেছে ঘোমটায় ঢাকি
কলসী ভরিয়া লইয়া জল

সোপান বাহিয়া চলে ধীরে ধীরে
চরণে তাহার বাজিছে মল।
গগন সাজিল নতুন শোভায়
পরণে নীলা শাড়ি হীরার ফুল।
জ্বলিল গগনে হীরক প্রদীপ
আর নাহি হবে পথের ভুল।
খেয়া তরীখানি বাহিয়া এখনি
আসিবে যে নেয়ে করিতে পার
বলিবে কে যাবি আয় ত্বরা করি
নাহি কোন ভয় ভাবনা আর।"

সুনয়নীর কবিতাও যেন ছবিতে ভরা। এই প্রকৃতি, এই ছেলের দল, আলপনা আঁকা প্রদীপ জ্বালা ঘর, ঘোমটা টানা বধূর মল বাজিয়ে জল আনা, খেয়া তরীর মাঝির আহ্বান—এ সবই তো ছবির উপাদান। বাংলার নিজস্ব। এই সুর, এই ভঙ্গী, কালিঘাটের পোটোর মতো এই তুলির টানও সুনয়নীর একান্ত নিজস্ব।

এবার রবীন্দ্রনাথের মেয়েদের কথায় আসা যাক। ঠাকুরবাড়ির অন্য মেয়েরা যথেষ্ট বড়ো হয়েছেন। এমন সময় একে একে এলেন তিন কন্যা—মাধুরী, রেণুকা, অতসী। যেন তিনটি পদ্ম ফুলের কুঁড়ি। বড়ো মেয়ের নাম মাধুরীলতা, কবির বড়ো আদরের বেলা বা বেলুবুড়ি। ফরসা রঙ, অপরূপ সুন্দব মুখ। ছাব্বিশ বছরের পিতা রবীন্দ্রনাথের মনের আয়নায় ধরা পড়েছে তার বিচিত্র অভিব্যক্তি। কিছু চিঠিপত্র ও স্মৃতিকথা ছাড়াও বেলার এই বয়সটা চিরকালের মতো ধরা আছে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মিনির মধ্যে।

ঠাকুরবাড়ির মেয়ে হয়েও মাধুরীলতা মানুষ হয়েছেন স্বতন্ত্র ধরনে। তা স্বতন্ত্র বৈকি! সত্যেন্দ্র বা হেমেন্দ্রের মেয়েদের মতো ধরাবাঁধা বিলিতি স্কুল লরেটোতে পড়েননি তিনি। এমনকি দেশী স্কুল বেথুনেও না। পড়েছেন বাড়িতে। তিনজন ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী, লরেন্স সাহেব ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে শিখতেন লেখাপড়া।

এছাড়া পড়তেন বাবার কাছে। স্কুলে পাঠাননি বলে কবি যে মাধুরীকে কিছু শেখাতে বাকি রেখেছিলেন তা নয়। দেশি-বিলিতি গান, সাহিত্য, এমন কি নার্সিং পর্যন্ত শিখিয়েছিলেন।

মাত্র একত্রিশ বছর বেঁচেছিলেন মাধুরীলতা। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের ইতিবৃত্ত সকলেরি জানা কারণ তিনি রবীন্দ্র-দুহিতা। পিতা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপলব্ধি বেলাকে কোলে নিয়েই। তাই তাকে নিয়ে তাঁর কত আশা কত আশঙ্কা! কত স্বপ্ন কত সাধ! পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে বেলা কবির সবচেয়ে প্রিয়। বাবার মন বলে বড়ো হয়ে বেলি খুব লক্ষ্মী মেয়ে হবে। হয়েছিলেনও তাই। একটু বড়ো হতেই মাধুরী বুঝেছিলেন, 'আমি যা করবো আমার ভাইবোনেরা তাই দেখে আমার দৃষ্টান্ত অবলম্বন করবে। আমি যদি ভালো না হই, তবে ওদেব পক্ষে, আমার পক্ষেও মন্দ!' মাধুরী জানতেন তিনি দিদিদের মতো বিশেষ করে ইন্দিরার মতো গুণবতী নন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা "যদ্দুর পারি ভালো হবো।"

শিলাইদহের একঘেয়েমিতে মৃণালিনীর মতোই হাঁপিযে উঠতেন মাধুরী। দিন যেন কাটে না। অভিযোগ ঝরে পড়ে বাবার বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথকে সরাসরিভাবে আক্রমণ করার সাহস কারুর নেই। কিন্তু মাধুরীলতা তাঁরই মেয়ে। তাই বাবাকে চিঠি লেখেন:

"তোমার একলা মনে হয় না, কেননা তুমি ঢের বড়ো বড়ো জিনিষ ভাবতে, আলোচনা করতে, সেগুলোকে নিয়ে একরকম বেশ কাটাও। আমরা সামান্য মানুষ, আমাদের একটু গল্পগুজব মানুষজন নিয়ে থাকতে এক একসময় একটু আধটু ইচ্ছে করে। আর যদি তুমি এখানে এসে আর নড়তে না চাও তবে তুমি যে যে মহৎ বিষয় নিয়ে থাকো তাই সব আমাদের একটু একটু দাও।"

ভাবতে অবাক লাগে মাধুরী যখন এ চিঠি লিখছেন তখন তাঁর বয়স চোদ্দও পুরো হয়নি। তখন থেকেই তিনি পিতার দার্শনিক চিন্তার শরিক হতে চেয়েছেন।

মাধুরীর চোদ্দ বছর বয়স হতেই তার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন রবীন্দ্র-নাথ। মনের মতো ছেলে পাওয়া কি এতই সোজা? তার ওপর মোটা বরপণ

আছে। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের ওপর পড়লো পাত্র খোঁজার ভার। যখন কথাবার্তা ফলপ্রসূ হয় না তখন বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে লেখেন, "বৃথা চেষ্টায় নিজেকে ক্ষুব্ধ কোরো না"। আবার লেখেন, "নদী যেমন চলতে চলতে সাগরে গিয়ে পড়েই সেইরকম বেলা যথাসময়ে তার স্বামীকূলে গিয়ে উপনীত হবে।" কিন্তু এ তো সান্ত্বনা। এভাবে বসে থাকলে তো মেয়ের বিয়ে হয় না। অবশেষে সুপাত্রের সন্ধান মিললো। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরৎ—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র। দর্শনে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পেয়েছেন কেশব সেন স্বর্ণপদক। তারপর মেণ্টাল এ্যাণ্ড মর‍্যাল সায়েন্সে এম. এ, তাতেও প্রথম। এখন ওকালতী পাশ করে মজঃফরপুরে প্র্যাকটিস করছেন। সব দিক থেকেই মনোমত পাত্র। কবি বিহারীলালের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ প্রথম জীবন থেকে—সেই তিন তলার ছাদ, ফুলের বাগান, জ্যোতিদাদার সাহিত্য মজলিশ, বৌঠানের প্রিয় কবি বিহারীলালের উদাত্ত হাসি, সাধের আসন—সব যেন মনে পড়ে। এখন বিহারীলাল নেই, তাঁর ছেলে কি তাঁর মতোই স্বভাব পাবে না?

শরতের মা মোটা বরপণ দাবি করলেন। বিয়ে হবে ব্রাহ্ম মতে। কবি তখনও সংস্কারক হননি। মেয়ের সুখের জন্যে ক্ষুব্ধ অভিমানে বরপণের দাবি মেনে নিলেন। সম্মত হলেন দশ হাজার টাকা দিতে। এর আগে বলেছি মহর্ষি মেয়েদের বিয়েতে যৌতুক দিতেন তিন হাজার টাকা, এবারে দিলেন পাঁচ হাজার। বাকিটা দিলেন কবি। বিয়ের কথা পাকা হবার পরেও বাধা এসেছিল কারণ শরৎরা যে শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তার সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে কুটুম্বদের মনঃপূত হয়নি। অবশ্য এসব আপত্তি কবি গায়ে মাখেননি।

বিয়ের পরে মাধুরী স্বামীর ঘর করতে গেলেন মজঃফরপুরে। সেখানে ওরকম যৌতুক নিয়ে ঘরবসত করতে কেউ আসেনি। অপর্যাপ্ত শাড়ি, গয়না, অসামান্য রূপ; তার ওপর মাধুরীর মধুর ব্যবহারে সমস্ত মজঃফরপুরবাসী বাঙালীরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। এর ওপর অতিথিরূপে এসেছেন মাধুরীর কবি-পিতা। লোক সমাগমের যেন শেষ নেই। এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও কবি খুশি হয়েছিলেন

জামাই হিসেবে শরৎকে পেয়ে। অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন মেয়েকে। মাধুরী উত্তরে লিখেছেন, "এ বাড়ির মেয়ে বলে উনি আমাতে অনেক সদ্‌গুণ আশা করেন, তাতে যাতে না নিরাশ হন আমি সেই চেষ্টা করবো।"

মাধুরীর চেষ্টা সফল হয়েছিল। সতেরো বছরের দাম্পত্য জীবনে সুখী হয়েছিলেন শরৎ ও মাধুরী। মজঃফরপুরের জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে নিশ্চয় কষ্ট হয়েছিল মাধুরীর। লেখিকা অনুরূপা দেবীর সঙ্গে এ সময় মাধুরীর আলাপ হয়। দুজনের স্বামীরা ছিলেন দুই বন্ধু। সেই সূত্রে বন্ধুত্ব। বিয়ের সময় অনুরূপা মজঃফরপুরে ছিলেন না। ফিরে এসে মাধুরীকে দেখলেন এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল চৈত্র অপরাহ্নে। দেবকন্যার মতোই অপরূপা। সকলেই তাঁর গুণে মুগ্ধ। মাধুরীর গৃহিনীপণার গল্প আর করবো না। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা, শুধু ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা কেন, বাঙালী মেয়েরা গৃহিনীপণায় খুব পটু। সুতরাং অন্য প্রসঙ্গে আসি।

বিহারে তখন প্রচণ্ড পর্দার যুগ চলছে। সেই পর্দা ভেদ করে মেয়েদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছয় না। এইরকম জায়গায় এসে মাধুরী কি শুধু আপন সংসারটিকে নিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারেন? না পারা সম্ভব? বিশেষ করে মাধুরী সেই ঠাকুরবাড়ির মেয়ে, যে মেয়েরা জ্ঞানের আলো জ্বালাতে বারবার এসে দাঁড়িয়েছেন পুরুষের পাশে। মজঃফরপুরে যদিও শরৎকে কোন সমাজ সংস্কারের কাজে মগ্ন হতে দেখা যায়নি তবে স্ত্রীর ইচ্ছেয় তিনি বাধাও দেননি। তাই মাধুরী কাজ শুরু করে দিলেন অনুরূপাকে সঙ্গে নিয়ে। কলকাতায় তিনি দেখে এসেছেন নারী শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা, দেখেছেন তাঁর দিদিরা কেমন মেতে উঠেছেন জনসেবার কাজে। এখানেও রয়েছে অনেক কাজ। মেয়েরা একেবারে অশিক্ষিতা, ঘোর পর্দার আড়ালে তাদের জীবনের সবটাই প্রায় ঢাকা। এমন উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষার বীজ বপন করতেই হবে। সখী অনুরূপাকে নিয়ে মাধুরী সেখানে গড়ে তুললেন 'লেডিজ কমিটি', যুগ্ম সম্পাদিকা হলেন দুজনেই। তারপর প্রতিষ্ঠা করলেন একটা গার্লস্ স্কুল 'চ্যাপম্যান বালিকা বিদ্যালয়'। স্কুল তো হলো, ছাত্রী কই?

মজঃফরপুরে ছাত্রী জোগাড় করা সহজ নয়। বাংলার তুলনায় বিহারের মেয়েরা তখনও পেছনে পড়ে আছেন। মাধুরীর সমসাময়িককালেই বিহারের মেয়েদের কথা আরো অনেক বেশি ভেবেছিলেন অঘোরকামিনী রায়। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় বাঁকিপুরের মেয়েদের অবস্থা কিছু বদলেছে। তিনি নিজের কাছে মেয়েদের রেখে তাদের একটু একটু করে শিখিয়েছেন। এভাবেই প্রথম পনেরোজন শিক্ষিত হয়ে ওঠে। অঘোরকামিনীর সঙ্গে সঙ্গে কাজ করতেন তাঁর মেয়েরাও। বিহারের মেয়েরা থাকতো পর্দার আড়ালে। পর্দাপ্রথা দূর করবার জন্যে অঘোরকামিনী ব্রহ্ম সঙ্গীত গাইতে গাইতে মেয়েদের নিয়ে পথে বেরোতেন। সে এক দৃশ্য! তাঁদের সমবেত সঙ্গীত সাহস জোগাতো অন্যদের, একটু একটু করে খুলে যেত বন্ধ দুয়ার! অবশ্য অঘোরকামিনীর মতো সমাজ-সেবিকার সঙ্গে মাধুরীর কোন তুলনা হয় না। কতই বা বয়স তাঁর? কদিনই বা ছিলেন মজঃফরপুরে? এসময় আরো একজন মহিলা ভাগলপুরের মেয়েদের দুরবস্থা দূর করতে এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু পারেননি। তাঁর নাম বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনিও বাংলারই মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল ভাগলপুরেব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। বিদুষী স্ত্রীকে তিনি লেখাপড়া ও বইলেখার কাজে উৎসাহ দিতেন। মৃত্যুকালে একটা মেয়েদের স্কুল স্থাপন করে স্ত্রীকে তার ভার দিয়ে যান। মাত্র পাঁচটি মেয়ে ও একজন শিক্ষিকা নিয়ে স্কুলের কাজ শুরু কবেন রোকেয়া। কিন্তু সেখানে বিশেষ করে মুসলমান সমাজের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। বোরখার অন্ধকারে হাঁফিয়ে উঠে কত মেয়ে যে ছটফট করতো কে তাব হিসেব রাখে! বিয়ে-সাদী স্থির হলে মেয়েকে ছয় কি সাত মাস রাখা হতো অন্ধকার ঘরে। দিন-রাত আটক থাকতে থাকতে কেউ হারাতো স্বাস্থ্য, কেউ হারাতো জীবন, কেউ হারাতো দৃষ্টিশক্তি তবু পর্দা এতটুকু ফাঁক হতো না। এদের ভালো করার সাধ্য একা রোকেয়ার ছিল না। স্বামীর স্মৃতি রক্ষাব জন্যে তাঁকে স্কুলটি তুলে নিয়ে চলে আসতে হয় কলকাতায়। ভাগলপুরের পাশেই ছিল মজঃফরপুর। সুতরাং দুটি সংসার-অনভিজ্ঞা কিশোরী বধূ কি করে স্কুল চালাবেন!

অনুরূপা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে চান কিন্তু মাধুরীর ধৈর্য অসাধারণ। সখীকে টেনে নিয়ে ঢাকা ঘোড়ার গাড়ি চড়ে মাধুরী বাড়ি বাড়ি ঘুরতে শুরু করলেন। মেয়েরা তখনও অসূর্যম্পশ্যা। তাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্যে মাধুরীদের লুকোতে হতো আড়ালে। গাড়ি থেকে নামার সময় দুদিকে চাদর ধরে আড়াল করা পথ দিয়ে তাঁরা গৃহস্থবাড়িতে ঢুকতেন। কেন এই প্রয়াস? তাঁরা তো অসূর্যম্পশ্যা নন। তবু বিশ্বাস আনতে হবে তো। খণ্ডন করতে হবে বিবিয়ানার অপবাদ। আপনজনের সামনেই তো খুলবে মনের বন্ধ দুয়ার, তাই ছোট শহরের সামাজিক রীতিকে উপেক্ষা করলেন না মাধুরী। একটু একটু করে সত্যিই দরজা খুলতে লাগলো। মজঃফরপুরে বেশিদিন থাকলে মাধুরীও নিশ্চয় সমাজসেবিকা হিসেবে নাম করতেন। কিন্তু স্ফুলিঙ্গ দাবানলে পরিণত হবার আগেই পট পরিবর্তন হলো। মাধুরী ফিরে এলেন কলকাতায়।

মাধুরীর লেখাপড়ার দিকে নজর ছিল রবীন্দ্রনাথের। তাই বোধহয় লেখার হাত খুলেছিল প্রথম থেকেই। চিঠিগুলোই তার প্রমাণ। এছাড়াও তাঁর আটটা রচনার খোঁজ পাওয়া গেছে। মনে হয় এ সময়েই কবি মৃণালিনীর অসমাপ্ত রামায়ণটা মেয়ের হাতে তুলে দেন। শরৎ ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেতে গেছেন। অবসর সময়ে মাধুরী শান্তিনিকেতনের বাচ্চাদের পড়াতেন। গল্প লেখার শুরুও এখানে। অনুবাদ ছাড়া তিনটে গল্পে নতুনত্ব এবং শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মপ্রকাশে কুণ্ঠিতা মাধুরীকে লিখতে বলতেন অনুরূপা। তারপর বাবার উৎসাহে লিখে ফেললেন 'সুয়ো', 'মাতাশত্রু' এবং 'সৎপাত্র'। ছাপা হয়েছিল 'ভারতী', 'প্রবাসী' ও 'সবুজপত্রে'। অবশ্য সে আরো পরের কথা। তখন মাধুরী আছেন জোড়াসাঁকোতে, শরৎ বিলেতে। স্ত্রী, রেণুকা আর শমীন্দ্রকে হারিয়ে কবি অবশিষ্ট সন্তানদের আরো আপন করে নিতে চাইলেন। এই সময়ই মকসো চলতো গল্পের। খসড়া দেখে দিতেন মাধুরীর বাবা। কবি প্রশান্ত মহলানবিশকে বলেছিলেন, "ওর ক্ষমতা ছিল,—কিন্তু লিখতো না।" 'মাতাশত্রু' বা 'সৎপাত্র' পড়লেই এ কথা বোঝা যাবে। তবে এসব গল্পে রবীন্দ্রনাথ কতখানি কলম চালিয়েছিলেন বলা শক্ত। হয়তো শুধু কাঠামোটাই ছিল মাধুরীর। গল্পগুচ্ছের

প্রথম মুদ্রণে 'সৎপাত্র' তো রবীন্দ্রনাথের রচনা হিসেবেই ছাপা হয়। পরে কবি জানান সেটি তাঁর কন্যার লেখা। এ গল্পে নারীমাংসলোলুপ সাধুচরণের শ্বাপদ-বৃত্তির যে ছবি আঁকা হয়েছে তা যেমন তীব্র তেমনি ভয়াবহ। গল্পের শেষে একটি মাত্র মন্তব্য "স্ত্রীর হিসাবে সাধুচরণের যত্র আয় তত্র ব্যয়"। এই গল্প এবং শেষের মন্তব্যটির অনির্বাচ্য ব্যঞ্জনায় মাধুরীর চেয়ে মাধুরীর বিশ্ববিখ্যাত বাবার হাতই যে বেশি ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। 'মাতাশত্রু'ও বেশ নতুন ধরণের গল্প। এক হতভাগিনী মায়ের দুর্জয় লোভ ও তার পরিণতি নিয়ে লেখা। দুটো গল্পই অবিশ্বাস্য অথচ বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে। মাধুরীর বন্ধু অনুরূপার সঙ্গে কবির দেখা হয়েছিল একবার। কবি অনুরূপাকে বলেছিলেন, "তোমার দেখাদেখি ইদানীং গল্প লিখতে আরম্ভ করেছিল। বেঁচে থাকলে হয়তো তোমার মতো লিখতে পারতো।"

নিতান্ত অকালে হারানো মাধুরীলতার জীবন যেভাবে শুরু হয়েছিল সেভাবে, শেষ হলো না। ১৯০৯ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত জোড়াসাঁকোতে কাটলেও তারপর শুরু হয়েছিল ঘোর অশান্তি। কারণটা ঠিক জানা যায়নি। কবি ছিলেন বিদেশে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি তদারকির ভার ছিল ছোট জামাই নগেন্দ্রনাথের হাতে। শোনা যায়, ঐ সময়ে শরতের ওপর নানারকম অবিচার করা হয়। দোষ ছিল না তাঁর। তবু ফিরে আসার পর মাধুরীর মুখে সব কথা শুনেও কবি যখন কোন ব্যবস্থা না করেই শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন তখন অভিমানী শরৎ ও মাধুরী চলে গেলেন ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়িতে। এরপর আর কোনদিন শরতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। আর মাধুরীলতা?

মৃত্যুসংবাদ ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর কি কিছুই জানা যাবে না? দেবতুল্য বিশ্ববন্দিত পিতার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটলো, সে সময় কে রইলো পাশে? কে দিল সান্ত্বনা? এসময় থেকেই তিনি ধীরে ধীরে রোগশয্যা নিলেন। বছরখানেক পরে সুস্থ হয়ে অনুরূপাকে লিখেছিলেন, 'বন্ধুহারা মম অন্ধ ঘরে, থাকি বসে অবসন্ন মনে।' রোগশয্যায় শুয়ে মাধুরী অনুভব করেছেন:

"একটা আবরণ সরে গেছে, মানুষকে যেন নতুন করে দেখতে শিখেছি।

এরকম কঠিন ভাবে মনটা নাড়া না পেলে হয়তো কখনো জাগতো না।"

মাধুরী উপলব্ধি করেছেন তাঁর জীবনে এতদিন আত্মার সঙ্গে মনের পরিচয় হবার সুযোগ হয়নি, হয়েছে সুদীর্ঘ রোগশয্যায় জীবনমৃত্যুর মাঝখানে। এই নতুন উপলব্ধি নিয়ে মাধুরী আর সংসারে ফিরে আসতে পারেননি। কবিকে বারবার যেতে হয়েছে বিদেশে। এণ্ডুজের মুখে বাবার বিজয়বার্তা শোনেন মাধুরী। প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে মেয়ের পাণ্ডুর মুখ। তারপর শোনা গেল ডাক এসেছে মাধুরীর। যে রোগে মারা গেছেন ছোট বোন রেণুকা, সেই ক্ষয়রোগই বাসা বেঁধেছে স্বর্গীয় মাধুরীমাখা বেলার শরীরে। এ তো বেলার অসুখ নয়। এ যে মহাকালের পরীক্ষা!

সময় যখন ঘনিয়ে এলো তখন কবিকে এসে বসতে হলো মেয়ের পাশে। বিছানায় মিশে থাকা, তিল তিল করে ক্ষয়ে যাওয়া রুগ্‌নো শরীর, দুখানি শীর্ণ সাদা হাত বাড়িয়ে মাধুরী ছেলেবেলার মতো আবদার করেন, 'বাবা গল্প বলো'।

বাবার বুকে শেলাঘাত হয়। এই তো সেদিন, কদিন আর হবে, তাঁর অবুঝ চঞ্চল মেজো মেয়ে রাণীও বেলার মতোই শীর্ণ হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল তাঁকে, বলেছিল 'বাবা গল্প বলো'। আবার? এত শীঘ্র গল্প শোনাতে হবে আরেক-জনকে, কথাকোবিদ পিতার গল্পের ঝুলিও বুঝি শেষ হয়ে যেতে চায়। তবু বলেন। রেণুকা শুনেছিল ছোট ছেলের গল্প—'শিশু'র কবিতা—সে নিজেও যে শৈশবের সীমানা পার হয়নি। বেলা বুঝি শোনেন 'পলাতকা'র বিধুর গল্প, 'মুক্তি', হারিয়ে যাওয়া বাঁশির কথা! এই গল্প শোনাও একদিন ফুরলো।

মাধুরীলতার মৃত্যুসংক্রান্ত কিছু তথ্যঘটিত ভ্রান্তি রয়েছে। বেশির ভাগটাই শরৎকে নিয়ে। আমরা ঠিক না জানলেও একথা সত্য যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যে অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল মাধুরীর মৃত্যুর মতো বিশাল ঘটনাতেও তার জের মেটেনি। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, কবির সঙ্গে আর শরতের সাক্ষাৎ হয়নি। "বেলা যখন মৃত্যুশয্যায় তখন কবি কন্যাকে দেখতে যেতেন দুপুরে—যখন জামাতা আদালতে।" অপর দিকে

হেমলতার উক্তি তুলে ধরেছেন মৈত্রেয়ী দেবী। তাতে দেখা যাবে হেমলতা বলছেন, "অত আদরের মেয়ে বেলা তার মৃত্যুশয্যায়, সব অপমান চেপে তিনি দেখা করতে যেতেন। শরৎ তখন টেবিলের উপর দু পা তুলে দিয়ে সিগারেট খেত। পা নামাতো না পর্যন্ত—এমনি করে অপমান করতো। উনি সব বুকের মধ্যে চেপে মেয়ের পাশে বসতেন, মেয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকতো।"

দুটি উক্তিই আমাদের মনে সংশয় জাগিয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথ এবং প্রশান্ত মহলানবিশ দুজনেই বলেছেন তাঁরা মাধুরীকে দেখতে যেতেন সকাল বেলা। প্রশান্ত তাঁকে নিয়ে যেতেন গাড়ি করে, তাই তাঁর ভুল হবার সম্ভাবনা কম। অপর দিকে রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন 'দুপুরবেলা'। অবশ্য এই সময়টা বেলা দশটার পর হলে বোধহয় কোনো সংশয় থাকে না। অপর দিকে হেমলতার কথাকেও বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া গেল না কারণ কবি নিজে বলেছেন মেয়ে তাঁকে বলতেন 'বাবা গল্প বলো'। বেলার মৃত্যুর পরে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা চিঠিতেও দেখা যাচ্ছে কবি লিখেছেন তিনি তাঁর মেয়ের রোগযন্ত্রণা কিছুই লাঘব করতে পারেননি "অথচ পিতার উপর শেষ পর্যন্ত তাহার নির্ভর ছিল।" তাই মেয়ের মুখ ফিরিয়ে থাকার মধ্যে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। শরতের চাপা অভিমানী স্বভাবের সঙ্গেও যেন এই ব্যবহার খাপ খায় না। বরং তার সঙ্গে কবির দেখা না হবার সম্ভাবনাই বেশি। যেদিন দেখা হতে পারতো অর্থাৎ বেলার মৃত্যুর সময় সেদিন কবি ফিরে গিয়েছিলেন সিঁড়ি থেকেই। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শরৎ চলে গিয়েছিলেন মজঃফরপুরে, একটা পুরনো নীলকুঠি কিনে সেখানে গাছপালা ফুলের বাগান করে নিরালায় বাস করতেন। অনেকের মতে মাধুরীলতার বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যর্থ বিড়ম্বিত জীবন থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন 'হৈমন্তী' গল্পের বীজ। হৈমন্তীর সঙ্গে মাধুরীর সাদৃশ্য আছে ঠিকই তবে শরৎ ও মাধুরীর বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হয়েছিল মনে হয় না। ইন্দিরা লিখেছেন, "শরৎ তাঁদের স্বল্পকালস্থায়ী বিবাহিত জীবনে বেলার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন।" তবে ক্ষুব্ধ অভিমানের দুস্তর সেতু কবি বা শরৎ কেউই কোনোদিন পার হতে পারেননি।

এবার মীরার কথায় আসা যাক। রবীন্দ্রনাথের মেয়েদের মধ্যে দীর্ঘ জীবনের অধিকারিণী শুধু মীরা বা অতসী। মেজো মেয়ে রাণী বা রেণুকার মৃত্যু হয়েছিল কৈশোরে, ফুল হয়ে ফুটে ওঠার আগেই। একটু জেদী একরোখা ধরণের মেয়ে রেণুকার কথা সবচেয়ে বেশি জানা যায় মীরার 'স্মৃতিকথা' থেকে। রেণুকার বিয়ে হয়েছিল মাত্র এগারো বছর বয়সে। মায়ের মৃত্যু এবং স্বামী অকৃতকার্য হয়ে আমেরিকা থেকে ফিরে আসায় রেণুকা খুব দুঃখিত হন। মনেব ব্যথা পরিণত হয় বুকের ব্যাধিতে। কবি ওঁকে প্রতিদিন উপনিষদের মন্ত্রের অর্থ বুঝিযে দিয়েছেন যাতে ছেড়ে যেতে কষ্ট না হয়। তাই হয়তো যাবার সময় বেণুকা বাবার হাত চেপে ধরে বলেছিলেন, "বাবা, ওঁ পিতা নোঽসি বলো।"

নিজের দিদির কথা নিপুণভাবে বললেও মীরা স্মৃতিকথায় ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির কোনো আভাস দেননি। তাতে আছে শুধু নিজের ছেলেবেলার কথা। দুঃখের দারুণ আঘাত বারবার হানা দিয়েছিল মীরার জীবনে তবু সব শোকতাপ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। তা বলে যে অন্যের দুঃখের বেদনা বুঝতে পারতেন না তা নয়, তাই তো রেণুকার কথাটুকু বললুম, কিশোরী রেণুকার কথা এত ভালো করে আর কেউ লেখেননি। এখন রেণুকার কথা থাক। মীবার কথাই বলি।

রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে কাছে থাকা সবচেয়ে নির্বাক মেযেটি। হায়! বেলার ভাগ্যে জুটেছিল কত আদর! আর মীরা শৈশবেই হারিয়েছে মাকে, ভাইকে, দিদিকে। পিতার সান্নিধ্যই বা তেমন পেয়েছেন কোথায়? মানুষ হয়েছেন জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে। বিবাহিত জীবনেও মীরা সুখী হননি। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে ভাবী জামাতা রূপে নির্বাচন করেই কবি চরম ভুল করেছিলেন। প্রিয়দর্শন তেজস্বী নগেন্দ্র আদি সমাজের নিয়ম অনুযায়ী মীরাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলেন আমেরিকা যাবার শর্তে। বিয়ের সময়েই উপবীত নিয়ে বিরোধ বাধে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের মতে উপবীত ধারণ অবশ্যকর্তব্য। সাধারণ সমাজের নিয়মানুযায়ী নগেন্দ্র উপবীত

ত্যাগ করেছিলেন। এরপর তাঁর বিরোধ শুরু হয় শরৎ-মাধুরীর সঙ্গে। কবি নীরব থেকে অবিচার করলেন শরতের ওপর। কিন্তু অদৃষ্ট! সুখ ছিল না মীরার জীবনে। নগেন্দ্র তাঁকে ত্যাগ করে খ্রীস্টান হয়ে চলে যান ভিন্ন পথে। মীরাও তাঁকে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবেননি; শুধু ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে থেকেছেন স্বতন্ত্রভাবে। স্বামীর সঙ্গে আর একবার দেখা হয়েছিল মীরার, একমাত্র ছেলে নীতীন্দ্রের মৃত্যুশয্যার পাশে জার্মানীতে। কবি ভেবেছিলেন বিরাট দুঃখ দুটি অভিমানী হৃদয়কে কাছে এনে দেবে। দেয়নি। এমনকি মীরার 'স্মৃতিকথা'তে একবারও আসেননি নগেন্দ্র, মীরার জীবন থেকে তিনি একেবারেই মুছে গিয়েছিলেন।

আত্মপ্রকাশে বিমুখ মীরার দিন কাটতো আপন মনে। নিজের হাতে গড়া 'মালঞ্চে' বসে। একমাত্র সান্ত্বনা ছিল দুটি সন্তান। তারাও চলে গেল। নীতীন্দ্র অত্যন্ত অকালে, সেই পুরনো কালব্যাধি যক্ষ্মায়। নন্দিতা অনেক পরে। কিন্তু কোন রকম দুঃখশোকের বহিঃপ্রকাশ দেখা যেত না। কবি বলতেন, 'সব লোকের সামনে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে'। মীরাও লুকিয়ে রেখেছিলেন দুঃখের উপচে ওঠা ডালি। একেবারে শেষ জীবনে 'স্মৃতিকথা' না লিখলে তাঁকে নিয়ে স্বতন্ত্র করে লেখার কিছু থাকতো না।

একেবারে শেষ কালে নিজেকে ব্যক্ত করতেই বা বসলেন কেন তিনি? তাঁর কি মনে হয়েছিল 'যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইব কত আর' তাই কি লিখে রাখতে চেয়েছিলেন? কখনোই না। যার নিজের জীবনেরই সব কিছু হারানোর তহবিলে চলে গেছে সে আর কি চাইবে? তিনি স্মৃতিকথা লিখেছেন "রোগশয্যার দীর্ঘ অবসর কাটাবার জন্যে"। তাই এর মধ্যে নেই কোন ধারাবাহিকতা, নেই নিজের জীবনের কোন ছবি। যাঁদের সান্নিধ্য তাঁর অন্ধকার মনের বুক চিরে আলোর আভাস এনে দিয়েছিল শুধু তাঁদের কথাই আছে। যাঁর মনের আয়নায় তাঁরা ধরা পড়লেন তিনিই শুধু রইলেন অধরা।

তবু মানুষ কি একেবারে নিজের কথা লুকিয়ে রাখতে পারে? তাই স্মৃতিকথা'র পাতাও আপনি হয়ে উঠেছে ভারি। যখন তাঁর মনের মতো বাগানে

ফুল ফুটতো তখন আর কোন দুঃখ থাকতো না। মন আবার স্থির হয়ে আসতো মীরার ভাষা বা লেখার ভঙ্গীটিও ভারি সরল। একটু দেখলে মন্দ হয় না :

"গাছ ভরে বেল জুঁই ফুটতে লাগলো, সকালে উঠে লাল রাস্তার উপর শিশির ভেজা শিউলি ফুল বিছিয়ে আছে দেখতে পেতুম, বাতাসে দূর থেকে চামেলির গন্ধ ভেসে আসতো, তখন আর আমার কোন দুঃখ রইলো না। মনে হতো এরা আমাকে যথেষ্ট প্রতিদান দিয়েছে। কেননা কোন কাজে যখন আমি মন বসাতে পারছিলুম না তখন এই বাগানের নেশা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।"

'স্মৃতিকথা' লেখার অনেক আগে মীরা রবীন্দ্র-নির্দেশে কয়েকটি দেশী-বিদেশী ইংরেজি প্রবন্ধের সার সংকলন করেন। আটটি 'প্রবাসী'তে এবং তিনটি ছাপা হয় 'তত্ত্ববোধিনী'তে। এছাড়া দীর্ঘ জীবনে মীরা শান্তিনিকেতনে বাস করলেও বলতে গেলে কিছুই করেননি। মীরার সঙ্গে সঙ্গেই মহর্ষির নাতনীদের কথা বলার পালাও ফুরলো। এবার আসা যাক এবাড়ির নতুন আসা বৌয়েদের কথায়। মেয়েরা যেমন ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব সংস্কৃতিকে নিয়ে গিয়েছিলেন ভিন্ন পরিবারে তেমনি ভিন্ন পারিবারিক ঐশ্বর্যের গরিমা নিয়ে এসেছিলেন আরও কয়েকটি মেয়ে। তবে সকলে তো আর সমান প্রতিভার অধিকারী হতে পারেন না তাই যাঁরা বিশেষ গুণবতীরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের কথাই বলবো। এ সময়ে ঠাকুর-বাড়িতে যাঁরা বৌ হয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম সবচেয়ে বেশি শোনা যায়। এই তিনজন হচ্ছেন হেমলতা, প্রতিমা ও সংজ্ঞা।

হেমলতা দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ। দ্বিপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া স্ত্রী। দ্বিপেন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী সুশীলা জীবনের স্বল্প অবকাশে অন্দরমহলকে হাসিয়ে-কাঁদিয়ে চলে গেছেন। বাংলা দেশের এক গ্রাম থেকেই বৌ হয়ে এসেছিলেন সুশীলা ও তাঁর বোন চারুশীলা, দু বোনের কেউই বেশিদিন বাঁচেননি। সুশীলা ভালো গান ও অভিনয় করতে পারতেন। প্রফুল্লময়ী তাঁর স্মৃতিচারণের সময় জানিয়েছেন যে, যে কোন গানই তিনি এমন ভাব দিয়ে গাইতেন যে লোকে মুগ্ধ হতো। সুশীলার ছেলে দিনেন্দ্রের গানেও এই বৈশিষ্ট্য ছিল। সুশীলা অভিনয় করেছেন ঠাকুর-

বাড়ির সেই সোনালি পর্বে। 'বিবাহ-উৎসব' নাটিকায় তিনিই সাজতেন নায়ক। তাঁর একটা গান 'ও কেন চুরি করে চায়' তখন খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। অবশ্য এই জনপ্রিয়তা ঠাকুরবাড়ির বাইরে নয়। বাইরে সুশীলার গান অভিনয় কিছুই পৌঁছয়নি। তাঁর স্বভাবটি ছিল ভারি মিষ্টি। সবার সঙ্গে মিলে মিশে হৈ চৈ করতে ভালোবাসতেন, তারই মধ্যে দেখা গেল মেস্‌মেরাইজ করার দুর্লভ ক্ষমতাও সুশীলার যথেষ্ট রয়েছে। তিনি দীর্ঘজীবী হলে আর একটি প্রতিভাময়ী নারীকে আমরা দেখতে পেতুম।

সুশীলার মৃত্যুর পরে ঠাকুরবাড়ির বৌ হয়ে আসেন হেমলতা। রাজা রাম-মোহন রায়ের দৌহিত্র বংশে তাঁর জন্ম। ইতিপূর্বে তাঁর তিন দাদার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির তিনটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে। এবার সে বাড়ির বৌ হয়ে এলেন হেমলতা, বিয়ের আগে থেকেই ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরের সঙ্গে হেমলতার পরিচয় ছিল। ষোলো বছর বয়সে বৌ হয়ে এসেই দ্বিপেন্দ্রের দুটি ছেলেমেয়ের একেবারে আসল মা হয়ে উঠলেন। তারপর থেকে হেমলতার বড়ো মা হয়ে ওঠার কাহিনী এগিয়েছে মসৃণভাবে। তাঁর নিজের সন্তান ছিল না কিন্তু তিনি ছিলেন সবারই বড়ো মা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছেন তিনি। সেবা, শুশ্রূষা, আদর যত্ন, দেখাশোনা, কর্তৃত্ব ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে ছিল লেখবার দুর্লভ ক্ষমতা। আদি ব্রাহ্ম সমাজে তিনি প্রথম আচার্য্যা। পারিবারিক কাজ, সমাজ সেবা, ধর্মোপদেশ দানের ফাঁকে ফাঁকে চলতো তাঁর সাহিত্য সাধনা।

ছোটবেলা থেকেই হেমলতা বিদ্যোৎসাহিনী। তাই তাঁর বাবা ললিতমোহন যত্ন করে মেয়েকে বাংলা, ইংরেজি ভাষার সঙ্গে শিখিয়েছিলেন জ্যোতিষশাস্ত্র। মেয়েদের জ্যোতিষ পাঠ নিষিদ্ধ। যাদের বাঁচা-মরা খাওয়া-পরা নির্ভর করতো পরের হাতে সে নিজের ভাগ্য গণনা করে করবেই বা কি? তাই মেয়ের মা বিরোধিতা করতেন। এখন দিন বদলেছে। ললিতমোহন হেসে বলতেন, "এই মেয়ে আমার ব্রাহ্মণ"। ব্রাহ্মণের মতোই তার ধারণা শক্তি ছিল তাই জ্যোতিষচর্চা করা মোটেই অসম্ভব নয়। হেমলতার জ্যোতিষচর্চা অবশ্য এগোয়নি

শুধু কয়েকটা গল্পে তার ছাপ পড়েছে। এছাড়া দাদা মোহিনীমোহনের কাছে তিনি পড়েছিলেন 'কালীসিংহির মহাভারত'। বিয়ের পরও তাঁর আগ্রহ দেখে দ্বিপেন্দ্র মিস ম্যাকস্কলকে নিয়োগ করেন হেমলতাকে ইংরেজি পড়াবার জন্যে। হেমলতা পড়তেন রবীন্দ্রনাথের কাছেও।

শুধু সাহিত্য বা ভাষা নয় হেমলতার আগ্রহ ছিল ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদের ওপর। তাঁর বাবা ছিলেন তৈলঙ্গস্বামীর সাক্ষাৎ শিষ্য। দাদা মোহিনীমোহনও প্রথমে থিয়সফিস্ট আন্দোলনের পরে শিবনারায়ণ স্বামীর সংস্পর্শে আসেন। হেমলতাও পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীকেই গুরু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং বিভিন্ন আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধর্মসাধনার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। রাজা রামমোহনের ঐতিহ্য তো ছিলই, বিয়ের পরে এর সঙ্গে যুক্ত হলো মহর্ষির জীবনসাধনা। রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি কিছু সুফীবাদের বইও পড়েন। একদিন কবি পড়াতে পড়াতে বলেন, "তুমি মুসলমান হবে নাকি? তোমার মন যে রকম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দেখি, সুফীদের কথায়।"

হেমলতা তখন নতুন বৌ নন। তাই বললেন, "সুফীরা মহাতাপস, তবে কোন কিছু হওয়াহওয়ি চল্‌বে না রাজা বামমোহনেব যুগে। কোন একটা কোঠায় ঢোকা যায় কি করে?"

কবি শুনে খুশি হয়েছিলেন, "কথা ঠিক। তোমার ওপর রাজা রামমোহনের আশীর্বাদ আছে দেখছি।"

মহর্ষির আশীর্বাদও পেয়েছিলেন হেমলতা। বলেন্দ্রের মৃত্যুর পর পারিবারিক ধর্মালোচনার সময় তাঁর আগ্রহ, উৎসাহ এবং পৃথক ধর্মসাধনার কথা মহর্ষি শুনতে পান ও হেমলতার সঙ্গে প্রতিদিন দুপুরে একঘণ্টা ধর্মালোচনা করতে আরম্ভ করেন। এভাবেই কাটে দীর্ঘ সাত বছর।

মৃত্যুর আগে নাতবৌয়ের ধর্মবিশ্বাস ও ভগবৎ ভক্তির প্রতি আস্থার নিদর্শন-রূপে মহর্ষি তাঁকে দিয়ে যান নিজের দীক্ষার আংটিটি। হেমলতা এ কথা জানতেন না। মহর্ষির মৃত্যুর পরে তাঁর খাজাঞ্চী যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় আংটিটি হেমলতাকে দিয়ে বলেন, "কর্তামহাশয় ইহা আপনাকে দিবার জন্য আমাকে বলিয়া গিয়াছেন।

এবং বলিয়াছেন আপনিই ইহার প্রকৃত অধিকারী।" পরে এই আংটি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে রাখা হয়। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় হেমলতা ছিলেন সবার থেকে স্বতন্ত্র এবং মহর্ষির জীবন সাধনার যোগ্যতমা উত্তরাধিকারিণী। এ সময় ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা বিভিন্ন দিকে এঁকে দিচ্ছেন নিজেদের সাফল্যের পরিচয় আর হেমলতা নীরবে নিভৃতে দিচ্ছেন ধর্ম উপদেশ। এই উপদেশগুলি পুস্তিকার আকারে ছাপা হয়েছিল। 'পরমাত্মায় কি প্রয়োজন', 'সৃষ্টি ও স্রষ্টা কাহার নাম', 'চৈতন্যময় পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কাহার নাম', 'সত্য লাভের উপায় কি' প্রভৃতি উপদেশে ব্রাহ্মধর্মের সারসত্য নিহিত আছে। ধর্ম সম্বন্ধে হেমলতাব যেমন গোঁড়ামি ছিল না তেমনি সর্বধর্মের প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা হেমলতার বক্তৃতা শুনে আনন্দিত হতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেব জন্ম শতবর্ষপূর্তি উৎসবে যোগ দিয়ে তিনি ঠাকুরকে ব্যাখ্যা করেছিলেন সহজ আনন্দেব উৎস শিশু ভোলানাথ রূপে।

ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা করেছেন সাহিতচর্চা এবং সমাজসেবা। এ কাজেও তিনি কোন বাধা পাননি। মেয়েদের বাধা ক্রমশই অপসারিত হচ্ছিল। তাব ওপরে তিনি ধর্মপ্রাণা, সুশিক্ষিতা এবং ধনী-ঘবনী। সব কাজের মধ্যেও বাড়ির লোকের জন্যে সর্বদা ব্যস্ত থাকতো তাঁর দুটি সেবানিপুণ হাতের প্রাণঢালা শুশ্রূষা। কি করে যে এত কাজ তিনি করতেন কে জানে? গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-নাটিকা-শিশুপাঠ্য বই-স্মৃতিকথা-গান বলতে গেলে সবই লিখেছেন হেমলতা। এর ওপর ছিল 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকা সম্পাদনা, 'সরোজনলিনী' ও 'বসন্তকুমারী' বিধবা আশ্রমের ভার। ছিল শান্তিনিকেতনের ছেলেদের দেখাশোনাব ভার। প্রথমে তাঁর সাহিত্যচর্চাব কথাটাই সেবে নেওয়া যেতে পারে। ঠাকুরবাড়িতে এসে অনেকেই লেখিকা হয়েছেন কিন্তু হেমলতার সাহিত্যবোধ ছিল সহজাত। এ বাড়ির বৌ হয়েও তাঁর নিজস্বতা তিনি হারাননি। তাই তাঁর গল্পে পাওয়া যাবে ভিন্ন সুরের সন্ধান তবে প্রবন্ধ-স্মৃতিকথায় তিনি ঠাকুরবাড়ির বিশেষ ভঙ্গীটিকেই গ্রহণ করেছেন।

হেমলতার কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে মাত্র তিনটি—'জ্যোতিঃ', 'অকল্পিতা' ও 'আলোর পাখি'। এছাড়াও অনেক কবিতা এখনও পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হেমলতার কয়েকটা কবিতায় সুর দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সুর দেওয়া গান হলো 'ওহে সুনির্মল সুন্দর উজ্জ্বল শুভ্র আলোকে' ও 'বালক প্রাণে আলোক জ্বালি'। জ্যোতিরিন্দ্র সুর দিয়েছিলেন 'আমি আর কিছু না জানি' কবিতায়। এঁরা ছাড়াও হেমলতার গানের সুর ও স্বরলিপি করেছেন ইন্দিরা, ও বিখ্যাত গায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হেমলতার সব কবিতাই ভগবৎ প্রেমে সিক্ত। ছোট ছোট কবিতায় গভীরতার ছাপ স্পষ্ট কিন্তু কোথাও দুর্বোধ্য বা জটিল নয়। কোথাও নেই রূপ ও রূপকের ঠোকাঠুকি, প্রতীক ও ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনা কিংবা চিত্রকল্পের সুমিত আভাস। তবু কি যেন আছে। অন্তর ও বাইরের চেতনাকে তিনি এক করে দেখতে চেয়েছেন। এই দেখার মধ্যে আছে তাঁর নিজস্ব অনুভব :

"অন্তরে চেতনা অনুভবে
বাহিরে সে ধরে
নানাগত রূপ,
অন্তরে বাহিরে নেহারে যে তারে
ঘুচে তার ভব-
বন্ধনের দুখ।"

হেমলতার সব কবিতাই আজকের তুলনায় বড়ো বেশি সরলীকৃত তবে ১৯১০।১২ সালে এ জাতীয় কবিতার আদর ছিল। রবীন্দ্রানুসারী কবিগোষ্ঠী ছাড়াও এরকম কবিতা লিখতেন প্রিয়ংবদা দেবী, কামিনী রায়, অন্নদাসুন্দরী দেবী, মানকুমারী বসু আরো অনেকে। আসলে পারিবারিক সুখ দুঃখ, প্রকৃতি এবং ঈশ্বর এই ছিল মেয়েদের কবিতার জগৎ, এবং ছিল অনেকদিন। তখনও গদ্য কবিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়নি। ভাব এবং কাব্যভাষাতে রাবীন্দ্রিক ছাপই বেশি ছিল। কবি হেমলতার কবিতা পড়তে ভালোবাসতেন। স্বল্পা

'কাব্য পরিচয়ে' তিনি হেমলতার একটা কবিতাও যোগ করেন।

'তুনিয়ার দেনা' আর 'দেহলি' হেমলতার লেখা গল্পের বই। প্রথমটার গল্পগুলো অনেকটা লিপিকাধর্মী তবে দার্শনিক চিন্তায় ভরা। কামিনী রায় গল্পগুলি পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এবং সেই সঙ্গে অনুভব করেছিলেন হেমলতার সাহিত্য সাধনায় অনুমান আর কল্পনার চেয়ে জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি কার্যকর হয়েছে। কথাটা সত্যি, মেয়েদের লেখায় অভিজ্ঞতার অভাব একটা মস্ত বড়ো জিনিষ। তাই অনেক জিনিষই সত্য হয়েও বাস্তব হয়ে ওঠে না।। হেমলতার সেই অসুবিধে ছিল না। তিনি সমাজসেবার জন্যে বিভিন্ন মানুষকে দেখেছিলেন, পর্যবেক্ষণ করেছিলেন আপন অসামান্য অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, তাই মুগ্ধ করতে পেরেছিলেন কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথকে। যিনি মেয়েদের লেখা পছন্দ করতেন না তিনিও 'দেহলি' পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছিলেন একখানি অনবদ্য চিঠি। লিখেছিলেন :

"বাংলা দেশের ছোট বড়ো নানা গ্রামে পল্লীতে তুমি ভ্রমণ করেছ, সেই উপলক্ষ্যে তোমার দৃষ্টিশক্তি তোমার অভিজ্ঞতাকে বিচিত্র করে তুলেছে, তোমার গল্পগুলি সেই অভিজ্ঞতার চিত্র প্রদর্শনী।"

ঠাকুরবাড়ির মেয়ে-বৌয়েদের মধ্যে স্বর্ণকুমারীর পর মৌলিক গল্প লিখে এতখানি সম্মান বোধহয় হেমলতাই পেলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে সম্মান জানিয়েছিল সর্বপ্রথম লীলা পুরস্কার দিয়ে। হেমলতার গল্পের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর লেখার সাদৃশ্য নেই, বরং যোগ আছে লাহোরিনী শরৎকুমারীর গল্পের। তুজনেরি স্বচ্ছ সরস জীবনদৃষ্টি তাঁদের গল্পে উদ্ভাসিত। তবে হেমলতার কবিতার মতোই গল্পগুলোও জটিলতাবর্জিত। তাঁর গল্পের চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ সবই অতি সহজ, স্বাভাবিক অনাড়ম্বর। অধিকাংশ গল্পেই আছে হেমলতার বাস্তব অভিজ্ঞতা। বিধবা আশ্রম দেখা শোনার সময় তিনি অনেকের সুখতুঃখের সঙ্গে পরিচিত হন। না হলে 'চন্দ্রমণি' গল্পের নায়িকাকে আঁকতে পারতেন না। দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কুমারী মেয়েকে বিধবা সাজিয়ে আশ্রমে পাঠানো তৎকালীন লেখিকাদের কলমে আঁকা সম্ভব ছিল না।

অভিজ্ঞতাই তাঁকে বহু বিচিত্র পরিস্থিতির সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে।

হেমলতাকে প্রকৃত সমাজ সেবিকা বললেই বোধহয় তাঁর যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়। ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য মেয়েরাও সাহিত্য, সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে সঙ্গে সমাজসেবা করেছেন। কিন্তু হেমলতার প্রধান লক্ষ্য ছিল নারী কল্যাণ। 'সখিসমিতি', 'বিধবা শিল্পাশ্রম' কিংবা 'ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলে'র সঙ্গেই তাঁর যোগ বেশি। তিনি নিয়েছিলেন 'সরোজনলিনী নারীমঙ্গলসমিতি' ও পুরীর 'বসন্তকুমারী বিধবা আশ্রমে'র ভার। আশ্রম পরিচালনার সময় হেমলতা যে সংগঠনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তার তুলনা বোধহয় চলে শুধু 'ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলে'র কৃষ্ণভামিনী দাসের সঙ্গে।

'সরোজনলিনী আশ্রম' প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২৫ সালে। তার কিছুদিন পরে গুরুসদয় দত্তের অনুরোধে হেমলতা এর ভার নেন। পরে তিনি দেখলেন 'নারীশিক্ষা-সমিতির' জন্যে অবলা বসু, 'হিরণ্ময়ী শিল্পাশ্রমে'র জন্যে স্বর্ণকুমারী ও 'ভারত স্ত্রীমহা-মণ্ডলে'র দেখাশোনার জন্যে সরলা আছেন কিন্তু 'সরোজনলিনী'র জন্যে কেউ নেই। তাই সে ভার তাঁকেই নিতে হলো। নারীশিক্ষা ও কল্যাণের আদর্শে নিজেকে একেবারে সঁপে দিয়ে তিনি খুঁজেছিলেন মেয়েদের সত্যিকারের অধিকার কোথায় খর্ব হয়েছে। নিজে কঠোর বৈধব্য জীবন যাপন করলেও মেয়েদের মৌল সমস্যা অনুসন্ধানের সময় সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় দিয়েছেন। মেয়েদের স্বাধীনতা কি এবং কাকে বলে সেকথাও তিনি খুব সংক্ষেপে জানাতে পেরেছেন। পুরুষের সঙ্গে অবাধে মিলতে মিশতে পারাকেই তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতা নাম দিতে নারাজ। "পুরুষকে শুধু পুরুষ বলেই জেনে যে মেয়ে পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার জন্যে লালায়িত, সে মেয়ে অশিক্ষিতা। পুরুষকে যিনি পুরুষের অতিরিক্ত মানুষ বলে দেখতে ও চিনতে শিখেছেন তিনিই প্রকৃত শিক্ষিতা।" তবে বাঙালী মেয়েদের স্বাধীনতা স্পৃহাকে যাঁরা বাঁকা চোখে দেখেছেন তাঁদের ভুলও ভেঙ্গে দিতে চেয়েছেন হেমলতা। বাঙালী মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে মেশবার লালসায় স্বাধীনতা চায়নি। তাঁদের সত্যিকারের অধীনতা হচ্ছে দায়ভাগে অনধিকার।

য়ুরোপে নারীমুক্তি আন্দোলনের কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে হেমলতা দেখতে গিয়েছিলেন সেখানে নারীমুক্তি আন্দোলন কি ভাবে সফল হয়েছে এবং স্বাধীনতার

প্রকৃত স্বরূপ কি? অনেক দেশ ঘুরে তিনি যখন ভারতে ফিরে এলেন তখনও তাঁর এ সম্বন্ধে কোনো ধারণার পরিবর্তন দেখা যায়নি। নারীর আদর্শ তাঁর কাছে ত্যাগ-তিতিক্ষা-সংযম ও পরহিত। সেই আদর্শেই তিনি মেয়েদের অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর একাধিক প্রবন্ধে এই কথাই বলা হয়েছে। সমাজসেবিকা হিসেবে স্বর্ণকুমারী, হিরণ্ময়ী, সরলা, কৃষ্ণভামিনী দাস, অবলা বসু, চারুশীলা দেবী, মোহিনী সেন ও আরো অনেকেই ছিলেন, এদের মধ্যে হেমলতা ছিলেন মধ্যমণি হয়ে। সব আশ্রমেই তাঁর ডাক পড়তো। হাসি মুখে এগিয়ে যেতেন সবার কাছে। মিশে যেতেন সবার সঙ্গে। অন্তরের অভিজাত শুদ্ধতাবোধের সঙ্গে মিশতো প্রাণের আবেগ।

এখনও যে মাঝে মাঝে আমরা হেমলতার কথা মনে করি তার কারণ কিন্তু সমাজসেবা নয় তাঁর লেখা স্মৃতিকথা। না, ঠাকুরবাড়ির ট্র্যাডিশন অনুযায়ী তিনি নিজের আত্মকাহিনী লেখেননি। কিন্তু ঘরোয়া আটপৌরে ভঙ্গীতে এমন কয়েকটা প্রবন্ধ লিখেছেন যার মধ্যে মিশে আছে রম্য ব্যক্তিতার স্বাদ। নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখে রাখার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। কিন্তু যাঁদের সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবন ধন্য হয়ে উঠেছিল, সেই স্পর্শমণির মতো কয়েকজন ব্যক্তিকে প্রবন্ধের মধ্যে ধরে রেখেছেন হেমলতা। না রেখে পারেননি। স্মৃতিকথার ছোঁয়া থাকলেও এই প্রবন্ধগুলো লেখবার সময় নিজেকে সম্পূর্ণ অপরিচয়ের দূরত্বে সরিয়ে রাখার কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। 'রবীন্দ্রনাথের বিবাহবাসর', 'বৈশাখের রবীন্দ্রনাথ', 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ', 'আশ্চর্য মানুষ রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখীন সাধনার ধারা'—কবিকে বুঝতে খুব বেশি সাহায্য করে। কবি নিজেও স্বীকার করেছেন রচনাগুলি অতি 'সুপাঠ্য'। রবীন্দ্রজীবনসন্ধানীর কাছে হেমলতার প্রবন্ধগুলি অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। দু একটা ছবি দেখা যাক। হেমলতা লিখেছেন :

"কবিপত্নী একবার সাধ করে সোনার বোতাম গড়িয়েছিলেন কবির জন্মদিনে কবিকে পরাবেন বলে। কবি দেখে বললেন, ছি ছি ছি, পুরুষে কখনো সোনা পরে—লজ্জার কথা, তোমাদের চমৎকার রুচি। কবিপত্নী সে-বোতাম ভেঙ্গে

ওপালে-বসানো বোতাম গড়িয়ে দিলেন। দু-চার বার কবি সেটি ব্যবহার করেছিলেন যেন দায়ে পড়ে।"

জ্ঞানবৃদ্ধ আপনভোলা চিরশিশু দ্বিজেন্দ্রনাথের কথাও কম নেই।

"বৈকালে গরম লুচি ভেজে সামনে এনে দিয়েছে। লুচিতে হাত ঠেকিয়েই বললেন, 'এ কি লুচি? ঘি চপচপ করছে লুচির সারা গায়ে, আমার হাত-শুদ্ধ নষ্ট হলো ঘি লেগে।' লুচির প্লেট আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "যাও, জল দিয়ে লুচি ভেজে আনো। ঘি দিয়ে বুঝি আবার লুচি ভাজে।"

হেমলতা একটু পরে ঘিয়ের বদলে শুকনো ময়দা দিয়ে বেলে লুচি ভেজে আনলেন। এবার ঠিক হয়েছে দেখা গেল। লুচির গায়ে ঘি লেগে নেই একটুও। খুশি হয়ে দ্বিজেন্দ্র বললেন, "এই তো ঠিক হয়েছে, দেখলে জল দিয়ে ভেজে কেমন হলো।" খাওয়ার পরে হেমলতা গল্পচ্ছলে শোনালেন লুচি ভাজার ইতিহাস। তখন সে কি হাসি, "তাই তো, গরম জলে ময়দা দিলে গুলে কাই হয়ে যাবে তো বটেই। আচ্ছা কাণ্ড আমার, কি বলতে কি বলি, তোমাদের জ্বালিয়ে মারি। তোমরা যা ভালো বোঝ তাই করো—"

হেমলতা না থাকলে এ রকম অনেক ছবিই হারিয়ে যেত। হয়তো খুব বড়ো গোছের ক্ষতি হতো না কিন্তু সেই বিশাল মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের অনেকখানি ব্যক্তিত্ব রইতো ঢাকা। কোন পুরুষ জীবনীকার কি আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারতেন ঠাকুরবাড়ির এই আটপৌরে অনাবৃত রূপ?

দ্বিজেন্দ্র পরিবারে সুশীলা হেমলতা ছাড়াও বধূরূপে এসেছিলেন অরুণেন্দ্রের দুই স্ত্রী চারুশীলা ও সুশোভিনী, নীতীন্দ্রনাথের স্ত্রী সরোজিনী, সুধীন্দ্রনাথের স্ত্রী চারুবালা এবং কৃতীন্দ্রনাথের দুই স্ত্রী সুকেশী ও সবিতা। সুশীলার মতো চারুশীলা ও সুকেশীরও অকালমৃত্যু হয়। অন্যান্যরাও তাঁদের পারিবারিক গণ্ডির সীমা ছাড়িয়ে এমন কিছুই করেননি যে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা চলে। বরং সুধীন্দ্রের স্ত্রী চারুবালা ওই পারিবারিক পরিবেশেই ছেলে মেয়েদের মনে স্বাদেশিকতা সঞ্চারের চেষ্টা করেন। তখন বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে দেশপ্রেমের সুর ভেসে

বেড়াচ্ছে। চারুবালা প্রত্যক্ষভাবে কোন আন্দোলনে জড়িয়ে না পড়ে ছেলে-মেয়েদের স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার, দেশপ্রেমের গান শেখাতেন। তাঁর শিক্ষা যে ব্যর্থ হয়নি তাঁর পুত্র সৌম্যেন্দ্রনাথের বিদ্রোহী মনোভাবই তার প্রমাণ। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা ভালো। এ সময় ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা আর বাংলায় নারী সমাজের নেত্রী হয়ে নেই। কয়েকজন প্রতিভাময়ী নিশ্চয় আছেন কিন্তু তাঁদের পরিধিও সংকীর্ণ। ঠাকুরবাড়ি সম্বন্ধে এমন একটা ধারা বা ধারণা গড়ে উঠেছে লোকের মনে। সে ধারণা শ্রদ্ধা ও বিস্ময় মেশা। কিন্তু এখন আর বাংলায় গুণবতী মেয়ের সংখ্যা কম নয়। শিক্ষা, শিল্প, বিজ্ঞান সব দিকেই তাঁদের ভূমিকা স্পষ্ট। বরং ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা সে পথ থেকে কিছুটা দূরে সরে এসে নিরালায় শিল্পসাধনা নিয়ে মেতে উঠেছেন কারণ বাংলার শিল্পজগৎ তখনও সম্পূর্ণভাবে সমৃদ্ধ হয়নি।

সুকেশী থাকতেন শান্তিনিকেতনে। এই হাসিখুশি মিশুকে বৌটি তাঁর মধুর ব্যবহার দিয়ে সকলকে আপন করে নিয়েছিলেন। এ সময় রবীন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতন—বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করায় ঠাকুরবাড়ির অনেকেই চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি ক্রমশঃই যেন তার মহিমা হারাচ্ছিল। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, উনিশ শতকে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এই বিশাল বাড়িটি, বিশ শতকে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠলেন এই বাড়িরই একটি মানুষ—একক ব্যক্তিত্ব প্রাধান্য লাভ করলো। তাই শান্তিনিকেতনে গড়ে উঠতে লাগলো ঘরোয়া পরিবেশ। মেয়েরা গড়লেন 'আলাপিনী সভা'—আনন্দ-মেলা। বেরোতে শুরু করলো হাতে লেখা মেয়েলী পত্রিকা 'শ্রেয়সী', 'ঘরোয়া' আরো কত কী! ইন্দিরা, হেমলতা সবাই জমিয়ে বসলেন সেখানে। সুকেশীও মিশে গিয়েছিলেন সবার সাথে। অল্প কয়েকদিনের ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে সুকেশী চিরবিদায় নিলে কৃতীন্দ্রের বিবাহ হয় সবিতার সঙ্গে। তিনি ভালো ছবি আঁকতেন। ১৩২৯ সালের 'শ্রেয়সী'র পাতায় তাঁর আঁকা কিছু ছবি ছাপা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রনাথের পুত্রবধূদের কথাও সেরে নেওয়া যেতে পারে। হিতেন্দ্রের স্ত্রী সরোজিনী, ক্ষিতীন্দ্রের স্ত্রী ধৃতিমতী ও সুহাসিনী এবং ঋতেন্দ্রের

স্ত্রী অলকা এসেছেন ঠাকুরবাড়িতে। তবে তিন ভাইয়ের কেউই তাঁদের বাবার মতো নারীপ্রগতি বা স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন বলে মনে হয় না। বরং এ সময় যেন ঠাকুরবাড়ি একটু বেশি মাত্রায় রক্ষণশীল এবং পর্দানশীন হয়ে পড়েছিল। অবশ্য এরই মধ্যে নানারকম শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন সুরেন্দ্রের স্ত্রী সংজ্ঞা, বলেন্দ্রের স্ত্রী সুশীতলা বা সাহানা এবং রথীন্দ্রের স্ত্রী প্রতিমা।

জ্ঞানদানন্দিনীর একমাত্র ছেলে সুরেন্দ্রনাথ। চোখের মণি, আদরের দুলাল। তার বিয়ে দেবেন ডাকসাইটে সুন্দরীর সঙ্গে। যেখানে সুন্দব মেয়ে দেখতে পান তার সঙ্গেই সম্বন্ধ করেন। মাঝে মাঝে তাদেব বাড়িতে এনে রেখে দিয়েছেন। ছেলেব ঘোর আপত্তি বিয়েতে। কি আর হবে? কাঁদতে কাঁদতে অনেক খেলনা দিয়ে সে মেয়েকে বিদায় দিতে হয়েছে। সুরেন্দ্রের বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল কুচবিহারের রাজবাড়ি থেকে। কেশব সেনের নাতনী সুকৃতির সঙ্গে। তাঁর মা সুনীতি দেবী। ঠাকুববাড়ির সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ-বন্ধুত্ব-হৃদ্যতা অনেক পুরনো। সুতরাং এ তো সুখের কথা! কিন্তু আপত্তি করেছিলেন মহর্ষি। তিনি ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বিবাহের ঘোর বিরোধী। কাজেই হলো না। সুকৃতির বিয়ে হলো স্বর্ণকুমারীর ছেলে জ্যোৎস্নানাথের সঙ্গে। তিনি বিয়ে করেছিলেন সকলের অমতে! সুরেন্দ্র ও জ্যোৎস্না ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। যাক সে কথা! সুরেন্দ্রের বিয়ে ঠিক হলো একেবারে হঠাৎ।

মহর্ষির প্রিয় শিষ্য প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর মেয়ে সংজ্ঞা একদিন এসেছিলেন ভাইয়ের পৈতেয় নিমন্ত্রণ করতে। নাক মুখ টিকলো, কেবল চোখ একটু বসা, তা সকলেরি খুব পছন্দ হয়ে গেল। সবচেয়ে খুশি হলেন মহর্ষি। তিনি আনন্দের চোটে এক চামচ ভাত বেশি খেয়ে ফেললেন। সংজ্ঞার মা ইন্দিরাও ঠাকুরবাড়ির মেয়ে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহোদর রাধানাথ ঠাকুরের বংশে শ্রীনাথ ঠাকুরের মেয়ে। তাঁর নিজের লেখা 'আমার খাতা'ও একটি সুখপাঠ্য বই।

বেশ ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে হলো। মায়ের জেদাজেদিতে বিয়ে করতে হলো বলে সুরেন্দ্র মেয়ে দেখেননি। সংজ্ঞার বয়সও তাঁর তুলনায় খুব কম।

সুরেন্দ্র একত্রিশ সংজ্ঞা সবে বারো। স্ত্রীকে পরম স্নেহে গ্রহণ করলেন সুরেন্দ্র। শুরু করলেন লেখাপড়া শেখাতে। তিনি নিজে খুব ভালো অনুবাদ করতে পারতেন। ইংরেজি বই খুলে একবারও না থেমে এমন সহজ বাংলায় বলে যেতেন যে বোঝাই যেত না মুখে মুখে অনুবাদ করছেন। ক্রমে সংজ্ঞাও শিখলেন অনুবাদ কবতে। না, ইংরেজি গল্প নয় তিনি গোটাকতক জাপানী গল্প অনুবাদ করেন। তার মধ্যে দুটো গল্প 'মৎসুয়ামার আয়না' ও 'ইউরিশিমা' ছাপা হয় 'পুণ্য' পত্রিকায। হয়তো এ অনুবাদে সুরেন্দ্রেরও হাত ছিল নয়তো প্রথমেই অমন সহজ স্বচ্ছ সাবলীল ভঙ্গীটি আয়ত্ত করা কঠিন। সংজ্ঞার অনুবাদকে তর্জমা বলে মনেই হয় না। তিনি আরো একটু উৎসাহী হলে আরো কিছু জাপানী গল্পের অনুবাদ সেযুগেই আমাদের হাতে এসে পৌঁছতো।

ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য বৌয়েদের মতো সংজ্ঞাও ভালো অভিনয় করতে পাবতেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে চলে গেলেও অভিনয়ের জন্যে প্রায়ই ডাক পড়তো বাড়ির মেয়ে-বৌয়েদের। অভিনয়ে তাঁদের দক্ষতা তখন কিংবদন্তী। শান্তিনিকেতনের শিল্পীগোষ্ঠী ভালো করে তৈরি হয়নি। কলকাতায 'বিসর্জনে'র অভিনয় হবে। তোড়জোড় চলছে। কবির বয়স হার মানলো তাঁর উৎসাহের কাছে। তিনি নিজে সাজলেন জয়সিংহ। অপর্ণার ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করলেন সংজ্ঞার এক মেযে মঞ্জুশ্রী। আর সংজ্ঞা নিজে সাজলেন গুণবতী। এ অভিনয় ঘরোয়া মঞ্চে বা জোড়াসাঁকোর উঠোনে সখের অভিনয় নয়। রীতিমতো টিকিট বিক্রী করে এম্পায়ার থিযেটারে তিন দিন অভিনয় হয়। প্রত্যক্ষদর্শী সৌম্যেন্দ্রনাথের ভাষায় "গুণবতীর ভূমিকায আমার কাকী সংজ্ঞাদেবীব অভিনয় হযেছিল অনবদ্য।" কিন্তু যেমন সাহিত্যচর্চা তেমনি অভিনয়—দক্ষতা থাকলেও কোন কিছুতে মন ছিল না সংজ্ঞার। কোথায় যেন ছিল আশ্চর্য নিরাসক্তি। জ্ঞানদানন্দিনী অভিযোগ করতেন কিন্তু প্রশ্রয় ছিল সুরেন্দ্রের। তিনি সংজ্ঞাকে সঙ্গে কবে নিয়ে গিয়েছেন ভগিনী নিবেদিতার কাছে।

প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর আধ্যাত্মিকতার অধিকারী হয়েছিলেন সংজ্ঞা। সংসারের আসক্তি কমে আসে। বড়ো ঘর বিপুল সংসার—শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামী ছটি সন্তান

নিয়ে ভরাভর্তি সুখ তবু আসক্তির বন্ধনটা যেন সংজ্ঞার জীবনে শিথিল হয়ে আসে। তারপর আসে একটা পরমলগ্ন। ডায়মণ্ডহারবারে নদীর ঢেউ দেখতে দেখতে তিনি এক দিব্য অনুভূতি লাভ করলেন। এক উজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডল যেন তাঁকে দিল এক পরম আনন্দময় চিন্ময় সত্তার সন্ধান। চির বৈরাগ্যের সুর এসে বাজলো সংজ্ঞার মনে।

পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। স্বামীর মৃত্যুর পর সংজ্ঞা সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন চির বৈরাগী সাধুদের চরণচিহ্ন অনুসরণ করে। এলাহাবাদে ঈপ্সিত গুরু সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন সংজ্ঞা। গৃহজীবনের শেষ বন্ধন নামটুকুও জীর্ণ পাতার মতো খসে পড়লো তাঁর জীবন থেকে। মুছে গেল ঠাকুরবাড়ির বৌটির পরিচয়। এখন তিনি স্বরূপানন্দ সরস্বতী। মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকধারিণী সংজ্ঞা হরিদ্বারে পেলেন নতুন জীবন। তারপর থেকে এখনো চলেছে তাঁর অবিরাম তীর্থভ্রমণ, সাধুসঙ্গ, আশ্রমবাস ও বাঞ্ছিতের সন্ধানে অন্বেষণ!

এবার বলেন্দ্রের স্ত্রী সাহানার কথায় আসি। মাত্র তেরো বছরে বিয়ে হয়েছিল তাঁর এবং ষোলো বছরেই সব সাধ আহ্লাদ ঘুচিয়ে বিধবার শুভ্র সাজে সাজতে হলো তাঁকে। দিন বদলেছে। তাই সাহানার বাবা ভেবেছিলেন মেয়ের আবার বিয়ে দেবেন। কিন্তু বিধবা বিবাহে মহর্ষির ঘোর আপত্তি। সম্মতি ছিল না উদারচেতা ঠাকুরবাড়ির একজনেরও। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্ণৌ গেলেন সাহানাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনতে। অথচ এর কয়েক বছর পরেই তিনি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে নিজের মত পাল্টান। সাহানার দুঃখ কোনদিনই ঘোচেনি। শ্বশুরবাড়িতে ফিরে এসে তিনি মন দিলেন লেখাপড়ায়। স্কুলের পড়া শেষ করে পাড়ি দিলেন বিলেতে। ইচ্ছে ছিল হাতে-কলমে কিছু ট্রেনিং নিয়ে আসা। এ সময় বাঙালী মেয়েদের অনেকেই বিলেত যাচ্ছেন। সরলাবালা মিত্র সরকারী বৃত্তি নিয়ে কিংবা কুচবিহারের রাজকন্যা প্রতিভা ও সুধীরা এবং লর্ড সিন্‌হার মেয়ে রমলা নিছক বেড়াবার উদ্দেশ্যে বিলেত পাড়ি দিচ্ছেন। সাহানাও

গয়েছিলেন। কোথাও কোন আলোড়ন না তুলে তিনি আবার কিছুদিন পরেই দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে ফিরে আসেন। সাহানার কথা ঠাকুরবাড়ির কেউ কোনদিন ভাবেননি, এমনকি রবীন্দ্রনাথও নয়। 'একথা ভাবলে সত্যিই কষ্ট হয়। মনে হয় সকলের নিষ্ঠুর ঔদাস্যে সায়াহ্নের সকরুণ সাহানা হারিয়ে গেলেন অকালে।

প্রতিমা ঠাকুরবাড়িরই মেয়ে আবার ঠাকুরবাড়িরই বৌ। পাঁচ নম্বর আর ছ নম্বর, যারা কাছেই ছিল তাদের আবো কাছে এনে দিলেন তিনি। আসলে প্রতিমা বিনয়িনীর মেয়ে। সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটিকে দেখে কবিপত্নী মৃণালিনীর খুব ভালো লেগেছিল। অন্তরঙ্গদের বলেছিলেন, "এই সুন্দর মেয়েটিকে আমি পুত্রবধূ করবো। আশা করি ছোট দিদি তার নাতনীটিকে আমায় দেবেন।"

অতি অকালে চলে যাওযায় মৃণালিনী তার ইচ্ছেকে কাজে পরিণত করতে পারেননি। তাই মুখ ফুটে কিছু বলার আগেই প্রতিমার বিয়ে হয়ে যায় গুণেন্দ্রের ছোটবোন কুমুদিনীর ছোট নাতি নীলানাথের সঙ্গে। তখন প্রতিমার বয়স সবে এগারো। এবাড়ির মেয়েদের একটু ছোট বয়সেই বিয়ে হতো, প্রতিমারও হলো।

ফাল্গুন মাসে বিয়ে হলো। বৈশাখ মাসে শুভদিন দেখে প্রতিমাকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নিয়ে গেলেন। তার কয়েকদিন যেতে না যেতেই গঙ্গায় সাঁতার কাটতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হলো নীলানাথের। শ্বশুরবাড়ি থেকে অপয়া অপবাদ নিয়ে ফিরে এলেন প্রতিমা। এ ঘটনার পাঁচ বছর পরে, রথীন্দ্র বিলেত থেকে ফিরলে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমার পুনর্বিবাহ দেবার প্রস্তাব করেন। স্ত্রীর মনোবাসনা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না তাছাড়া বিধবা বিবাহের প্রতিবন্ধক মহর্ষি ও সৌদামিনী তখন দুজনেই পরলোকে। কবিও বাল্যবিধবাদের অবহেলিত জীবন ও দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করছিলেন। ঠিক সেই সময় ঢাকার গুহঠাকুরতা পরিবারের মেয়ে লাবণ্যলেখাও বিধবা হয়ে ফিরে এলেন। কন্যাসমা এই মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে আবার সংসারে ফিরিয়ে আনা যাবে না কি? কবি পূর্বসংস্কার ভাঙবার জন্যে প্রস্তুত হলেন এবং তখনই স্থির করলেন নিজের ছেলের বিয়ে দেবেন বিধবার সঙ্গে। এছাড়া সমাধানের কোন পথ নেই। তিনি

নিজে যদি নিজের ছেলের বিয়ে কোন বিধবার সঙ্গে না দেন তাহলে অন্য লোকে দেবে কেন? তিনি গগনেন্দ্রকে মনের কথা জানালেন:

"তোমাদের উচিত প্রতিমার আবার বিয়ে দেওয়া। বিনয়িনীকে বলো যেন অমত না করে। ওর জীবনে কিছুই হলো না। এ বয়সে চারদিকের প্রলোভন কাটিয়ে ওঠা মুস্কিল। এখন না হয় মা বাপের কাছে আছে। এর পরে ভাইদের সংসারে কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকবে সেইটাই কি তোমাদের কাম্য? না, বিয়ে দেওয়া ভালো, সেটা বুঝে দেখ।"

উদারহৃদয় গগনেন্দ্র তখনই রাজী হলেন। কিন্তু সমাজ রয়েছে। সমাজের কি সম্মতি পাওয়া যাবে? এ তো ব্রাহ্মসমাজ নয়। বিদ্যাসাগর ১৮৫৬তে বিধবা বিবাহকে কাগজে কলমে বৈধ করে গিয়েছেন। সমাজ সংস্কারের হিড়িকে কিছু বিধবার বিবাহ হয়েওছে কিন্তু সাধারণভাবে এখনো সমাজে কেউ মেনে নিয়েছে কি? বিনয়িনী ভয় পেলেন:

"আমাকে যে সমাজে একঘরে ঠেলবে। আমার আরও ছেলেমেয়ে আছে তাদের বিয়ে দিতে হবে।"

ভয় পেলেন না গগনেন্দ্র। বললেন, "তোমাদের ভয় নেই। তোমাদের পেছনে আমি আছি। তোমায় সমাজ ত্যাগ করলে আমিও সমাজ ত্যাগ করবো।" সমাজকে অগ্রাহ্য করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিমার বিয়ে দিলেন গগনেন্দ্র। ঠাকুরবাড়িতে প্রথম বিধবা বিবাহ। অবশ্য ঠিক ঠাকুরবাড়ি বলা চলে না। মাত্র কয়েকমাস আগে পাথুরেঘাটা-ঠাকুরবাড়ির মেয়ে ছায়ার বিধবা বিবাহ হয়েছে। জোড়াসাঁকোতে প্রথম বিয়ে হলো রথীন্দ্র ও প্রতিমার। কবি এর পরে লাবণ্যলেখার বিয়ে দিয়েছিলেন প্রিয় শিষ্য অজিত চক্রবর্তীর সঙ্গে। গগনেন্দ্রের ইচ্ছে ছিল তাঁর নিজেব বিধবা পুত্রবধূ গেহেন্দ্রের স্ত্রী মৃণালিনীরও আবার বিয়ে দেবেন। মৃণালিনীর প্রবল আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি।

প্রতিমার বিয়েতে সামাজিক বাধা কিছু এসেছিল। ঠাকুর পরিবারের কোন শরিক নিজের বাড়ির উৎসবে রবীন্দ্র-পরিবারকে নিমন্ত্রণ করেননি এই সব। এদিকে বেশি মনোযোগ না দেওয়ায় সব ঝড় কেটে গেল। রবীন্দ্র-পরিবারে

]হলক্ষ্মী হয়ে প্রবেশ করলেন প্রতিমা ; রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের 'মা-মণি', তাঁর নাদরের 'ব্রাইড মাদার' (বৌমা)। দীর্ঘ বত্রিশ বছর ধরে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সেবা করে গিয়েছেন প্রতিমা। সেই সঙ্গে চলেছে আশ্রমের দেখাশোনা আর অতিথি সেবার কাজ। কবির সেবা করা খুব সহজ কাজ ছিল না। প্রতিমা করেছেন অসীম ধৈর্য নিয়ে।

শুধু সেবা নয় প্রতিমা শিল্পক্ষেত্রে রেখে গেছেন অনেক। তাঁর যা কিছু শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের কাছেই। সেই শিক্ষা তাঁর প্রতিভার স্পর্শে নতুন রূপ নিলো। চলে যেতে যেতে রেখে গেল ঠাকুরবাড়ির মেয়ের আরো কিছু অসামান্য দান। প্রতিমা দুই পরিবারের শিক্ষা সংস্কৃতি নিয়ে এসেছিলেন। নিয়ে এসেছিলেন কল্যাণশ্রীর সঙ্গে আশ্চর্য নিরাসক্তি। তিনি ভালো লিখতে পারতেন, পারতেন ভালো ছবি আঁকতে। তাঁর লেখা 'গুরুদেবেব ছবি' ববীন্দ্রনাথের চিত্র বিচারের মাপকাঠি। বাস্তবিক চিত্র বিচারে প্রতিমা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলাকে তিনভাগ করে প্রতিমা দেখিয়েছেন কবির আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জীবজন্তু যেমন ফরাসী জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তেমনি মানুষের মুখের প্রতিকৃতি মনোহরণ করেছিল জার্মানদের। কিন্তু আসলে এসব ছবিকে বিশ্লেষণ করা চলে না। সৃষ্টির এমন এক সত্যকে এরা অনুভূতি দিয়ে প্রকাশ করছে যার ব্যাখ্যা চলে না। "দিব্যদৃষ্টি দিয়ে কেউ যদি সে জিনিষ ধরতে পাবলো তো বুঝলো, নইলে খনির ভিতর মণির মতো তার দীপ্তি রইলো ঢাকা।" রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে ছবি আঁকলেন দু হাজারেরও বেশি। ছবি তাঁর 'শেষ বয়সের প্রিয়া'—জীবন-নাট্যাঙ্কে যে নায়িকা আসে সে যেন সবচেয়ে বেশি অভিনিবেশ দাবি করে। চোখের সামনে বুঝি ফুটে উঠলো আর একটা জগৎ, রঙে-রেখায় কবি তাকে স্পষ্ট করে তুললেন। রবীন্দ্রনাথের এই ছবি আঁকার কথা লিখেছেন প্রতিমা। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথ কবিতায় যেমন একটা সৃষ্টির সম্পূর্ণ চেহারা দিয়েছেন চিত্রেও তেমনি বস্তুপ্রবাহের আবর্তনের ইতিহাস এঁকেছেন। "গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে যে ঘূর্ণ্যমান গতি তেজের চাপে রচনার কাজে নিরন্তর নিযুক্ত, তারি জোয়ার ভাঁটার টানে রেখা হতে রেখান্তরে প্রাণী ও জড়জগতের চেহারা ছাঁচে ঢালাই হয়ে বেরিয়ে

আসছে। শিল্পীর মনে লেগেছিল সেই স্রোতের ঢেউ। ব্যক্তিত্বের রসে মজে তাই তুলির টানে বেরিয়ে এলো রূপ হতে রূপান্তরে সৃজিত অপরূপ মানুষ পশুপক্ষী ও দৃশ্য।"

এ তো গেল প্রতিমার চিত্র সমালোচনার কথা। প্রতিমা নিজেও ভালো ছবি আঁকতেন। কিছু শিখেছিলেন ইতালিয়ান শিক্ষক গিলহার্ডির কাছে। কয়েকটি ছবিতে তাঁর দক্ষতার পবিচয় পাওয়া যাবে। ছবির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো কথার ছবি আঁকা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছদ্মনাম দিলেন 'কল্পিতাদেবী'। এই নামে প্রতিমা অনেক কবিতা লেখেন 'প্রবাসী'তে। প্রতিটা লিখেই তিনি দেখাতে যেতেন কবিকে। বুক ঢিপঢিপ করতো ভয়ে। কি জানি হয়তো হয়নি। অথচ না দেখিয়েও তৃপ্তি নেই। কবি বেশ মন দিয়েই দেখতেন। মাঝে মাঝে কলম চালিয়ে তাতে এনে দিতেন ঔজ্জ্বল্যের দীপ্তি। আবার কখনও কখনও প্রতিমার লেখা কবিতাটাকেই ভেঙেচুরে নতুন করে লিখে দেখাতেন কাব্যভাষা বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটাই কেমন নতুন হয়ে ওঠে। যেমন ধরা যাক্ 'স্মৃতি' কবিতাটা। প্রতিমা লিখলেন :

"এই গৃহ এই পুষ্পবীথি
যারে ঘেরি একদিন তোমার কল্পনা
গড়েছিল ইমারত দীপ্তি গরিমার,
উত্তপ্ত কামনা তব যার প্রতি ধূলির কণায়
জীবন্ত করিয়াছিল তব মুহূর্তেরে।
যে বাসনা মনে ছিল পুরিল না
অবসন্ন প্রাণ
গেল চলে ছায়া ফেলে অঙ্গনে প্রাঙ্গণে।"

রবীন্দ্রনাথ ভাষা বদলে লিখলেন :

"এই ঘর এই ফুলের কেয়ারি
একে ঘের দিয়ে তোমার খেয়াল
বানিয়েছিল পরীস্থানের ইমারৎ।

তোমার তপ্ত কামনা

রাঙিয়েছিল তার প্রত্যেক ধূলিকণাকে

তার প্রত্যেক মুহূর্তকে করেছিল তোমার আবেগ দিয়ে অস্থির।

তুমি চলে গেলে,

অকৃতার্থ আকাঙ্ক্ষার ছায়া ভেসে বেড়াচ্ছে

অঙ্গনে প্রাঙ্গণে।"

কবির সঙ্গে কল্পিতার এই ধরণের কবির লড়াই প্রায়ই হতো। তাব গদ্য রচনাতেও চোখে পড়বে 'লিপিকা'র বিশিষ্ট ভঙ্গী। সে যেন গদ্য নয়, গদ্য কবিতা। 'নটী', 'মেজবৌ', '১৭ই ফাল্গুন', 'সিনতলা দুর্গ' সবই এক সুরে বাঁধা। প্রতিমার লেখা 'স্বপ্নবিলাসী' পড়ে কবি মুগ্ধ হযে লেখেন 'মন্দিরাব উক্তি'। পুত্রবধূকে অনুরোধ করেন তার পরেব অধ্যায় 'নরেশের উক্তি' লিখতে। অর্থাৎ কবি লিখবেন 'নারীর উক্তি' আর প্রতিমা লিখবেন 'পুরুষেব উক্তি'। কিন্তু কবির সঙ্গে হাত মিলিযে গল্প লেখা? কল্পিতা রণে ভঙ্গ দিলেন।

এছাড়া প্রতিমা লিখেছেন কিছু স্মৃতিকথা। মায়ের ডায়বি 'কাহিনী' অবলম্বনে লেখা হয 'স্মৃতিচিত্র'। এতে বেশ পাঁচ নম্বব বাড়ির মেয়েদের কথা আছে। যেমন উৎসবের সাজের কথা। দেবেন্দ্র পরিবারে মূর্তি পূজো বন্ধ হযে গেলেও গায়ে লাগানো পাশের বাড়িতে বেশ ঘটা-পটা করেই দোল-দুর্গোৎসব হতো। হবে নাই বা কেন? তখনকার কলকাতায় এই তো ছিল দস্তুর। প্রতিমা লিখেছেন:

"প্রতি উৎসবেই মেয়েদের তখন বিশেষ সাজ ছিল। বাসন্তী রঙে ছোপানো কালো পেড়ে শাড়ি, মাথায় ফুলের মালা, কপালে খয়েবের টিপ—এই ছিল বসন্ত পঞ্চমীর সাজ। দুর্গোৎসবে ছিল রঙবেরঙের উজ্জ্বল শাড়ি, ফুলের গয়না, চন্দন ও ফুলের প্রসাধন।

"দোল পূর্ণিমারও একটি বিশেষ সাজ ছিল, সে হলো হালকা মসলিনের শাড়ি, ফুলের গয়না আর আতর গোলাপের গন্ধমাখা মালা। দোলের দিন শাদা মসলিন পরার উদ্দেশ্য ছিল যে আবিরের লাল রঙ শাদা ফুরফুরে শাড়িতে রঙিন বুটি ছড়িয়ে দেবে।"

প্রতিমার বিবরণে গয়নার কথা নেই। গগনেন্দ্রের ছোট মেয়ে সুজাতা আমাদের জানিয়েছেন, সে সময় দিনে সোনার গয়না, বিকেলে মুক্তোর গয়না এবং রাতে হীরে জহরতের জড়োয়া গয়না পরার রেওয়াজ ছিল। বিয়েবাড়িতে কিংবা উৎসবের দিন তাঁরা এভাবেই সাজতেন। দিনের সোনালি আলোয় সোনার জৌলুষ বাড়ে, রাতের আলো হীরে জহরতে ঠিকরে পড়ে, শুধু মুক্তোর ভূমিকাটাই তেমন স্পষ্ট হলো না। বিকেলের আলো-আঁধারি আর মন-কেমন-করা গোধূলি আলোয় মুক্তোই বোধহয় সবচেয়ে ভালো দেখায়।

প্রতিমার আসল অবদান কিন্তু ছবি আঁকা বা লেখা নয়, শান্তিনিকেতনে মেয়েদের জন্যে নাচ শেখাবার ব্যবস্থা করা। যদিও বাঙালীদের মধ্যে নাচ শেখার একেবারেই কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেকালে স্টেজের ওপর তাল রেখে দু পা চলাও ছিল রীতিমতো লজ্জার কথা। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' বা 'মায়ার খেলা'র সবটাই ছিল অভিনয়। সামান্য হাত নেড়ে একটু আধটু নাচের এফেক্ট আনার চেষ্টা করা হতো। তবে দিন বদলাচ্ছে। মেয়েরা এগিয়ে এসেছেন সব কাজে উৎসাহ নিয়ে। নাচেই বা পিছিয়ে থাকলে চলবে কেন? শান্তিনিকেতনে এই পরীক্ষা চালানোও অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ। তাই আগ্রহী হযে উঠলেন প্রতিমা। নিজে তিনি মঞ্চে উপস্থিত হননি কিন্তু যে কোন রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের তিনিই ছিলেন প্রাণ। রবীন্দ্রনাথের নিজের মনেও 'চিত্রাঙ্গদা', 'পরিশোধ' নিয়ে নৃত্যনাট্য রচনার পরিকল্পনা ছিল না। প্রতিমাই একটা খসড়া খাড়া করে কবির কাছে নিয়ে গেলে তিনি এই নতুন শিল্পরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন।

কিন্তু নাচ কে শেখাবে? শান্তিনিকেতনে কিভাবে শেখানো হবে? এ দেশের চোখ নাচ দেখতে অভ্যস্ত নয়। তাতে কি? প্রতিমা শুরু করলেন দুরূহ সাধনা। তিনি নিজে নৃত্যশিল্পী নন, কোনদিন নাচ শেখেননি। অসাধারণ শিল্পবোধের সাহায্যে তাঁকে এগোতে হয়েছে। তবে বাঙালী যে এ সময় নৃত্য সচেতন হয়ে উঠেছে তার ইতস্তত: প্রমাণ দেখা যেতে লাগলো উদয় শংকরের আবির্ভাবে। অবশ্য তখনও তাঁর নৃত্যসঙ্গিনী কোনো ভারতীয়া নন, বিদেশিনী সিমকি। ভদ্রঘরের বাঙালী মেয়েদের নাচের পথ দেখিয়েছেন রেবা

রায়। য়ুনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে ঋতুচক্রের আয়োজন করেছিলেন সৌম্যেন্দ্র-নাথ ও আরো অনেকে। উৎসবের শেষ গান "যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে" শুরু হতেই রেবা হঠাৎ গানের দল থেকে বের হয়ে এলেন উল্কার মতো স্টেজের মাঝখানে, গানের হালকা ছন্দের সঙ্গে শুরু করে দিলেন চপল নৃত্য! কাণ্ড দেখে সবাই তাজ্জব! চোখ কপালে উঠে গেল। ছি ছি ছি, ভদ্রঘরের মেয়েরা আবার নাচে নাকি? বিষোদ্গারে কান পাতা দায়। এর উত্তর দিলেন সৌম্যেন্দ্র আরো কয়েকদিন পরে। জোড়াসাঁকোর বাড়ির উঠোনে "নূপুর বেজে যায় রিণি রিণি'র সঙ্গে নাচলেন তিনটি ছোট মেয়ে চিত্রা, নন্দিতা ও সুমিতা। এর বছরখানেক পরে রবীন্দ্র-নাথ মঞ্চস্থ করলেন 'নটীর পূজা'। এই সময় ভদ্রঘরের মেয়েদের নাচার পথ আরো সুগম করে দিলেন কেশব সেনের নাতনীরা। ১৯২৮ সালে ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশনের সাহায্যের জন্যে মঞ্চস্থ করা হলো 'শ্রীকৃষ্ণ'। কৃষ্ণের বাল্যরূপ দিলেন নীলিনা আর তার পরবর্তী জীবন রূপায়ণের ভার পড়লো সাধনার ওপর। সাধনা পরবর্তী জীবনে মধু বসুকে বিয়ে করেন ও মঞ্চে-পর্দায় অনেকবার নর্তকী-রূপে উপস্থিত হন। সাধনা শিখেছিলেন ভালো কথক নাচ। 'আলিবাবা', 'রাজনর্তকী', 'দালিয়া' তাঁর অভিনয়ের সাক্ষ্য হয়ে আছে। যাক সে কথা।

প্রতিমা শান্তিনিকেতনে যা শেখাচ্ছিলেন তাকে ভাবনৃত্য বলাই উচিত। 'বর্ষামঙ্গলের' দু একটা নাচে কিছু রূপ দেবার পর প্রতিমা কবিকে 'পূজারিণী' কবিতার নৃত্যনাট্যরূপ লিখে দিতে অনুরোধ করেন। শুধু মেয়েদের দিয়ে সেটি অভিনয় করাবেন কবির জন্মদিনে। লেখা হলো 'নটীর পূজা'। দিনরাত খেটে প্রতিমা মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করালেন। শ্রীমতীর ভূমিকায় অপূর্ব নৃত্যাভিনয় করে চিরস্মরণীয়া হয়ে রইলেন নন্দলাল বসুর মেয়ে গৌরী। এ অভিনয় আরো পরের ব্যাপার।

দীর্ঘ চোদ্দ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রতিমা রাবীন্দ্রিক নৃত্যনাট্যের পাকা রূপ ফুটিয়ে তুললেন 'চিত্রাঙ্গদা'য়। অবশ্য এর আগে এসেছে 'শাপমোচন'। নৃত্য নিয়ে প্রতিমা যে কত ভেবেছেন তার পরিচয় আছে তাঁর লেখা 'নৃত্য'

বইখানিতে। 'চিত্রাঙ্গদা'তে যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠলো তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো 'চণ্ডালিকা'তে। এই বৈশিষ্ট্য কি? যা অন্য নৃত্য থেকে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যকে পৃথক করে রেখেছে। উদয় শংকরের নাচ তখন অনেকে দেখেছেন, দেখেছেন সাধনা বসুর নাচের ধারা। এমন কি শ্রীমতীও মডার্ণ ডান্সের আঙ্গিকে পরীক্ষামূলক-ভাবে রবীন্দ্র কবিতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন তাঁর ভাবনৃত্য। 'চিত্রাঙ্গদা' প্রথম মঞ্চায়িত হলো ১৯৩৬ সালে নিউ এম্পায়ারে। এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত 'চিত্রাঙ্গদা'র অভিনয় হয় চল্লিশবার। এ হিসেব শান্তিদেব ঘোষের রচনা থেকে পাওয়া, তিনি থাকতেন নাচ ও গান উভয় দলেই। অর্জুন, কুরূপা ও সুরূপা চিত্রাঙ্গদা সাজতেন নিবেদিতা, যমুনা ও কবির দৌহিত্রী নন্দিতা। অন্তরালে থাকতেন প্রতিমা। সমস্ত পোষাক-পরিচ্ছদ-সাজ তাঁর নির্দেশেই পরানো হতো। প্রতিমার নিজের মতে রাবীন্দ্রিক নৃত্যনাট্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য সংমিশ্রণ। শান্তিনিকেতনের নৃত্য কোনো বিশিষ্ট নৃত্যকলার আঙ্গিককে গ্রহণ করেনি। মিশ্র তাল ও ভঙ্গীর সহযোগে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হয়েছে। তাই মণিপুরী আঙ্গিকে গড়ে ওঠা 'চিত্রাঙ্গদা'র নাচ সমস্ত মণিপুরে খুঁজে পাওয়া যাবে না। দক্ষিণী আঙ্গিকে তৈরি 'চণ্ডালিকা'কেও চেনা যাবে না দক্ষিণী নাচের মধ্যে। মিশ্রণের এমনি গুণ। এর পর এই মিশ্র নৃত্যকে দাঁড় করানো হলো সংগীতের ভিত্তির ওপর। "সেইটেই হলো শান্তিনিকেতনের নতুন দান। এই সংগীতযোগে নৃত্যের পূর্ণবিকাশ আমাদের প্রাচীন নৃত্যে দেখা যায় না।"

রবীন্দ্র-নৃত্যের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য রক্ষার কথাও ভেবেছিলেন প্রতিমা। তাই গানের স্বরলিপির মতো নৃত্যলিপির কথাও তাঁর মনে আসে। শিল্পী হারিয়ে যাবে। শিল্প হারাবে না। শিল্প যে অবিনশ্বর! রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে যে শিল্প নৃত্যরূপ লাভ করলো তার মধ্যে আছে আপন স্বকীয়তা। একে যদি ধরে না রাখা হয় তাহলে যে হারিয়ে যাবে সেই নয়ননন্দন ভঙ্গিমা। তাই প্রতিমা আশ্রমের নতুন মেয়েদের নিয়ে নাচের ক্লাস করতেন। নাচের বোল ছাত্রীদের লিখে রাখতে বলতেন এবং কলাভবনের শিল্পীদের দিয়ে নৃত্যের ভঙ্গী আঁকিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন।

রবীন্দ্রনাথকে প্রতিমা যত গভীরভাবে বুঝতেন ততখানি বোধহয় কেউ বোঝেননি। রথীন্দ্রের সঙ্গে কবির আদর্শগত মতবিরোধ হতো। কিন্তু প্রতিমার সঙ্গে নয়। তাই কবির শেষজীবনের অনুপুঙ্খ ঘটনায় পূর্ণ 'নির্বাণ' প্রতিমার হাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। এমন নির্লিপ্ত মৌখিক ভঙ্গীতে তিনি কবির সর্বশেষ পর্যায়টি বর্ণবিরল পরিচ্ছন্ন কয়েকটি হালকা রেখার টানের মতো ফুটিয়ে তুলেছেন যা নিজে না পড়লে বোঝা যায় না। শান্তিনিকেতনে তিনি নারীশিক্ষা ও নারী-কল্যাণের দিকটাও দেখতেন। মেয়েদের নিয়ে গড়েছিলেন 'আলাপিনী সমিতি'। ইন্দিরা ও হেমলতা ছাড়াও সেখানে ছিলেন সুকেশী, কমলা, মীরা ও আরো অনেকে। তেঁতুলতলায় ছোট চৌকি পেতে বসে তিনি বোলপুরের মেয়েদের শেখাতেন গান, বলতেন গল্প। চারপাশের গ্রামে কাজ করা পছন্দ করতেন রবীন্দ্রনাথ। তাই প্রতিমার ব্যবস্থায় আশ্রম থেকে মেয়েরা পালা করে যেতেন গ্রামে—কখনো হেঁটে কখনো গরুর গাড়ি চড়ে। গ্রামের অশিক্ষিতা মেয়েদের তাঁবা শেখাতেন, কি করে স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি করা যায়, শরীর ভালো করা যায় কিংবা টুকিটাকি হাতের কাজ করে তা থেকে দু পয়সা উপার্জন করে সংসারের সাশ্রয় হয়—এইসব!

'আলাপিনী সমিতি'র আরেকজন সভ্যা ছিলেন দিনেন্দ্রনাথের স্ত্রী কমলা। এরকম আমুদে, সবার সুখে সুখী মেয়ে খুব কমই ছিল। এখনো শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের মানুষেরা কমলা বৌঠানের কথায় খুশি হন। বলেন, "তার মতো মানুষ হয় না। খুব আদর যত্ন করতেন।" আসলে এক একজন মানুষ থাকেন যাঁরা অনেক কিছু না করেও জুড়ে থাকেন মনের অনেকখানি, কমলা ছিলেন তাই। কবির সঙ্গেও তাঁর মধুর সম্পর্ক। পরিবারের সবচেয়ে বড়ো নাতবৌ। সেই সুবাদে কবি প্রায়ই ঠাট্টা-তামাশা করে লজ্জা দিতেন কমলাকে। সবার মাঝে হঠাৎ কমলাকে ডেকে পাশে বসিয়ে বলতে শুরু করে দিতেন,

"কমল তুমি এইখানটিতে বোসো। তোমার সঙ্গে আমার যে খুব ভাব, তা না-হয় ওরা দেখতেই পাবে, না-হয় কলকাতায় গিয়েই বলে দেবে।"

'ওরা' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে সীতা ও শান্তা। আরেক দিনের কথা। তারও সাক্ষী সীতা। রবির সঙ্গে কমলের সম্বন্ধটি নিয়ে কবি প্রায়ই ঠাট্টা করেন। তাঁর গানে ঘুরে ফিরে যে 'কমল' কথাটা আসে কেন কে জানে? একজন জানালেন, দিনেন্দ্রনাথ নাকি এতে আপত্তি করছেন কারণ গান শেখাতে গেলে গানে 'কমল' কথাটা থাকলে ছেলেরা হাসে। কবি জানেন সবই। ছেলেদের হাসির কারণ যে কবি নন স্বয়ং দিনেন্দ্র, তাও জানেন। তাই কবি গম্ভীর হবার ভান করে বলেন, "দোষটা মেয়েদেরই। তারাই এ কথাটা ছড়িয়েছে।"

'আলাপিনী সমিতি'র নিজস্ব কাগজ ছিল 'শ্রেয়সী'। একদিন শোনা গেল কমলা তার জন্যে একটা গল্প লিখেছেন। কবির মহা উৎসাহ। কেমন গল্প? গল্পের মধ্যে কটা বিয়ে আছে? নেই? বিয়ে ভাঙাও নেই? কমলাকে বললেন, "তুমি কোনো কর্মের নয়, বিয়ে একটা দিয়ে দিতে পারলে না?"

এরপব প্রতিমা বলে দিলেন, "গল্পের নায়ক একজন কবি।" আর যায় কোথায়! কবি অত্যন্ত চটে ওঠার ভান করে বললেন, "এ নিশ্চয় আমাকে লক্ষ্য করে লেখা, যাও, তোমাব সঙ্গে আর কোনো কথা নয়—"

'শ্রেয়সী' পত্রিকার সব কটা সংখ্যা আর পাওয়া যায় না। যে কটি আছে তাতে কমলার গল্পটি পাওয়া যাযনি, শুধু একটিমাত্র লেখা পাওয়া গেছে। গল্প নয়, ছোট্ট একটি রচনা 'গান'। মনে হয় এতে তাঁর স্বামীর হাতই বেশি। দিনেন্দ্রনাথ শুধু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভাণ্ডাবী ছিলেন না নিজেও কবিতা লিখতেন। তাঁর প্রথম কবিতাব বইটা ছাপা হলো 'নীরব বীণা' নামে। বাঁকা মন্তব্য করলেন সুরেশ সমাজপতি, 'দাদামশাই আব নাতি এতো জোর নীরব বীণা বাজাচ্ছেন যে দুদিন পবে গড়ের মাঠে আর ব্যাণ্ড পার্টির দরকার হবে না।' লজ্জায় দুঃখে সব বই লুকিয়ে ফেললেন দিনেন্দ্রনাথ। তাঁর মৃত্যুব পবে সমস্ত অপ্রকাশিত রচনা একত্র করে সেগুলি প্রকাশ করে কমলা তাঁর কর্তব্য পালন করেন। 'গান'-এর ভাষা সহজ, সরল, প্রাণের ভেতরে প্রবেশ করে:

"গানের ভিতর দিয়ে আমরা আপনাকেই উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের ব্যথা আনন্দ-বিরহ মিলন এই সকলের সঙ্গেই গানের সুরেব অনির্বচনীয়তা মিশ্রিত

হয়ে তাদের অসীম সৌন্দর্য দান করে। অন্তরের বাহিরের এই সুরের দেওয়া নেওয়ার ভিতর দিয়েই আমরা বিরোধের মধ্যে ঐক্যকে আর বিচ্ছেদের মধ্যে মিলনকে লাভ করি।"

কবির আরো কয়েকজন নাতবৌ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন অমিতা ও অমিয়া ঠাকুর। শ্রীমতী কাছে এসেছিলেন বিয়ের অনেক আগে। তবে এঁরা সবাই এসেছেন বেশ পরে। বরং তার আগে একবার গুণেন্দ্র পরিবারের খোঁজ নিয়ে আসা যাক।

সৌদামিনীর তিন ছেলের বিয়ে হয়েছে। ঘরে এসেছেন প্রমোদকুমারী, নিশিবালা ও সুহাসিনী। নাতি নাতনীদের নিয়ে ভরা সংসার। ছেলের বৌয়েরা সাংসারিক কাজে সুনিপুণা। অতিথিসেবা, দেবপূজা, ছেলেমেয়েদের মানুষ করা, সংসারের কাজ দেখা সবই করেন তাঁরা। সৌদামিনী বালিশে আধশোয়া হয়ে সবই দেখেন আর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন। তাঁর নাতনীরা ঘর সংসারের চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে থেকেও জীবনকে সুন্দর করে তুলতে শিখেছিলেন। তাই বড়ো কিছু না করলেও এই পরিবারের মেয়েদের বুকে ছিল তৃপ্তির নিঃশ্বাস, শান্তির স্বাদ। অনেক পৌত্রী সৌদামিনীর। গগনেন্দ্রের তিন মেয়ে সুনন্দিনী, পূর্ণিমা ও সুজাতা; সমরেন্দ্রের পাঁচ মেয়ে মাধবিকা, মালবিকা, কমলা, সুপ্রিয়া ও অণিমা; আর অবনীন্দ্রের তিন মেয়ে উমা, করুণা ও সুরূপা। সবাই সমান গুণের নয় তবে ঘর সংসারের কাজে সবাই বেশ দক্ষ। সবার চেয়ে বড়ো হচ্ছেন উমা। তাঁর চেয়ে কয়েক মাসের ছোট সুনন্দিনী একেবারে পিঠোপিঠি বোন আর কি। এখন আর দুজনের কেউ নেই। অথচ কয়েক মাস আগেও ছিলেন উমা। ছিয়াশী বছর বয়সে অপটু দেহের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন এক প্রাণচঞ্চল দশ বছরের কিশোরীকে। কিশোরীটির মনে দুঃখ ছিল বেথুন স্কুলে ভালো রেজাল্ট করেও প্রাইজটা আনতে যাওয়া হয়নি বলে। যাওয়া হয়নি বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল তাই।

ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মতো উমারও নানা ধরণের গুণ ছিল। একবার

নাটকের রূপ দিয়েছিলেন বাবার লেখা 'ক্ষীরের পুতুল'কে। ঘরোয়া নাটকে মাঝে মাঝে অভিনয় করা ছাড়াও দুবার তিনি বেশ বড়ো মাপের অভিনয় করেছিলেন। একবার 'আলিবাবা' নাটকের মর্জিনা আর একবার 'বিরহে'র গোলাপী। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন সে নাটক। মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে জাভায় যেতে, যাওযা হয়নি। বাধা দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। বলেছিলেন, "উমা! ও কি পারবে অত ধকল সহ্য করতে?" কাজেই যাওয়া হলো না।

কলকাতায় বসে বসেই তিনি এই সেদিন পর্যন্ত কাঁপা কাঁপা হাতে বুনে গেছেন সুতোর নক্সা, মাকড়সা জালের মতো সূক্ষ্ম আঁকিবুঁকিতে ফুটে উঠেছে লতা-পাতা-কল্‌কা—সে যুগটাও যেন বাঁধা পড়ে আছে উমারাণীর সুতোর ফাঁসের বাঁধনে। সেলাই ফোঁড়াইযে উমার হাত বড়ো ভালো, তাঁর বোনেরাও কেউ কম যান না। সেকালের মেয়েরা সেলাই-টেলাই ভালোই শিখতেন, এখনও শেখেন কিন্তু তাব সঙ্গে উমার সেলাইয়ের পার্থক্য ছিল। তিনি ছিলেন শিল্পী-পিতার শিল্পী মেযে। মেয়ের সীবন-দক্ষতা বাবার মনে উৎসাহ জাগাতো। তিনি এঁকে দিতেন নানারকম নক্সা, সুতোর রঙের সাথে রঙ মিলিযে।

পশ্চিমবঙ্গে কাঁথার চল্ ছিল না, ছিল লেপ, বালাপোষ। পূর্ববঙ্গে ছিল কাঁথার বাহার। ঠাকুরবাড়ির বৌযেরা আসতেন যশোর থেকে। তাই তাঁরাও জানতেন নক্‌সী কাঁথা সেলাই কবতে। অবন ঠাকুর ছিলেন নক্‌সী কাঁথার সমঝদার। তিনি নানারকম কাঁথার নক্সা ও ফোঁড়নের নমুনা সংগ্রহ করে রাখতেন; উমা কাঁথায় তুলতেন সেইসব বয়কা-বাঁশপাতা-তেরসী সেলাই। এখনও সেসব কাঁথা আছে তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে। অনেক রকম নতুন স্টীচেরও উদ্ভাবক তিনি। তবে এসব তো লিখে রাখেননি তাই ছড়িয়ে পড়েনি দশ জনের মধ্যে। এসময় অনেকেই সেলাইয়ের বই লিখেছেন। তার মধ্যে তুষারমালা দেবীর 'কাট ছাঁট বুনন সূচের কাজ', সুশীলা দেবীর 'আদর্শ সূচী শিল্প', কাননবালা ঘোষের 'আদর্শ সূচীচিত্র', অপরাজিতা দেবীর 'সূচীচিত্র শিক্ষা', গায়ত্রী দেবীর 'সূচীলিখন', যমুনা সেনের 'সেলাইয়ের নক্সা', সুলেখা দেবীর 'সূচীরেখা', প্রকৃতি দেবীর 'চিত্রন', উমা দেবীর 'কাঠিয়াবাড়ী সেলাই ও কাচের কাজ', মীরা

দেবীর 'সচিত্র উল শিল্প' সেলাইয়ের বই হিসেবে স্বাতন্ত্র্য দাবি করে।

বৃদ্ধ বয়সে, হাতে যখন অনেক সময়, ক্ষীণদৃষ্টিতে সেলাই করা যায় না তখন উমারাণী শুরু করলেন স্মৃতিকথা লিখতে। কার কথা লিখবেন? কেন, বাবার কথা! উমার বইযেব নামও 'বাবার কথা'। অবনীন্দ্রনাথকে এত কাছে থেকে জানবার সুযোগ আর মিলবে না। শেষ বয়সে 'স্মৃতির আকার দিয়ে আঁকা' ছবিগুলো তিনি কারুর কথা ভেবে আঁকেননি। পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হয়েছিল লিখে বাখার কথা। তাহলে লেখাব রেললাইন বেয়ে হয়তো পৌছনো যাবে ছবির ইস্টিশানে। "আমার বাবা ছবি আঁকতেন, আমি লিখব পুরনো দেখা ছবির কথা।" এর মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা নেই, ইতিহাস নেই, এ শুধু এক নিতান্ত ঘরোয়া মেয়ের পিছন ফিরে চাওযা। তার মধ্যে সবার কথাই আছে, বাবার কথাই বেশি। কোন বিখ্যাত মানুষকে আমরা তাঁর আপনজনের দৃষ্টি দিয়ে যখন দেখি, নতুন করে আবিষ্কার করি। রবীন্দ্রনাথের সংসার, সোনার বোতাম পরা নিযে মৃণালিনীর সঙ্গে মতান্তর, রান্নার এক্সপেরিমেণ্ট, বাসর ঘরে গান কিংবা রোগশয্যায় স্ত্রীকে হাওয়া করাব মতো ঘটনাগুলো কি কোনো পুরুষের চোখে ধরা পড়তো? ধরা পড়েছিল হেমলতার চোখে। সেই কাকারই ভাইপো অবন। কাকা সোনার বোতাম পরতে চান না, ওপালে পাথর পরেন দায়ে পড়ে। ভাইপোই বা কম যাবেন কেন? খুঁটিনাটি নিয়ে তাঁবও আপত্তি। একটা ছোট্ট ছবি এঁকেছেন উমারাণী। একটা কাঁসার ঘটিতে জল খেতেন অবনীন্দ্রনাথ। সাবিত্রী ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তাঁব স্ত্রী তাঁকে একটি রূপোর ঘটি করিয়ে দিলেন। "কিন্তু বাবা কিছুতেই সে ঘটিতে জল খাবেন না। আমি তাই শুনে তাঁকে বল্লুম, 'মা দুঃখ পাবেন। তুমি কিছুদিন জল খাও, তাবপর আবার তুলে বেখে দিও।' তখন থেকে সেই ঘটিতে জল খেতে লাগলেন।

মা মাবা যাবার পর বাবা বললেন, 'ও ঘটি তোলো। চোব ডাকাতে লুটে নেবে। আমি সব সময় ও ঘটি সামলাতে পারবো না।' তারপব আব কখনো সে ঘটিতে জল খাননি।"

এখানেই মেয়েদের লেখা স্মৃতিকথাব সার্থকতা। এমন ঘরোয়া ছবি, খুঁটিনাটি

দেখবার চোখ মেয়েদেরই আছে। পুরুষ বড়ো প্রাণ, বড়ো মান, বড়ো কথার বেসাতি করে ; মেয়েরা পায় বিন্দুব মধ্যে সিন্ধুর স্বাদ ! ধনীর দুলালের সাদাসিধে জীবন কাটানোর সহজ অভ্যেস আর স্ত্রীর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা উমার আঁকা অবন ঠাকুরের এই ছোট্ট ছবিতে যতটা ফুটেছে একটা বিরাট প্রবন্ধে তত ভালো ফুটতো না। এরপর উমা বসেছিলেন নিজের আত্মকথা লিখতে। শেষ হবার আগেই শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। বেথুন স্কুলের শতবার্ষিকীতে সেই প্রাইজ পেয়েও না পাওয়া মেয়েটিকে প্রাইজ দেবার তোড়জোড় চলছিলো বোধহয়। কিন্তু উমারাণীর আর প্রাইজ নেওয়া হলো না এবারও।

উমার সঙ্গে তাঁর ছোট বোনের কথাও সেরে নেওয়া যাক। করুণার মৃত্যু হয়েছিল অল্প বয়সেই। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হযেছিল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের। দুটি ছোট ছোট ছেলেকে রেখে ওপাবে পাড়ি দিলেন করুণা। তাঁর ছোট বোনের নাম সুরূপা। খুব ছোটবেলাতেই 'ডাকঘরে'র সুধা মালিনী সেজে তিনি সবার মন কেড়ে নিয়েছিলেন। ডাকঘরের সেই প্রথম অভিনয়ে অমল সেজেছিলেন আশামুকুল। অভিনয় হয়েছিল চমৎকার। সুরূপাব মনে আছে অভিনয় হয়েছিল পাঁচ দিন। অভিনয়েব শেযে সবাই দুই শিশু অভিনেতাকে জড়িয়ে ধরে আদব করতেন। সুরূপা লিখেছেন, "আমাদের কেউ মেডেল দেয়নি কিন্তু সবাই এত আদর করেছিলেন, সে কি বলবো। রবিদা তো খুশি হয়ে আমার বেনে পুতুলের জন্যে একটা চমৎকার সবুজরঙেব জরি-পাড় দেওয়া সিল্কের রুমালই আমাকে বকশিশ দিলেন।" কবি আদর করে তাঁকে ডাকতেন 'মালিনী' বলে। "দ্বারে কেন নাড়া দিলে ওগো মালিনী" বুঝি এই মালিনীর উদ্দেশ্যেই লেখা। বড়ো হয়ে তিনি একবার হয়েছিলেন 'নটীর পূজা'র মালতী। খুব বেশি অভিনয় করেননি তবে লিখেছেন, এখনও লেখেন মাঝে মাঝে কবিতা কিংবা প্রবন্ধ। ছোট ছোট প্রবন্ধ 'অবনীন্দ্রনাথ', 'সোমেন্দ্রনাথ', 'ডাকঘর' সাময়িক পত্র-পত্রিকার পাতা খুঁজলে হয়তো চোখে পড়বে। 'ডাকঘর' নাটক সম্বন্ধেও অনেক কথা জানা যায়। একদিন রবীন্দ্রনাথ অবনঠাকুরকে হুকুম করলেন, 'তোমাদের বাড়ির

একটি ছোট মেয়ে জোগাড় করো।" বাবার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে এলেন স্বরূপা, কবির আদেশে পড়লেন 'ডাকঘর'। রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়ে বললেন, 'অবন একে সুধার ভূমিকায় তৈরি করো, তবে তুমি আবার বেশি শিখিও না। ওকে নিজের মতো করতে দিও।" স্বরূপা লিখেছেন, "বাবা আমাকে সাজাতেন মাথায় উবু ঝুঁটি, গলায় পুঁতির মালা, পায়ে মল, পরণে লাল শাড়ি আঁট করে পরা, এক হাতে ফুলের সাজি এক বগলে বেনে পুতুল।" ছোটখাটো কাজে বাবার মতো স্বরূপারও উৎসাহ আছে। দিদির মতো সেলাই-বোনা নিয়ে না থাকলেও তিনি অবন ঠাকুরের দেখাদেখি তৈরি করেছেন ঝিনুকের 'কাটুমকুটুম' পুতুল কিংবা আরো টুকিটাকি দু একটা জিনিষ এই আর কি!

হাতে তৈরী খেলনা কিংবা পুতুলের ওপর ঝোঁক ছিল সুনন্দিনী, পূর্ণিমা ও সুজাতা তিন বোনেরই। সুনন্দিনী গগনেন্দ্রের বড়ো মেয়ে। প্রভাত-নাথের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক আছে বলতে গেলে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই। বেশ চঞ্চল আর হাসিখুশি মেয়ে। দুষ্টুমি বুদ্ধিতেও সেরা। দাদাদের পরামর্শে ঘুমন্ত পণ্ডিতমশাইয়ের টিকি কেটে দিলে ঠাকুমা সৌদামিনী বললেন, "অনেক পড়াশুনো হয়েছে, এবার বিয়ে দিয়ে দাও।"

খুব ধুম করে বিয়ে হলো। গৌরীদান করলেন গগনেন্দ্রনাথ। বিবাহবাসরে সেলাই করা কাপড় নিয়ে আপত্তি উঠেছিল সেকথা আগেই বলেছি। গগন দেখালেন তিনি মেয়েকে যে ধাঁচে শাড়ি পরিয়েছেন সেটি যেমন আর্টিস্টিক তেমনি সুন্দর। সবারই ধরণটি বেশ পছন্দ হলো। মেয়ে প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাবে। গগনেন্দ্র আর্টিস্টকে দিয়ে মেয়ের প্রমাণ সাইজের একটা ছবি আঁকালেন—সেই কেতায় শাড়ি পরা, হাতে কাজললতা অপূর্ব ছবিটি—এখনো আছে সুনন্দিনীর ছেলে দ্বারিকানাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

এই বিয়ের পরে বেশ একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। গগনেন্দ্র বড়ো মেয়েকে দিয়েছেন একসেট হীরের গয়না। তাই নিয়ে মেয়েমহলে এক তর্ক ওঠে। চিরকেলে মেয়েলী তর্ক যেমন হয় আর কি? একদল বললেন, 'ও হীরে

নয়, পোখরাজ।' আরেকদল বললেন, 'না, ও হীরেই।' তর্কের মীমাংসার জন্যে মহর্ষি পরিবারের মেয়েরা বাড়ির পুরনো সরকারকে পাঠিয়ে সুনন্দিনীর শাশুড়ীর কাছ থেকে সেই গয়না চেয়ে নিয়ে যান। বাক্সের ওপর কুক-কেলভির নাম ছিল বলে ঐ দোকানেই সরকারকে পাঠানো হলো। তারা সেই গয়না চোবাইমাল ভেবে আটক করে। তখন সরকার মহর্ষির নাম করতে বাধ্য হন। দোকানের সাহেব গাড়ি করে গয়না নিয়ে মহর্ষির কাছে হাজির, "আমি গগন ঠাকুরের বাড়ির বিয়েতে এই গয়না তৈরি করে দিয়েছি, এ গয়না আপনি কোথায় পেলেন?" মহর্ষি তো অবাক। পরে সব খোঁজ নিয়ে রসিদ দিয়ে গয়না ছাড়িয়ে পৌঁছে দেন সুনন্দিনীব শাশুড়ীর কাছে। মেয়েদের খুব ধমক লাগালেন। একশো টাকা বাজি রাখা হয়েছিল। সেই টাকাব মিষ্টি তত্ত্ব পাঠানো হলো। এতটা হবে মেয়েরাও বুঝতে পারেননি। এই সুন্দর গল্পটি উপহার দিয়েছেন সুনন্দিনীব মেজো বোন পূর্ণিমা। তাঁর লেখা 'ঠাকুর বাড়ির গগন ঠাকুর' পাঁচ নম্বর বাড়ির অন্দরমহলের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ। তিনি সবার কথাবার্তা ভাবভঙ্গী এমন কি কণ্ঠস্বরটি পর্যন্ত যেন পৌঁছে দিয়েছেন ভাবীকালের পাঠকদের কাছে। তাঁর বই পড়ে বোঝা যায় এ সময় বাইরের ঘটনার বর্ণবিচ্ছুরণে অন্তঃপুরেব কোণগুলো আর আলোকিত হয়ে উঠছে না। সেখানে তখনো সেই পুবনো চাল, সাবেকী ঢং বজায় আছে। হয়তো মেয়েরা শাড়ির বদলে ফ্রক পরছেন, স্কুলে যাচ্ছেন এইমাত্র। তার বেশি নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে কত মেয়ে জেলে গেল, হারিয়ে গেল, কে তাব খোঁজ রাখে? কল্পনা দত্ত, বীণা ভৌমিক, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের পদধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ঠাকুর-বাড়ি—সেই অন্ধকারের বুক চিরে উষার অস্ফুট আভাস ফোটানো বাড়ির মেয়েরা এখন যেন অনেকটা পিছিয়ে পড়েছেন। কিংবা বলা যায় তাঁরা এখনো ধবে আছেন উনিশ শতকের সোনালি সময়টাকে।

. যাক সে কথা, পাঁচ নম্বর বাড়ির মেয়েরা শিখেছিলেন কি করে গার্হস্থ্য জীবনকে সুন্দর করে তুলতে হয়, সরস করে রাখতে হয়। সাধারণ জীবনে এর দামও তো কম নয়। শিল্পীকন্যারা শিখেছিলেন নানারকম হাতের কাজ।

বিদেশী পুতুল বর্জন করে দেশী পুতুলকে আদর করতে শেখালেন তাঁরা। সুনন্দিনী কাপড় দিয়ে সুন্দর সুন্দর পুতুল তৈরি করতে পারতেন। একে বলা হতো 'গুড়িয়া' পুতুল। তাঁর 'পানওয়ালী' ও 'সাপুড়ে' পুতুল যে দেখেছে সে-ই মুগ্ধ হয়েছে। 'হিতকারী সভা' থেকে 'সাপুড়ে' পুতুলটি পুরস্কৃত হয়, প্রাইজ পেয়েছিলেন ক্যালকাটা একজিবিশান থেকেও। ইদানীং হাতের কাজ বিশেষ করে পুতুল-টুতুলের খুব আদর, মেয়েদের হাতে তৈরি খেলনা-পুতুল চড়া দরে বিকোয়। অনেক মহিলা কিংবা মহিলা-প্রতিষ্ঠান মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর আয়োজনও করেন। ঠাকুরবাড়ি থেকেই এসব জিনিষের আদর শুরু। সুনন্দিনী অবশ্য শুধু পুতুলই তৈরি করতেন না, লোককে বোকা বানাতেও পারতেন। তাঁর 'দুব্বোঘাসের চচ্চড়ি' খেয়ে যে কত লোক বোকা বনেছেন তার ঠিক নেই। জামাই ঠকানোর দরকার হলেই ডাক পড়তো সুনন্দিনীর। কোমর বেঁধে বসে পড়তেন রাঁধতে। সেও যেন শিল্প—ব্লটিংয়ের রাবড়ি, তুলোর বেগুনি, খড়কুটোর ছেঁচকি খেতে গিয়ে ঠাকুরবাড়ির জামাইরা যে কত ঠকেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

পূর্ণিমা অনেকটা উমারাণীর মতোই শিল্পী। তাঁর হাতের কাজ বিশেষ করে নক্সী কাঁথাগুলো চোখে না দেখলে ধারণা করা শক্ত। এ ছাড়াও তিনি তৈরি করতেন কাগজের বাড়ি, মেওয়ার পুতুল, ডালের ছবি। সেগুলো কি কাজে লাগতো? মেয়ের বিয়েতে তত্ত্ব পাঠানো হতো। ঠাকুরবাড়ির তত্ত্ব দেখবার মতো জিনিষ ছিল। একশো-দেড়শোজন লোক যেত। পুরনো ঝি চাকরেরা নিয়ে যেত কলকাতার সব বিখ্যাত খাবার। যশোর থেকে আসতো স্পেশাল অর্ডার দেওয়া নারকেল চিঁড়ে, জিরে নারকোলের ফুল—মেয়েরা হাতে তৈরি করে চিনিতে পাক করে পাঠাতো। এক এক থালা ভরা এক একটা বাতাসা, বড়ো ঝুড়িতে একটা কদমা। কত রকম ঠাট্টার জিনিষ। এদের সঙ্গেই পাঠানো হতো ট্রে ভর্তি মেওয়ার পুতুল, নানারকম ডালের ছবি। কাগজের বাড়িগুলোও ছিল খুব সুন্দর। কিন্তু কালের কবল থেকে তারা কেউ রক্ষা পায়নি। আছেন শুধু পূর্ণিমা ও তাঁর লেখা 'ঠাকুরবাড়ির গগনঠাকুর'। আছে

তাঁর অর্ধসমাপ্ত আত্মকাহিনীর পাণ্ডুলিপি 'চাঁদের বুড়ি'। নাতিদের ভোলাবার জন্যে লেখা—গগনের মেয়ে পূর্ণিমা, জামাই নিশানাথ, সবাই যেন চন্দ্রলোকের বাসিন্দা। ঘর আলো করা মেয়েটি এসেছে চন্দ্রলোক থেকে।

'ঠাকুরবাড়ির গগন ঠাকুর'-এর মধ্যে দু চারটে ঘটনা হয়তো ঠিকমতো সাজানো হয়নি। তবু তথ্যপূর্ণ এবং রসগ্রাহী। পড়তে পড়তে মনে হয় যেন লেখা জিনিষ নয়। মুখের সামনে বসে কেউ গল্প বলে যাচ্ছে, কানের ভিতর দিয়ে গল্প প্রবেশ করছে মরমে। খবরও আছে অনেকরকম। যেমন ধরা যাক 'হিতকারী সভা'র কথা। আত্মীয় পোষণ ছিল সে যুগের ধনীদের দস্তুর। তাই রবীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্র ও অন্যান্যদেব সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করেন যে, সব বাড়ি থেকে কিছু কিছু চাঁদা তুলে একটা সাহায্য ফাণ্ড খোলা হবে। হলোও তাই। দুঃস্থ ঠাকুররা সাহায্য পেতেন। তহবিলে টাকা তোলার জন্যে বছরে একবার করে হতো 'দানমেলা'। বাড়ির মেয়েরা হাতে তৈবি জিনিষ দিতো এবং তা বিক্রী করে টাকা জমানো হতো। পরে অবশ্য 'হিতকারী সভা' থেকে গগনেন্দ্র সরে দাঁড়ালেন। এই খববটা আমাদেব জানিয়েছেন পূর্ণিমা। গগন ঠাকুরকে এই বইয়ে বড়ো আপন করে পাওয়া যায়।

সুজাতার হাতের কাজও বড়ো সুন্দর। দিদিদের মতো তিনিও শিল্পী। নানারকম জিনিষ তৈরি করতে পারেন তবে তাঁর পানমশলার বাড়ি বোধহয় অনেকেই দেখেছেন। এই মশলার বাড়িও পাঠানো হতো বিয়ের তত্ত্বে। সুজাতা মশলার বাড়ি করতেন শিল্পী মনের স্বপ্ন মিশিয়ে। যেমন তাঁর নিজের বাড়ি ছিলো পার্কসার্কাসের কাছে। গগনেন্দ্রনাথ নিজের কয়েকখানি অমূল্য ছবি দিয়ে সে বাড়ি সাজিয়ে দিয়েছিলেন—রায়েটের সময় সে বাড়ি লুঠ হয়ে যায়। সুজাতার বিয়ে হয়েছিল বিদ্যাসাগরের পুত্রের দৌহিত্র সরোজ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। নতুন বাড়ি আবার সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়েছিল সুজাতাকে। পান-মশলা দিয়ে বাড়ি করা ছাড়াও তিনি তৈরি করেছেন সেতার-তবলা-হারমোনিয়াম। শর্মিলাব বিয়েতে তো তৈরি করে দিয়েছিলেন একটা আস্ত ক্রিকেট টীম! এছাড়া

সুজাতার ঝোঁক ফেলে-দেওয়া, কুড়িয়ে-পাওয়া জিনিষ দিয়ে সুদৃশ্য পুতুল বা টুকিটাকি জিনিষ তৈরি করতে। নতুন জিনিষ দিয়ে তো সবাই পারে। কিন্তু ফেল্না জিনিষ দিয়ে? 'তুচ্ছ কভু তুচ্ছ নয়' শিল্পীর কাছে। সুজাতা তৈরি করেছেন আইসক্রীম কাঠির বাড়ি, শিশিবোতলের পিনকুশান-নুনদান-পুতুল। আজকাল অব্যবহার্য জিনিষে তৈরি ঘর সাজাবার পুতুল সাজিয়ে অনেকেই বাহবা পাচ্ছেন। তুচ্ছ জিনিষ তুলে এনে অসুন্দরকে সুন্দর করার জাদু জানতেন ঠাকুর-বাড়ির মেয়েরা। খুব সম্ভব জাপানী শিল্পীদের আনাগোনার ফলে তাঁরা চিনতে শিখেছিলেন 'প্রতিদিনের শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে' হারিয়ে যাওয়া সুন্দরকে।

দিদির মতো সুজাতা লেখেন না বড়ো একটা কিন্তু বাবার কথা যে অফুরান। তাই পূর্ণিমার পরে গগনেন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোক্তারা সুজাতাকে দিয়েও লিখিয়েছেন। সেই ছোট্ট লেখাটিতে আছে আপন করা ঘরোয়া কথা ও সুর। একটুখানি দেখা যাক :

"দার্জিলিং-এ দেখেছি বাবা কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। শিল্পীর চোখে তিনি যা দেখেছিলেন আমাদেরও তাই দেখতে শেখালেন। মহাদেব শুয়ে আছেন—নাক মুখ চোখের রেখা তখন স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তিনি আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিলেন, তাই, নাহলে আগে শুধু বরফের পাহাড় বলেই দেখেছিলাম।"

এভাবে দেখতে শেখানোই ছিলো অবন-গগনের নিজস্ব আর্ট। সুজাতার শিল্পীজীবনে এসেছে পরিতৃপ্তির আনন্দ। ছোটখাটো অনেক কিছু করেছেন তিনি। কয়েকবার পুরস্কার পেয়েছেন হাতের কাজ—সেলাই আর আলপনার জন্যে। শুধু দুঃখ এসব কিছুই থাকে না। শুধু পঞ্চাশ বছরের পুরনো নিজের হাতে করা 'বনসাই' বটগাছটাই যা চারপাশে ঝুরি নামিয়ে বেঁচে আছে। আর কিই বা আছে? যে সব মেয়েদের কনে সাজালেন তারাও তো আজ গিন্নী। এখন আর পারেন না, হাত কেঁপে যায়। তবুও এখনও অনেকে ধরে সাজিয়ে দেবার জন্যে। ঐ যে আদরের নাতনী শিঞ্জিতা, ঐ কি ছাড়বে? যতই মডার্ণ আর আলট্রা মডার্ণ হোক না কেন, বিয়ের দিন সেও নিশ্চয় চাইবে শিল্পীকন্যার

শিল্পশ্রীমণ্ডিত হাত দুখানির চির নবীন স্পর্শ!

কনে সাজানোর কথায় মনে পড়ছে আরেকজনের কথা। তিনিও খুব ভালো কনে সাজাতেন, তাঁর নাম মাধবিকা। সমরেন্দ্রনাথের মেয়ে। মাধবিকারা পাঁচ বোন। যমজ বোন মালবিকা ছাড়াও ছিলেন সুপ্রিয়া, কমলা ও অণিমা। মাধবিকার বিয়ে হয়েছিল কবিকন্যা রেণুকার ছোট দেবর শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ঠাকুববাড়িতে মেয়ে সাজানোর নাম ছিল মাধবিকার। সেখানে মেয়ে সাজানোর একটি বিশেষ ধরণ ছিল। নিশ্চিত ভাবে বলতে না পারলেও মনে হয় তখনকার সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির মধ্যে এক এক ধরণের মেয়ে সাজানোর বৈশিষ্ট্য ছিল। যাইহোক, ঠাকুববাড়িতে এখনকাব মতো লবঙ্গের টিপ দিয়ে চন্দনের নক্সা কেটে মেয়ে সাজানো হতো না। তাব বদলে অনেকখানি চন্দন লেপে দেওয়া হতো পুরো কপালে। ভুরু থেকে সিঁথি পর্যন্ত চন্দন লেপা হলে খুব সরু যন্তবে চিরুণি দিয়ে চন্দনটা আঁচড়ে দেওয়া হতো। ভুরু থেকে চুল পর্যন্ত সাবা কপালে চন্দনেব খড়কে ডুরে কাটার পর চন্দন শুকোলে তাব ওপর সিঁদুর-কুমকুমেব টিপ ও নক্সা কাটা হতো।

ইন্দিরা যখন স্ত্রী-আচাবের একখানি সংকলন প্রকাশের কথা ভাবছিলেন তখন তাঁর এ ব্যাপারে মাধবিকাকেই যোগ্যতমা বলে মনে হয়েছিল। একান্নবর্তী পরিবারে বহু বিয়ে তিনি দেখেছেন এবং এ বিষয়ে স্বাভাবিক ঔৎসুক্য থাকায় সবই মাধবিকার মনে ছিল। তাঁর দেওয়া বিবরণ থেকেই আমরা ঠাকুরবাড়িব বিয়ের স্ত্রী-আচার সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারি। মহর্ষি পরিবার ব্রাহ্ম হয়ে যাবার পরেও মহর্ষি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে স্ত্রী-আচার বাদ দেননি। মাধবিকা সব জানতেন। সবই মনে রেখেছিলেন। কত নিয়ম! নিয়ম তো নয় সে হলো রীতি বা 'রীত'। গায়ে হলুদ থেকে শুরু, বিয়ের পর নদিনে শেষ। মাধবিকা লিখেছেন ঠাকুরবাড়ির কথা, তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের স্ত্রী-আচারের তফাৎ নেই বললেই চলে। দু একটার মধ্যে একটু নতুনত্ব আছে। যেমন:

"বরণের পর মা ছেলের কাছ থেকে কনকাঞ্জলি নেবে। ছোট একটি থালাতে

লে একটু আতপ চাল একটি টাকা দিয়ে ছেলের হাতে দিতে হয়, দিয়ে মা সামনে াচল পেতে দাঁড়ায় ও ছেলেকে তিনবার জিজ্ঞাসা করে, 'বাবা কোথায় যাচ্ছো ?' ছেলে বলে, 'মা তোমার বৌ আনতে যাচ্ছি'।...তিনবার সেই কথাটি বলে ায়ের আঁচলে ঐ চাল ঢেলে দিয়ে নারায়ণ প্রণাম ও মাকে প্রণাম করে যাত্রা হবে। সম্প্রদান হযে গেছে এই খবর মায়েব কানে দিতে হয, দিলে সারাদিনের উপোষের পব ঐ কনকাঞ্জলির চাল মা একটু ফুটিয়ে মুখে দেন ও দুধ মিষ্টি খান।"

মাধবিকা এভাবেই খুঁটিনাটির দিকে নজর দিয়ে যত্ন করে লিখেছেন। তবে বইযে তাঁর নাম লেখা হযেছে শুধু মাধবী।

মাধবিকার ছোট বোনেরা কোথাও কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে চাননি। শুধু কমলা কিছু কিছু কবিতা লিখতেন। তিনি দু-একটি 'নাবী সমিতি'ব সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখা কয়েকটা অপ্রকাশিত কবিতা এখনো আছে। মেয়েব মৃত্যুব পবে লেখা একটা কবিতায় দেখা যাচ্ছে তিনি বেছে নিযেছেন গদ্য ছন্দের আঙ্গিক :

"আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে কেড়ে
নিয়েছে কে তাকে, সব শূন্য কবে দিযে
তারপরে তার বন্ধু দুটি এসে
বসলো আমার কাছে, একবার
আমাব দিকে চেয়ে মাথা রইল
নীচু করে, চোখেব জল নিলে
সাম্‌লে আমার কাছে, মাসীমা
বলে ডাকলে আমায তাবা,
এ জন্মের মতো সে গেল চলে, রেখে
গেল বুঝি, এদের আমার কাছে
ভোলাতে আমায়।"

বৈঠকখানা বাড়ির বৌয়েদের কথাও এই ফাঁকে সেরে নেওয়া যাক। আমাদের

কালসীমার মধ্যে ঐ বাড়িতে বৌ হয়ে এসেছেন কনকেন্দ্রের স্ত্রী সুরমা, নবেন্দ্রের স্ত্রী অপর্ণা ও অলোকেন্দ্রের স্ত্রী পারুল। গগনঠাকুরের বড়ো ছেলে ও তার স্ত্রী গেহেন্দ্র ও মৃণালিনীর মৃত্যু হয়েছিল অল্প বয়সে। মেজো ছেলে কনকেন্দ্র। সুরমা ছিলেন ভালো অভিনেত্রী। ঘরোয়া আমোদ আহ্লাদে মেতে উঠতেন। তাঁর গায়ের রঙ ছিল খুব ফরসা আর গাল দুটি পাকা ডালিমফলের মতো লাল। হাসলে আরো টুকটুকে হয়ে উঠতো। 'বিচিত্রা'য় হতো নানারকম অনুষ্ঠান। একবার হলো 'শকুন্তলা' ট্যাবলো। সুরমা সেজেছিলেন দুষ্মন্ত আর সুধীন্দ্রনাথের মেয়ে এণা শকুন্তলা। সুন্দর হয়েছিল সে অভিনয়! আরেকবার হয়েছিল 'মৃণালিনী' নাটক। সুরমা সেজেছিলেন পশুপতি আর মনোরমার ভূমিকায় পূর্ণিমা। মেয়ে মহলের ব্যাপার বলে অভিনয়ের শেষটা বদলে দেওয়া হয়। পশুপতির মৃত্যুর পর মনোরমা বিধবা হবে—সে দৃশ্যের বদলে দেখানো হলো পশুপতি মনোরমার হাত ধরে কাশী চলে যাচ্ছে।

সুরসিক গগনেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে মজার কাজ করতেন। একবার একজন প্রৌঢ়া মহিলাকে ঠকাবার জন্যে তিনি সুরমাকে রাজা যতীন্দ্রমোহনের বাড়ির দারোয়ান সাজিয়ে দিলেন। সুরমা এসে লাঠি ঠুকে দাঁড়ালেন। মাথায় পাগড়ি, মস্ত গোঁফ—কে বলবে ভোজপুরী দারোয়ান নয়। সেই ভদ্রমহিলা 'চলো যাই' বলে যতীন্দ্রমোহনের বাড়িতে ফিরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই সবাই হেসে উঠলেন। এ ভাবেই এবাড়িতে রসের হাট জমে উঠতো।

সুরমার ছয় মেয়ে—অনুভা, গৌরী, বকুলা, করবী, শুক্লা ও সীমা। তাঁরা প্রত্যেকেই গুণী শিল্পী। গান-বাজনা-সেলাই-বাটিকের কাজ প্রভৃতি নিয়ে বেশ নাম করেছেন। এঁদের মধ্যে অনুভা ঠাকুরের নাম আর একটি কারণেও উল্লেখযোগ্য। তিনি গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রথম যুগে দুখানি রবীন্দ্র সঙ্গীত রেকর্ড করেছিলেন। গান দুটি হলো 'দেখো দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়' ও 'নাই বা এলে যদি সময় নাই"। আজ রেকর্ডটি দুষ্প্রাপ্য। কবির সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয় তাতেও তিনি গান গেয়েছিলেন। ছোট-বেলায় একবার সেজেছিলেন 'বিসর্জনে'র হাসি। কিন্তু বিয়ের পর রুড়কিতে

যাওয়ায় অনুভা আর অভিনয় ও সঙ্গীতচর্চায় সুযোগ বেশি পাননি। এ সময় তিনি সমাজ সেবার কাজে যোগ দিয়ে একটা 'চাইল্ড সেণ্টার' গড়ে তোলেন। স্বেতে তিনি বাটিক শেখার স্কুল, 'নিউ ওয়ার্ক সেণ্টার' প্রভৃতি নিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেই ভালোবাসতেন। সীমাও গানের ক্ষেত্রে তার যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। গৌরী ভালো সেলাই জানতেন। শান্তিনিকেতনে যোগ দিয়েছেন সমবেত গানে। কখনো 'তপতী' কখনো বা 'শাপমোচনে'। এই সুরমারই এক পৌত্রী চিত্রাভিনেত্রী শর্মিলা। সত্যজিৎ রায়ের 'অপুর সংসার'-এ তার প্রথম চিত্রাবতরণ থেকে ক্রিকেট খেলোয়াড় পতৌদির নবাব মনসুর আলি খানের বেগম আয়েসা সুলতানা হয়ে ওঠার গল্প আজ সকলেই জানে। সুরমার অপর পৌত্রী ঐন্দ্রিলাও শৈশবে 'কাবুলীওয়ালা' চিত্রের মিনির ভূমিকায় করেছিলেন।

অপর্ণা দ্বিপেন্দ্রনাথের দৌহিত্র। তাঁরা দু বোন অপর্ণা আর পূর্ণিমা—দুজনেরই বিয়ে হয়েছিল ঠাকুরবাড়িতে। তাঁদের মা নলিনীর বিয়ে হয়েছিল সেই বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারে, যেখানে বধূ হয়ে প্রবেশ করেছিলেন প্রতিভা ও ইন্দিরা। কাজেই ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের যা যা গুণ থাকে তার সবই ছিল দুবোনের মধ্যে। অপর্ণার বোন পূর্ণিমার বিয়ে হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের পৌত্র সুবীরেন্দ্রর সঙ্গে। অপর্ণার গান ও বেহালা বাজানোর কথা ইন্দিরা বারবার বলেছেন। শোনা গেছে দুটি রবীন্দ্র সঙ্গীত "দাড়িয়ে আছো তুমি আমার" ও "যদি প্রেম দিলে না প্রাণে" তার কণ্ঠে যত ভালো শোনাতো অমনটি আর কেউ গাইতে পারতেন না। এক-একটা গান বা অভিনয় সম্বন্ধে শোনা যায় এক একজনের কৃতিত্বের কথা। এভাবে যদি কেউ রবীন্দ্র সঙ্গীত বা রবীন্দ্র নাটকের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস লেখেন তাহলে দেখা যাবে সঙ্গীত ও নাটকের প্রযোগরীতির দিক থেকে কবি তাদের বাড়ির ছেলেদের চেয়েও মেয়েদের সাহায্য পেয়েছেন অনেক বেশি। 'ভৈরবের বলি' ও আরো দু-একটা নাটকে অভিনয়ও করেছেন অপর্ণা।

পারুল ঠাকুরও এ বাড়ির দৌহিত্রী। সৌদামিনীর বড়ো মেয়ে ইরাবতী, তাঁর

মেয়ে পারুল। দুই বাড়ির দুই সৌদামিনীর মধ্যে ভারি ভাব ছিলো। দুজনে
এক নাম তাই 'সই' পাতিয়েছিলেন দুজনে। ইরাবতীর তিন দিনের মেয়েকে
দেখে তার সঙ্গে নাতি অলোকেন্দ্রের বিয়ে ঠিক করেছিলেন সৌদামিনী। তাঁর
কথার নড়চড় হয়নি। অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ হয়েই এলেন পারুল। পাঁচ
নম্বরে তখনও সাবেকী রীতি। বৌদের সকালে যেতে হয় তরকারি বানানোর
আসরে। তিন শাশুড়ীর একজন এসে বসতেন চৌকীতে। সামনে দু পাশে
সার দিয়ে আসন পেতে বসে পড়তেন বৌ-ঝিরা। দাসীরা তরকারির
খোসাটোসা ছাড়িয়ে এনে দিলে তাঁরা গিন্নীর নির্দেশে কুটতেন ঝালের তরকারি,
ঝোলের ব্যঞ্জন, কালিয়ার আলু, ঘণ্টর আলু কিংবা ডালনার তরকারি। পারুলের
কাজের শুরুও এমনিভাবে। নাচ-গান-অভিনয়ে তাঁর বড় সংকোচ। তবু রবীন্দ্রনাথ
জোর করে তাঁকে একবার নামিয়েছিলেন 'বর্ষামঙ্গলে'। গানের সঙ্গে তাঁর নীরব
আবির্ভাব হবে শরৎলক্ষ্মী রূপে। কথা বলতে হবে না, গান গাইতে হবে না শুনে
রাজী হলেন পারুল। মেঘের মতো একঢাল চুল এলিয়ে সাজলেন শরৎলক্ষ্মী।
গানের সঙ্গে তাঁর নীরব আবির্ভাব আবার পিছনে হেঁটে প্রস্থান—এই ছিলো তাঁর
ভূমিকা। মাঝে মাঝে পারুল গিয়ে বসতেন রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা'র আসরে।
সেখানে তিনি দেখেছিলেন কবি যখন গল্প পড়তেন তখন তিনি নিজে হাসতেন
না, অন্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতেন। পারুল তাঁর নাতনী তাই ভয়টা কম
হেসে গড়িয়ে পড়তেন। কবি জিজ্ঞেস করতেন "তোরা হাসছিস কেন?" অন্যরা
চুপ করে যেতেন। পারুল হেসে বলতেন, "তুমি হাসির কথা বলছো, হাসবো
না?" গল্পটা আমরা তাঁর মুখেই শুনেছি।

পুরনো দিনগুলো কেটে গেছে স্বপ্নের মতো। সুখের স্মৃতির মতো।
ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা এই পর্বে যেন নিজেদের অনেকখানি গুটিয়ে নিয়েছেন।
শুক্তি যেমন সযত্নে মুক্তোটিকে লুকিয়ে রাখে এঁরাও তেমনি সযত্নে নিজেদের মনের
মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন সে যুগের সেই দুর্লভ স্মৃতি—আমাদের কাছে এসব গল্প
কিন্তু পূর্ণিমা, সুজাতা, সুরমা, পারুলের কাছে তো গল্প নয়। বৈঠকখানা বাড়ি
আর নেই, মিশে গেছে মাটির সঙ্গে ধূলো হয়ে তবু 'মনে তার নিত্য যাওয়া-

আসা'। স্মৃতির সরণি বেয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে সেই রূপকথার ঘুমন্ত রাজ-বাড়িটিতে। এখনো তাঁদের বুকে মৌন বেদনা গুমরে গুমরে ওঠে 'কেন ভাঙ্গা হলো বাড়িটা? মহর্ষি ভবনের মতো 'নব কলেবর' নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও যে মাঝে মাঝে দেখে আসা যেত নিজেদের হারানো শৈশবকে।'

আবার ফিরে আসি মহর্ষি ভবনে। এখন অবশ্য ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছেন। বাড়িতে রয়েছেন অনেকগুলি নাতনী আর নাতবৌ। কবির নতুন নাটকে তাঁরা পার্ট নেবেন, ভরে দেবেন নতুন গানের ডালি। এখন আর কোন একক ভূমিকা যেন স্পষ্ট নয়। এখন সারা বাংলার মেয়েরা এগিয়ে এসেছেন নব জাগৃতির পথ বেয়ে। সেই প্রথম পায়ে চলা একহারা সরু পথটা কোথায়? সেই বুঝি পথ হারিয়েছে। রবীন্দ্রনাথও ধরলেন বেলা শেষের গান। এই শেষ বেলাকার রাগিনীর ধুয়ো ধরতে এগিয়ে এলেন আরো কয়েকজন।

সুধীন্দ্রনাথের তিনটি মেয়ে—রমা, এণা, চিত্রা। তিনজনেরই নানারকম সুকুমার কলায় দক্ষতা ছিল। যদিও কেউই সাময়িকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। রমার গানের গলা ছিল অসাধারণ। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে ভালো-বাসতেন কবি স্বয়ং। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের কথায় তাঁর দিদির গলায় 'এই যে কালো মাটির বাসা', 'নাগো এই যে ধূলা আমার না এ', 'সাঁঝের রঙে রাঙিয়ে গেল হৃদয় গগন', 'সন্ধ্যা হোলো মা বুকে ধরো' এই গানগুলো যারা কখনো শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছে তারা কখনো ভুলবে না। কবি বলতেন, তাঁর গান রমার গলায় যেমন্ রূপ নেয় এমনটি খুব কম লোকের গলাতেই নেয়। আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর গানের কোন রেকর্ড হয়নি। যাঁরা শুনেছেন তাঁরা বলেন সে গানে মিশে থাকতো মাধুর্য আর গভীরতা।

লেখা এবং লেখানো, গান গাওয়া এবং শেখানো সবেতেই রমার উৎসাহ ছিল। প্রফুল্লময়ীর 'আমাদের কথা' হয়তো কোনদিনই শোনা যেত না, রমা যদি না থাকতেন। আগ্রহ আর উৎসাহ নিয়ে তিনি বসতেন দিনের পর দিন 'বলো নদিদি বলো তোমার কথা' বলে। ধীরে ধীরে খুলেছে স্মৃতির দুয়ার—অনেক চোখের

জল মাড়িয়ে প্রফুল্লময়ী এই নাতনীর আবদারেই ফিরে গেছেন নিজের কৈশোরে। এ কি কম কৃতিত্ব! নিজেও লিখতেন রমা। শান্তিনিকেতনে বেরোতো মেয়েদের কাগজ 'শ্রেয়সী'। তাতে তিনি দু-একটা ইংরেজি গল্প স্বচ্ছন্দ অথচ সাধু ভাষায় অনুবাদ করেছেন। স্নেহলতা দেবীর একটা গল্প 'সাপুড়ের গল্প' নামে অনুবাদ করেন রমা। ইন্দিরার ভারি ইচ্ছে ছিল রবীন্দ্রনাথের নারী সংক্রান্ত রচনাগুলি একত্র করবার। বলেওছেন একে তাকে, 'কেউ যদি সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য অনুসন্ধান করে মেয়েদের সম্বন্ধে কোথায় কি তিনি লিখেছেন তা একত্র করে প্রকাশ কবতে পারেন—তবে মস্ত একটা কাজ হয়।' সেই ভার নিয়েছিলেন রমা। রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী কি রকম স্থান পেয়েছে তাই দেখার জন্যে। 'শ্রেয়সী'র কযেকটা সংখ্যায় 'রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী' নাম দিয়ে অনেক রচনা সংকলনও করেন। তবে সময়ের অভাবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেননি।

শেষ জীবনে তাব মন ঝুঁকেছিল তথাগতের আদর্শের প্রতি। কিছু মানসিক অশান্তি তাঁকে আরো ঠেলে দিয়েছিল মহাবোধি সোসাইটিব দিকে। পারিবারিক ট্র্যাডিশন অনুযায়ী তিনি একটি স্কুল ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাগবাজারে। পরে সেখান থেকেও নীরবে সরে এলেন রমা। নিজেকে সঁপে দিলেন সৌম্য-শান্ত বুদ্ধদেবের চরণতলে। সেখানে তিনি একটি রচনা সংকলন প্রকাশ করেন 'লর্ড বুদ্ধ এ্যাণ্ড হিজ মেসেজ' নামে। তাতে তাব নিজের লেখা না থাকলেও তিনি সংগ্রহ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা, অসিত হালদার, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা। রমার শেষ জীবনের কথা বলেছেন তাঁর মেজো বোন এণা। দিদির লেখা-আঁকা সযত্নে তিনি এখনও রেখে দিয়েছেন। জিনিষ হারায় না, মানুষ হারায়। তাই ভাইবোনদের মধ্যে এখন তাঁরা দুই বোন ছাড়া কেউ নেই। দিদির মতো গাইতে না পারলেও এণা শিখেছিলেন বাঁশী আর সেতার বাজাতে। বিচিত্রায় যে ট্যাবলো অভিনীত হতো তাতে এণাও যোগ দিতেন। একবার সেজেছিলেন শকুন্তলা। অবশ্য রমাও অভিনয় করেছেন। 'মায়ার খেলা'য় তিনি কুমারের অভিনয়ও কবেন একবার। বিয়ের পর এণা চলে গিয়েছিলেন ঢাকায়, একেবারে ভিন্ন পরিবেশে। সেখানেও যে অনুকূল পরিবেশ ছিল না তা নয়, তবু

এঁরা ইচ্ছে করেই হাই সোসাইটির কেন্দ্রমণি হয়ে ওঠার চেষ্টা করেননি। ঘরের মধ্যে ছোট্ট একটা সুখের সংসার গড়তেই তাঁর ভালো লেগেছিল। তাঁব মেয়ে কৃষ্ণা বর্তমানে ফ্রান্সে নানারকম সাংস্কৃতিক কাজে কর্মে জড়িয়ে আছেন।

সুধীন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে চিত্রা কিছুদিন ছিলেন শান্তিনিকেতনে। নাচ-গান অভিনযেব ধারা মিশেছিল তাঁর রক্তে তাই খুব সহজেই তিনি এ তিনটি জিনিষ আয়ত্ত করে ফেললেন। বিশেষ করে নাচে তাঁর প্রতিভাব পরিচয় পাওয়া গেল। শান্তিনিকেতনে প্রতিমার পরিকল্পনা মতো নাচ শেখানো তখন সবে শুরু হয়েছে। নৃত্য শিক্ষক হিসেবে এসেছেন মণিপুরী শিক্ষক নবকুমাব। ঠাকুরবাড়ির যে মেয়েরা এ সময় নাচ শেখেন তাঁদের নাম চিত্রা, সুবেন্দ্রনাথের দুই মেয়ে মঞ্জুশ্রী ও জয়শ্রী, অরুণেন্দ্রের তিন মেয়ে লতিকা, কণিকা ও সাগরিকা, কবির দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী নন্দিনী। বাইরের মেয়েদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী হাতি সিং, গৌরী বসু, নিবেদিতা দেবী, অমিতা চক্রবর্তী, মালতী সেন, উমা দেবী, অমলা রায় চৌধুরী, যমুনা দেবী, এবং আরো অনেকে। এঁদের মধ্যে শ্রীমতী ও অমিতা পরে ঠাকুববাড়ির বৌ হয়েছিলেন। চিত্রা নাচের দলে ছিলেন ট্র্যাডিশন ভাঙার সময়। ঠাকুরবাড়ির উঠোনে প্রথম যে নৃত্যানুষ্ঠান হয় তাতে নেচেছিলেন চিত্রা ও নন্দিতা। তারপর নেচেছিলেন 'ঋতুরঙ্গে', 'মায়ার খেলায়', 'সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' গানটির সঙ্গে। 'নটীর পূজা'য় তিনি সেজেছিলেন বাসবী। 'তপতী' নাটকে নিয়েছিলেন মঞ্জরীর ভূমিকা। এই নাটকের গানের দলেও গান গাইতেন তিনি। এর পরেও অন্যান্য অনুষ্ঠানে চিত্রা যোগ দিয়েছেন। 'চিরকুমার সভা'র অভিনয়ে নীরবালা সেজে অবাক করে দিয়েছেন সবাইকে কিন্তু পবে তিনি খুব বেশি অনুষ্ঠানে আর যোগ দেননি।

বাড়ির মেয়েদের ভেতরেই একটা দল গড়ে ওঠায় প্রতিমার পক্ষেও কাজ চালানো সহজ হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথের মেয়ে মঞ্জুশ্রী কবির কাছে নাম পেয়েছিলেন 'আমের মঞ্জরী'। তিনি আরও একটি দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারিণী।

'বিসর্জন'-এর অভিনয়ে তিনি কবির সঙ্গে অভিনয় করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন জয়সিংহ। বৃদ্ধ হযেও অসাধারণ প্রতিভার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছিলেন পূর্ণ যুবক জয়সিংহকে। মঞ্জুশ্রী সেজেছিলেন অপর্ণা। সুন্দর হয়েছিল সে অভিনয়। তবে তিন দিনের অভিনয়ে মঞ্জুশ্রী অভিনয় করেন দু দিন আর একদিন অপর্ণা সাজেন রাণু অধিকারী। পরবর্তী জীবনে মঞ্জুশ্রী সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিয়ে শিল্পেব জগৎ থেকে অপেক্ষাকৃত দূবে সরে যান। নারী-কল্যাণ, নারীশিক্ষামূলক সমিতি গড়ে তোলায় তাঁর প্রচুব আগ্রহ ছিল। তাই হেমলতা বা সরলার মতো তিনিও একটি নারী সমিতি স্থাপন করেন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' নামে। এই সমিতির মুখপত্র ছিল 'ঘরেবাইরে'। সম্পাদিকাও মঞ্জুশ্রী নিজেই। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল, যে সব মেযেরা সমাজ-সংসার-অর্থনীতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে কোনদিন আত্মপ্রতিষ্ঠা পায়নি তাদের সঙ্গত অধিকার দাবি করা। তিনি দেখেছিলেন সাধারণতঃ এই ধরণেব প্রতিষ্ঠাহীন মেয়েরাই বঞ্চিত হয় সব রকম অধিকার থেকে। তাই তাদেব জন্যেই তিনি সংগ্রাম শুরু কবেছিলেন। বদলে দিতে চেয়েছিলেন চিরকালের পুরনো সমাজকে। চাব পাঁচ সংখ্যা প্রকাশ হবার পব 'ঘরেবাইরে' বন্ধ হয়ে যায। মঞ্জুশ্রী আর একটা পত্রিকা প্রকাশ করেন 'জয়া' নামে। কিন্তু ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কম্যুনিস্ট পার্টি ভারতে বেআইনী ঘোষিত হলে বঙ্গীয় সরকার পত্রিকাটির প্রচার বন্ধ করে দেন। কিছুদিন কারাবাস কববাব পব ১৯৫১ সালে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার হলে শান্তি কমিটির উদ্যোগে যে শিল্পীদল চীনদেশে গিয়েছিলেন তাঁদের দলের সঙ্গে চীনে গিযেছিলেন মঞ্জুশ্রী।

জয়শ্রী আত্মপ্রকাশে বড়োই অনিচ্ছুক। ছোটবেলায় দিদির সঙ্গে তিনিও কোন কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিযেছেন কিন্তু বড়ো হয়ে আর সে সব নিয়ে বিশেষ মেতে ওঠেননি। একবার ঋতুরাজ সেজেছিলেন 'ঋতুরঙ্গে', পেছন থেকে গান করেছিলেন সাহানা অর্থাৎ ঝুনু সিদ্ধান্ত। জয়শ্রীর বিয়ে হয়েছিল কুলপ্রপ্রসাদ সেনের সঙ্গে। অসবর্ণ বিবাহ। পাবিবারিক প্রথা অনুযায়ী বাধা এসেছিল

আপত্তিও উঠেছিল। সুরেন্দ্রনাথ শোনেননি। বলেছিলেন, "আমরা সকলেই যখন উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করে আসছি যে দেশমাতা এক, আমরা সকলেই তাঁর সন্তান, তখন মেয়ে অন্য জাতে বিয়ে করবার ইচ্ছে প্রকাশ করলে কোন্ মুখে আপত্তি করবো? আমাদের বাপ-দাদা তাঁদের পূর্বপুরুষের প্রচলিত পথের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, আমরা আবার বাপ-দাদার প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে যাচ্ছি, সুতরাং তাঁদের অনুরূপ কাজই করছি।" এই বিয়েতে পৌরোহিত্য করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অসবর্ণ বিয়ে হলেও এখানে রেজিস্ট্রি করার কথা ওঠেনি।

হেমেন্দ্রনাথের চারজন পৌত্রী—গায়ত্রী, মেধা, গার্গী ও বাণীর মধ্যে বাণী সঙ্গীতের জগতে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই বাড়িতে নিরন্তর যে সঙ্গীতের স্রোত বয়ে চলেছিল বাণী তার যথার্থ উত্তরাধিকারিণী। অবশ্য হেমেন্দ্র-পরিবারের আরো দুটি বৌ—অমিয়া ও মেনকাও গানের জগতে সুপরিচিতা কিন্তু সে শুধু সঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে। বাণী গানের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা করেছেন সঙ্গীতশাস্ত্রের। তাঁরা চার বোনই দেশী-বিলিতি বহু গান শিখেছিলেন। গায়ত্রী ও মেধা হিতেন্দ্রনাথের মেয়ে আর গার্গী ও বাণী ক্ষিতীন্দ্রনাথের মেয়ে। প্রথম তিন জনকে আমরা সংসার-জীবনের বাইরে খুব বেশি দেখতে পাইনি। গান গাওয়া, পিয়ানো বাজানো, কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেওয়া, স্কুলে এবং কলেজে পড়া—ঘরের কাজের ফাঁকে ফাঁকে এ সবই ছিল তাঁদের জীবনে। গার্গী মাঝে মাঝে হাতে লেখা 'কিশলয়' পত্রিকায় দুটো-একটা লিখেওছেন। তবে সে সব পত্রিকা এখন আর কোথাও পাওয়া যায় না।

বাণী স্বতন্ত্র প্রতিভার অধিকারিণী। ডক্টর বাণী চ্যাটার্জী নামে তিনি স্বদেশে যত পরিচিতা বিদেশেও তাই। বিদেশীদের কাছে রবীন্দ্র সঙ্গীত উপভোগে প্রধান বাধা ভাষা। তাই বাণী হাত দিলেন রবীন্দ্র সঙ্গীত অনুবাদের কাজে। কবির সুর ও ছন্দকে বজায় রেখে তিনি যে গানগুলির অনুবাদ করেছেন সেগুলি বিদেশে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাণীর কম্পোজ করা 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে'র অনুবাদ "In the realms of joy and good' যিনি শুনেছেন

তিনিই এর গুরুত্ব বুঝতে পারবেন। কবি নিজেও চেয়েছিলেন বাণীর কম্পোজ করা গান শুনতে। বাণীর কম্পোজ করা 'জয় ভারতের জয়' গানের প্রশংসা শুনে কবির ইচ্ছে ছিল তাঁর 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গানটিকেও ওয়েস্টার্ণ হারমণিতে পরিণত করবার জন্যে বাণীকেই অনুরোধ জানাবার। সে আর হয়ে ওঠেনি। এখন তো সেই 'জনগণমনে'র একটা স্তবক জাতীয় সঙ্গীত হয়েছে। অথচ বাণীর বেশ মনে পড়ে, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে সময় সংক্ষেপ করার জন্যে 'জনগণমনে'র কিছু অংশ বাদ দিয়ে গাওয়ার অনুমতি চাওয়া হলে কবি সম্মত হননি। তাই গোটা গানটাই গাওয়া হয়। ঐ গানের দলে ছিলেন বাণী।

বাণীর সঙ্গীতেব জ্ঞান ছিল সহজাত। তাই সুরসৃষ্টি করা ছাড়াও বাণী মন দিয়েছিলেন একটা নতুন কাজে। তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র ও সঙ্গীতবিজ্ঞান নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় তো ছিলই, স্বামী ডঃ শচীকুমার চট্টোপাধ্যায়েব সঙ্গে বিদেশে গিযে সে পরিচয় আরো পাকা করে এলেন। এবপর তিনি কতকটা আপন মনেই মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সঙ্গীতকে বিচার করতে বসেন। জিনিসটা একেবারেই নতুন। পবে তাঁর আলোচনা সমাদর লাভ কবে ও তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে বেশ কয়েকটা বক্তৃতা দেবার জন্যে আমন্ত্রিত হন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাঁর বিষয়টা কি ছিল। কোন একটা বিষয় নয় অবশ্য। বাণী সঙ্গীতকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিযে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় উভয় সঙ্গীতের প্রভাবে মনস্তাত্ত্বিক কিংবা অন্য কোন পরিবর্তন বাস্তবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সত্যিই কি সম্ভব? বাণীর প্রশ্ন এটাই। উত্তর দেবার চেষ্টাও করেছেন তিনি। আমরা সব সময় শুনে থাকি গানের মতো শক্তিশালী প্রভাবশালী জিনিষ আর নেই। গানে পাষাণ গলে, বনের পশু বশ হয়। মানুষের মন? সে তো না বদলালে পাষাণকেও হার মানায়। প্রশ্ন, সত্যি সত্যি এই পরিবর্তন সম্ভব কি না? তা যদি হয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তার বিচার বিশ্লেষণ করা যায় কি না। না গেলে ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞরা এক একটা

রাগ ও রাগিণীর মানবান্বিত রূপ দিলেন কি করে? কি করে বললেন 'দীপক' রাগে আগুন জ্বলে, 'মেঘ' রাগ বৃষ্টি নামায়। বাণীর মতে গানের শব্দ হাওয়াতে যে কম্পন সৃষ্টি করে তারই সাহায্যে নানারকম পরিবর্তন সম্ভব হয়। ভারতের সঙ্গীতশিল্পীরা এর সন্ধান রাখতেন এবং এর সাহায্যেই গড়ে উঠেছিল রাগ দর্শন :

"This encourages us to look forward confidently for the time when the truths underlying the science of Raga-Music should be further unearthed and extricated by scientists from the heap of accumulated dabris of ignorence and colourful interpolations perhaps, the hieroglyphics of the Raga-Music deciphered and the sublime philosophy of the Raga-Music, in all its purity, to its pristine glory restored."

বাণীর মতে প্রাচ্য বিজ্ঞানের একটা বিরাট সম্ভাবনাময় দিক লুকিয়ে আছে ভারতীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণীর মধ্যে। রাগসঙ্গীতের চর্চা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে হয়তো সেই সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার খুলে যেতেও পারে। এ নিয়ে বিতর্ক নিশ্চয় আছে। তবু পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ নেই। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের জার্নালে বাণীর কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধের কিছু অংশ ছাপা হয়। অবশ্য তার আগেই তিনি য়ুরোপ সফর করবার সময় এসব বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতার প্রধান বিষয় ছিল, 'সাইকোলজি এ্যাণ্ড মিউজিক' (১৯৩৪), 'সাইকো-মিউজিক ইন্ ওয়ার এ্যাণ্ড আফটার' (১৯৪৪) ও 'মিউজিক ইন্ বেসিক এডুকেশন সাইকোলজি' (১৯৪৯)। পাশের সালগুলো অবশ্য পুস্তিকা প্রকাশের সময়।

এখানকার এশিয়াটিক সোসাইটিতে আরো কয়েকটা বক্তৃতার হদিশ মেলে, 'ডাইভারসনাল থেরাপি এ্যাণ্ড মিউজিক', 'টেগোর এ্যাণ্ড মিউজিক', 'এ্যাপ্লায়েড মিউজিক', 'কালচারাল কনট্যাক্ট এ্যাণ্ড মিউজিক', 'দি ভেদিক সঙ্স এ্যাণ্ড দি

টেগোর', 'ওয়েস্টার্ণ মিউজিক এ্যাণ্ড রাগরাগিণীজ্', 'দি ওয়েস্ট এ্যাণ্ড দি ইস্ট ইন মিউজিক দে মীট', 'ইন্ডিয়ান্ মিউজিক এ্যাণ্ড সিম্ল্টেইনিয়াস্ হারমনি' ও 'কম্প্যারেটিভ স্টাডিজ অব মিউজিক'।

শেষোক্ত বিষয় নিয়ে বাণী এখনও গবেষণা করে চলেছেন। তিনি পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে ভারতীয় রাগরাগিণীর প্রভাব খুঁজছেন। মানুষের মধ্যে, মানব প্রবৃত্তির মধ্যে যদি সাদৃশ্য থাকে তবে গানে কেন থাকবে না? ভাষাহীন সুরেই তো দুটি ধারার সাদৃশ্য থাকার কথা। তিনি দেখেছেন ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যেও আছে 'Harmony' যা একান্ত ভাবে বিদেশী বলেই পরিচিত। এখন বাণী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের তুলনামূলক ইতিহাস লিখছেন।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুবাদের কাজে বাণী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু গান তিনি অনুবাদ করেছেন সুরের সঙ্গে, ছন্দের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে কথা মিলিয়ে। তাঁর অনুবাদ করা গানই বিদেশীদের আকৃষ্ট করে সবচেয়ে বেশি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালযের এশিয়-ভাষাবিভাগের অধ্যাপক এডোয়ার্ড ডিমক বাণীর অনুবাদ করা গান শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে একটা অভিনন্দনপত্র পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠিটি পড়লে বোঝা যায় বাণীর কাজের গুরুত্ব কতখানি। তিনি জানিয়েছেন, সমস্ত পৃথিবীর মানুষই এতে উপকৃত হবেন কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান সম্বন্ধে তাদের কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে পারেনি। একটু বড়ো হয়ে গেলেও ডিমকের পত্রাংশ অনুসরণ করা যাক:

"This is just a note to express appreciation for the work you are doing in translating Rabindranath's song into English. In the first place, anything at all that is done to make the work of that genius more known to the non-Bengali-speaking people of the world is that much to the good. Your work, however, goes on step farther. ~~this~~ The world seems to have some idea, however, vague, of Rabindranath's greatness as a poet, and perhaps somewhat less, of his

greatness as a novelist. But as far as I know, there is very little idea of how very many facets his creative had. He seems to be very little known outside Bengal, for example, as a lyricist and musician, even though he towers, as high in these fields as in the others.

This gap you will be helping to fill by giving the English-speaking world the opportunity to hear Rabindranath's words in translation, sung to his original music. It seems to me a unique and wonderful thing. I am looking forward very much to the publication of your book, but even more to the first performance of the music. For, as you have shown, songs are meant to be sung and heard and not read, I am grateful to you for your work, and when your work becomes known, I will not be alone."

প্রতিমাব নৃত্যশিক্ষার স্কুলের সবচেয়ে উজ্জ্বল বত্ন বোধহয নন্দিতা। রবীন্দ্রনাথের একমাত্র দৌহিত্রী, মীরার মেয়ে বুড়ি বা নন্দিতা। যদিও দৌহিত্রীদের সবাইকে ঠিক ঠাকুরবাড়ির মেযে বলা যায় না তবে নন্দিতাব কথা স্বতন্ত্র। তিনি শান্তিনিকেতনের উৎসবের সঙ্গে প্রথম থেকেই জড়িয়ে আছেন। নৃত্য নিযে কবির নবনিরীক্ষায় তিনি প্রথম থেকেই যোগ দিয়েছিলেন সানন্দে। ১৯৩৬ সালের 'চিত্রাঙ্গদা'র তোড়জোড় শেষ হলে নন্দিতা মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন স্বরূপা চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায়। অবশ্য নাচের পরিকল্পনা চলছিল 'বর্ষামঙ্গল', 'ঋতুরঙ্গে'র সময় থেকেই। শান্তিদেব ঘোষের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে অভিনীত হয়েছিল চল্লিশবার। প্রথমবার কলকাতা থেকে পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন শহরে নাচের দল নিয়ে গিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি সব সময় মঞ্চে স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন। ফলে নৃত্যানুষ্ঠানকে কেউ অবজ্ঞা করতে পারতো না। পাটনা,

দিল্লী, এলাহাবাদ, লাহোর, মীরাট, লক্ষ্ণৌ—সর্বত্র 'চিত্রাঙ্গদা' দারুণভাবে সফল হলো। দলের সকলের অভিনয়ই সুন্দর। নন্দিতা সব সময়ই সাজতেন সুরূপা। তবে অন্যান্য ভূমিকাগুলিও তাঁরা সকলেই জানতেন। একদিন দেখা গেল যমুনা-দেবীর জ্বর। সর্বনাশ! কুরূপা কে সাজবেন, একা নন্দিতাই দুজনের কাজ চালিয়ে দিলেন অবলীলায়! এর উল্টোটাও মাঝে মাঝে ঘটতো।

'চিত্রাঙ্গদা'র সঙ্গে আরো কটি নৃত্যনাট্য তৈরি করা হলো—'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা' ও 'তাসের দেশ'। প্রতিটিতেই নন্দিতার প্রধান ভূমিকা, অনবদ্য অভিনয়। অপূর্ব দেহমুদ্রা ও ভাবব্যঞ্জনায় প্রতিটি চরিত্রই যেন জীবন্ত। আরো কয়েকজনের নামও করা যায়। 'নটীর পূজা'য় শ্রীমতীর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেন গৌরী বসু। একক নৃত্যাভিনয়ে খ্যাতি অর্জন করেন শ্রীমতী হাতিসিং। রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডালিকা'র রূপ দেবার সময় শ্রীমতী ও নন্দিতার কথাই ভেবেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী 'চণ্ডালিকা'য় অভিনয় করেননি। নন্দিতা অবশ্য 'চণ্ডালিকা' ও 'তাসের দেশ' দুটিতেই অভিনয় করেছেন। 'তাসের দেশে' তাঁব ভূমিকা ছিল হরতনীর, শুধু প্রথম অভিনয়ে তিনি দিয়েছিলেন চিঁড়েতনীর রূপ। নাতনী মঞ্চে নামলে কবিও স্বস্তি পেতেন। তাই সময়-অসময়ে ডাক পড়তো তাঁর। কবি লিখতেন মীরাকে :

…"বিপদে পড়েছি। হঠাৎ সংবাদ পেয়েছি, এক ঝাঁক জাপানী আসবে আমাদের নাচের পরীক্ষার জন্য।…বুড়িকে না পেলে এমন একটা লোক-হাসানো ব্যাপার হবে যা সমুদ্র পার হয়ে যাবে।"

নন্দিতাও এসেছেন। অপরিসীম প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণা ছিলেন তিনি। শান্তিনিকেতনে থাকলে সব রকম অনুষ্ঠানেই যোগ দিতে ভালোবাসতেন। আরেকবার ঠিক হলো 'অরূপরতন' অভিনীত হবে। সুরঙ্গমা কে সাজবে? কবির ইচ্ছে ছিল তিনি নিজেই নেবেন সুরঙ্গমার পার্ট কিন্তু অন্যেরা কেউ তাতে রাজী নন তাই বাধ্য হয়েই পার্টটা দিলেন নাতনীকে। আর সুদর্শনা সাজলেন অমিতা।

একটু আগেই বলেছি, কবি জয়শ্রীর অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করেছিলেন।

নন্দিতার ক্ষেত্রে তাঁকে আরো উদার হতে দেখা গেল। কৃষ্ণ কৃপালনী যখন তাঁর কাছে নন্দিতার পাণি-প্রার্থনা করলেন তখন অনুমতি দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেননি রবীন্দ্রনাথ। বিস্মিত হয়েছিলেন কৃপালনী স্বয়ং। তিনি বাঙালী বা ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্ম কিছুই নন তবু কবির সানন্দ সমর্থন তাঁকে অভিভূত করে দিয়েছিল। কবি বিয়েতে নাতনীকে উপহার দিলেন 'পত্রপুট', নবজীবনের মাধুর্য থাকবে যার কাণায় কাণায় ভরে। বিয়ের পরেও নন্দিতা ছিলেন কবির খুব কাছে। দারুণ অসুখের সময় নন্দিতা অন্যান্য শুশ্রূষাকারিণীদের সঙ্গে সমানে সেবা করেছেন দাদামশাইকে। প্রতিদিন সকাল থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে সেবা করতেন নন্দিতা, অমিতা থাকতেন তাঁর সঙ্গে। অমিতার এখনো মনে হয়, 'সেবাশুশ্রূষা করবার ও পরিশ্রম করবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল নন্দিতার।' কবিও যেন সেই সেবার মধ্যে পেয়েছেন সান্ত্বনা :

"দিদিমণি—
অফুরান সান্ত্বনার খনি।
কোনো ক্লান্তি কোনো ক্লেশ
মুখে চিহ্ন দেয় নাই লেশ।
কোনো ভয় কোনো ঘৃণা কোনো কাজে কিছুমাত্র গ্লানি
সেবার মাধুর্যে ছায়া নাহি দেয় আনি।"

এই সেবার প্রয়োজনও একদিন ফুরলো। এরপর নন্দিতা জড়িয়ে পড়লেন নানান্ কাজে।

১৯৪২ সালে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন। স্বাধীনতা আন্দোলন বাংলা দেশে নারী সমাজের মধ্যে যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তার বুঝি তুলনা হয় না। প্রতিটি ঘরের শিক্ষিত অশিক্ষিত মেয়েরা এগিয়ে এসেছিলেন প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে। বাস্তবিক পক্ষে বাঙালী নারীসমাজের পূর্ণমুক্তি ঘটেছে এই বিপ্লবকে কেন্দ্র করেই। চিরলাঞ্ছিতা-অপমানিতা নারীদের মনে স্বাধীনতার বাণী এত সাড়া জাগিয়েছিল কি করে কে জানে? নন্দিতাও কবির মৃত্যুর পর মহাত্মাজীর আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। রাজনীতির

সঙ্গে জড়িত ছিলেন নন্দিতার জ্যাঠতুতো বোন অরুণা গঙ্গোপাধ্যায়ও। পরে যিনি অরুণা আসফ আলী নামে পরিচিতা হন। এ সময় সক্রিয় রাজনীতির উন্মাদনা কম। শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, বীণা ভৌমিক, কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদেদারের সাহসিক কার্যকলাপ হয়ে উঠেছে গল্প। এসেছে অগাস্ট বিপ্লব। বহু নারী এই বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন; এগিয়ে এসেছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা, বাসন্তী দেবী, অমলা দাস আরো অনেকে। যোগ দিয়েছিলেন নন্দিতা, শ্রীমতী, রাণী চন্দ আরো অজস্র বঙ্গললনা। তাঁদের গ্রেপ্তার করা হলে নন্দিতারও কারাদণ্ড হলো ছ মাসের জন্যে। তিনি এসময় রাজশাহী জেলে কারারুদ্ধ ছিলেন।

মায়ের মতোই আত্মপ্রচারে বিমুখ নন্দিতার অধিকাংশ গুণই ঢাকা পড়ে আছে। সব কিছুতেই তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছেন। না হলে তাঁর সম্বন্ধে তথ্য এত কম পাওয়া যাবে কেন? কাজ তো তিনি কম করেননি। শান্তিনিকেতনে থাকার সময় তিনি শিখেছিলেন বাটিক, চামড়ার কাজ, কাপড়ের ওপর ব্লক প্রিন্টিং। ছবি আঁকা শিখেছিলেন নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিংকর প্রমুখ শিল্পীদের কাছে। এখনো চীনা ভবনের দেওয়ালে একটা ফ্রেসকো পেন্টিং তাঁর শিল্প-দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। গানের ক্ষেত্রেও নন্দিতা আত্মপ্রকাশ করেননি। একটিমাত্র রেকর্ডের সমবেত সঙ্গীতে ধরা আছে নন্দিতার কণ্ঠ। গান দুটি হলো 'জনগণমন অধিনায়ক' ও 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে"। নন্দিতার বাকী তিনজন সহশিল্পী ছিলেন শান্তিদেব ঘোষ, সুধীন দত্ত ও অমলা দত্ত। ভারত যেদিন স্বাধীন হয় সেদিন মধ্যরাতে সুচেতা কৃপালনীর সঙ্গে নন্দিতাও গেয়েছিলেন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। এতে বোঝা যায়, নন্দিতার আত্মপ্রচারবিমুখতা কুণ্ঠার গুণ্ঠনে ঢাকা নয়। এ তাঁর স্বাভাবিক নিস্পৃহতা। নয়তো যখন যেখানে ডাক পড়েছে দেশে কিংবা বিদেশে নন্দিতা এগিয়ে এসেছেন হাসিমুখে। ১৯৫০ সালে মৃণালিনী সরাভাইয়ের নৃত্যদলের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা এবং ১৯৬০ সালে সোভিয়েট সরকারের আমন্ত্রণে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে গিয়ে একটি ব্যালে নৃত্যের দলকে 'চিত্রাঙ্গদা'

নৃত্যনাট্য শিখিয়ে আসা এমনি দুটি ঘটনা। অবশ্য দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের ভারতীয় দূতাবাসে সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের অধিকর্তা ছিলেন কৃষ্ণ কৃপালনী। নন্দিতা স্বামীকে নানাভাবে সাহায্য করেন; তাছাড়া ব্রাজিলের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গেও পরিচিত হন এবং 'দেশ' সাপ্তাহিকে তাঁর দক্ষিণ আমেরিকা সফরের বিষয়ে কিছু লেখেন। নন্দিতার লেখার হাত ভালো হলেও তিনি লেখিকা নন। কিছু চিঠিপত্র এবং সফর কাহিনীতে তাঁর কলমের শক্তির পরিচয় ছড়িয়ে আছে। তবে নন্দিতার সব কিছুই যেন অসমাপ্ত-অর্ধসমাপ্ত রয়ে গেছে। নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, লেখা—কোন কিছুতেই সবাইকে ছাপিয়ে ওঠেননি। অন্যান্য অসমাপ্ত জিনিষের সঙ্গে আরো একটা জিনিষ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। সেটি হলো একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র। নন্দিতা তাতে মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু অর্থাভাবে চিত্রটি সম্পূর্ণ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই 'দিদিমণি'টিকে নিয়ে অনেক কিছু লিখেছেন। কিন্তু নন্দিতাকে নিয়ে এখনো পর্যন্ত ভালোরকম আলোচনা হয়নি বললে ভুল হবে না। অনেকেই কবি-দৌহিত্রী হিসেবে নন্দিতাকে খুব মনে রেখেছেন কিন্তু নন্দিতাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে খুব কম। নিকট আত্মীয়রূপে নন্দিতা যে মহামানবকে পেয়েছিলেন তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য নন্দিতার একক ব্যক্তিত্বকে যেমন খানিকটা ঢেকে রেখেছিল তেমনি কয়েকটি রাবীন্দ্রিক গুণেরও অধিকারী করে তুলেছিল। অপরিসীম রোগযন্ত্রণা সহ্য করে তিনি যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রকৃতপক্ষে সেদিনই ঠাকুরবাড়ির অঙ্গন থেকে মুছে গেল শেষ রবিরেখা! রেখে গেল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে অতুল বৈভব!

আবার ঠাকুরবাড়ির বৌয়েদের কথায় ফিরে আসি। এইখানেই আমাদের গল্প শেষ হবে। কারণ অস্তরবির শেষ আশীর্বাদ নিয়ে যে কয়েকটি মেয়ে এ যুগেও নিবু নিবু প্রদীপের সলতে উস্কে দিয়ে ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বা এই সেদিন পর্যন্ত রেখেছিলেন তাঁরা এসেছিলেন বধূরূপে। এঁদের নাম শ্রীমতী, অমিতা, অমিয়া, মেনকা ও পূর্ণিমা। এ প্রসঙ্গে আরেক জনের নাম করতে পারি

তিনি নন্দিনী, রথীন্দ্র ও প্রতিমার পালিতা কন্যা। কবির আদরের 'পুপে' দিদি—'সে' গল্প এঁকে শোনানোর জন্যেই লেখা হয়েছিল। তিনিও বিভিন্ন নৃত্যগীতানুষ্ঠানে নিয়মিত যোগ দিতেন। এবার তাকানো যাক অন্যান্যদের মুখের দিকে।

ঠাকুরবাড়ির বৌ হবার অনেক আগেই শ্রীমতী রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছিলেন। আমেদাবাদের অভিজাত হাতি সিং পরিবারের মেয়ে শ্রীমতী মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সেখানকার কলেজে পড়া ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন শান্তিনিকেতনে। সেটা বোধহয় ১৯২১ সাল। উদ্দেশ্য ছিল ছবি আঁকা শেখা। শুরুও করেছিলেন কিন্তু তাঁর প্রতিভা বিকাশের মাধ্যম হলো চিত্র নয় অন্য একটি শিল্প। শান্তিনিকেতনে তখন প্রতিমার তত্ত্বাবধানে ভাবনৃত্য শেখার ব্যবস্থা হচ্ছে, মণিপুর থেকে এসেছেন নৃত্যশিক্ষক নবকুমার—তাদের দলেই ভিড়লেন শ্রীমতী। নৃত্যছন্দে নূপুরের ঝংকারে দেহভঙ্গীতে ফুটে উঠলো নতুন রূপ। তবে নন্দিতা-যমুনা-নিবেদিতার মতো শ্রীমতীকে শান্তিনিকেতনের ছাত্রী বোধহয় বলা চলে না কারণ তাঁর নৃত্য ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব আবিষ্কার। তবু তাঁর শিক্ষা শুরু হয়েছিল শান্তিনিকেতনেই তাতে সন্দেহ নেই। প্রচলিত ধরাবাঁধা কোনো নাচের মধ্যেই শ্রীমতীর নৃত্যভাবনা সার্থক রূপ নিতে পারেনি। তাই তিনি নৃত্যকে নতুন রসে পুষ্ট করে সৃষ্টি করলেন নব্য আঙ্গিকের। সেই প্রথম পর্বে এটা কি করে সম্ভব হলো কে জানে তবে শ্রীমতীর নাচ আজও একটা ব্যতিক্রম বলেই মনে হবে।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা শেষ করে শ্রীমতী জার্মানীতে গিয়েছিলেন শিশুশিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে। কিন্তু ওখানে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে যা শিখলেন তা হলো নাচ। য়ুরোপে তিনি নানা জায়গায় ঘুরেছেন, নাচ দেখেছেন, দেখিয়েছেনও। বিদেশে তিনি দেখাতেন ভাবতীয় নৃত্য—যার সবটাই তাঁর নিজস্ব, মণিপুরী আঙ্গিকের ওপর গড়ে তোলা অভিনব নৃত্যভঙ্গিমা। শোনা যায়, এসময় তিনি য়ুরোপের মডার্ণ ডান্সের আঙ্গিক আয়ত্ত করেন মেরি উইগম্যান প্রবর্তিত আধুনিক নাচের স্কুলে, জার্মানীতে। নাচের স্কুলে ধরাবাঁধা শিক্ষা তিনি খুব বেশি নেননি, তবে নাচ দেখেছেন প্রচুর। ভারতে ফিরে শ্রীমতী

যখন তাঁর নতুন আঙ্গিকের ভাবনৃত্য রবীন্দ্রনাথকে দেখালেন তখন কবিও খুব আনন্দিত হলেন।

ভারতবর্ষে শ্রীমতী নৃত্য পরিবেশন করেন রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে। সে এক নতুন জিনিষ। গানের সঙ্গেও নেচেছেন শ্রীমতী কিন্তু তেমন আনন্দ পাননি। ছন্দ-সুরের দোলায় মন যে আপনি নেচে ওঠে। শ্রীমতীর নৃত্যে যে অমিত বিত্ত রয়েছে তার চরম স্ফূর্তি ঘটবে কিসে? প্রথমে 'ঝুলন' কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে নিজস্ব আঙ্গিকে নেচে শ্রীমতী সবাইকে মুগ্ধ করলেন। দেখা গেল, যে কবিতায় সুরের দোলা নেই, সেই কবিতাকে অবলম্বন করেই শ্রীমতীর ভাবনা রূপের মধ্যে আকার নিয়েছে। 'ঝুলনে'র পর 'শিশুতীর্থ' আরো কঠিন। আরো দুরূহ! তা হোক। সহজের সাধনায় মন ভরে কই? 'শিশুতীর্থ' কবিতা নাচের পক্ষে বড়ো শক্ত। কল্পনাটাই কষ্টকর। শ্রীমতী তাকেই বেছে নিলে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। য়ুনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে সব ব্যবস্থা হলো। রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির সঙ্গে শ্রীমতী দেখালেন তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে 'ঝুলন' ও 'শিশুতীর্থে'র ভাবনৃত্য। এখনকার দিনেও এ পরিকল্পনা অসম্ভব রকমের আধুনিক। কবিতার সঙ্গে ভাবনৃত্য পরিবেশনে শ্রীমতীর সঙ্গে আরো একজনের নাম অবশ্য আমরা করতে পারি। তিনি কবি অমিয় চক্রবর্তীর বিদেশিনী স্ত্রী হৈমন্তী। তিনি নেচেছিলেন 'কল্পনার' 'দুঃসময়' কবিতার সঙ্গে। কিন্তু এঁদের উত্তরসূরী হিসেবে আর কাউকে এখনও পাওয়া যায়নি। শ্রীমতীর নিপুণ নৃত্যভঙ্গী মুগ্ধ করেছিল কবিকে। মুগ্ধ হয়ে তিনি লিখলেন:

"She takes delight in evolving new dance forms of her own in rythmic representation of ideas that offer scope to her spirit for revelling in its own everchanging creations which according to me is the proper function of dance and a sure sign of her genius. It has often caused me great surprise to see how with perfect truth and forcefulness she has harmonised her movements with my own recitation of

my poems—a most difficult task requiring not only a perfect fluency of technique but sympathy which is creative in its adaptability. Her dance is never languid and suggestive of allurements that cheapen the art. She is alert and vigorous and the cadence of her limbs carries the expression of an inner meaning and never are on exhibition of skill bound by some external canons of tradition.

পরবর্তী জীবনে শ্রীমতী আরো রবীন্দ্র-কবিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন কম তবে নাচ দেখিয়েছেন অনেক জায়গায়, সুদূর মাদ্রাজে, সিংহলে। সর্বত্র পেয়েছিলেন অভাবিত সমাদর। নাচ দেখেওছেন—রুক্মিণী দেবীর নাচ শ্রীমতীর খুব ভালো লেগেছিল। তাঁর নিজের 'বিশ্বচ্ছন্দ', 'লীলাবৈচিত্র্য' কিংবা 'দি রোড টু ফ্রিডম্' ব্যালেও বেশ নতুন ধরণের। তাঁর সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য নাচের অনুষ্ঠান হয় নিউ এম্পায়ারে ১৯৫০ সালে। সেখানে তিনি সৌম্যেন্দ্রনাথের আবৃত্তির সঙ্গে স্বপরিকল্পিত নাচ দেখিয়েছিলেন। এ কবিতাটি একটি অসাধারণ নির্বাচন কারণ 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার 'দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, কে নৃত্যভঙ্গিমায় ফুটিয়ে তোলা কষ্টসাধ্য। শিল্পকলার প্রতিটি শাখাই যেন শ্রীমতীর স্পর্শে শ্রীময়ী হয়ে উঠেছিল। তাঁর মধুর কণ্ঠে গাওয়া ভজন শুনতে মহাত্মা গান্ধী খুব ভালোবাসতেন। পরেও ভজন গানের কয়েকটা রেকর্ড করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে শিখেছিলেন ছবি আঁকা। শেষ জীবনেও ছবি আঁকা, কারুশিল্প এসব নিয়েই থাকতেন। সব সময় চেষ্টা করতেন নিজের পারিপার্শ্বিককে কিভাবে সুন্দর করে তোলা যায়। তাই মাঝে মাঝে লিখতেনও নাচ কিংবা ছবি সম্বন্ধে দু চারটে প্রবন্ধ। গানের স্কুল, আর্ট স্কুল প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল তবে আন্তরিক উৎসাহ ছিল শুধু নাচের বেলায়। কলকাতায় নিজের বাড়িতে একটা স্কুল খুলেও ছিলেন কিন্তু সত্যিকারের উৎসাহী ছাত্রের অভাবে হতাশ হয়েই তাঁকে বন্ধ করে দিতে হলো 'নৃত্যকলা'। গতানুগতিকের পুনরাবৃত্তি তাঁর কাছে অসহ্য।

শ্রীমতী ঠাকুরবাড়ির বৌ হয়েছিলেন ১৯৩৭ সালে। এই প্রথম ঠাকুরবাড়ির ছেলের সঙ্গে গুর্জর তনয়ার বিয়ে। রাজনৈতিক জীবনে সৌম্যেন্দ্র ছিলেন চরম পন্থী। শ্রীমতী যোগ দিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনে, গিয়েছিলেন জেলে। তারপরের জীবনে শ্রীমতী সবে এসেছেন রাজনীতির জগৎ থেকে। সংগঠনের কাজে তাঁর কৃতিত্ব কম ছিল না। চল্লিশের দশকে 'বচনা' নামে নারী প্রতিষ্ঠান তারপর 'অভিযান', 'বৈতানিক' সবশেষে 'সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' তাঁর গঠন মূলক কাজের পরিচয় বহন করে। শিল্প জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকলেও তাঁর কোন সার্থক উত্তরাধিকারী নেই। বাংলা দেশে নৃত্য নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। এসেছেন উদয়শংকর ও অমলাশংকর। শান্তি-নিকেতনেও হয়েছে রবীন্দ্র-নৃত্যধাবার সযত্ন অনুশীলন তবু শ্রীমতীর প্রতিভা সার্থক হলো না অন্যের মধ্যে। এখনও কবিতার সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন, 'ঝুলন', 'শিশুতীর্থে'র সঙ্গে ভাবনৃত্য পরিকল্পনা অসম্ভব রকমের আধুনিক।

অমিতার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ বহুদিনের। তিনি একাধারে কবির নাতনী-নাতবৌ এবং "মহিষী"। অমিতা লাবণ্যলেখার মেয়ে। যাঁকে কবি নিজের মেয়েদের সঙ্গে পরম স্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। অকাল-বৈধব্যের অভিশাপ থেকে বাঁচাবার জন্যে পুনর্বিবাহ দিয়েছিলেন স্নেহাস্পদ অজিত চক্রবর্তীর সঙ্গে। অমিতা তাঁরই মেয়ে, পরে তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল দ্বিজেন্দ্র-নাথের এক পৌত্র অজীন্দ্রনাথের। অভিনয় এবং গান—শান্তিনিকেতনের অনুকূল পরিবেশে খুব সহজেই শিখতে পেরেছিলেন অমিতা। তবু শংকা ঘুচতো না। একরকম জোরজার করেই রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ তাঁকে স্টেজে নামাতেন। নন্দিতাকে লেখা কবির চিঠি পড়লে দেখা যায় তিনিও লিখছেন, "বহু কষ্টে অমিতাকে সুদর্শনার পালায় নামাতে পেরেছি। শেষ পর্যন্ত টিঁকলে হয়।"

অভিনয় অবশ্য ভালোই করতেন অমিতা। 'নটীর পূজায়' অমিতা সাজতেন 'মালতী'। আকন্দ ফুলের মালা জড়ানো বেণী চুড়ো করে বেঁধে, গলায় কুঁচ

ফলের মালা, হাঁটু পর্যন্ত উঁচু করে পরা শাড়ির আঁচলটি কোমরে জড়িয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আকুল স্বরে তিনি যখন "যার ডাকে আমার ভাই গেল চলে। যার ডাকে আমার—" বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়তেন তখন সমস্ত দর্শক যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত। অভিনয় শেখাতেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

'তপতী'র অভিনয় হয়েছিল আরো পরে। অমিতা তখন জোড়াসাঁকোয় বৌ হয়ে এসেছেন। হঠাৎ ডাক এলো। তপতীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রথমে ইতস্ততঃ করেছিলেন। "ও কি পারবে? এ বেশ শক্ত মেয়ের কাজ।" তবু দিনেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে দ্বিধান্বিত মন নিয়ে ডেকে পাঠালেন অমিতাকে। অভিনয় দেখে অবশ্য খুব পছন্দ হয়ে গেল। এক নাগাড়ে তিন মাস রিহার্সাল চললো। তারপর অভিনয়। রাজা বিক্রম রবীন্দ্রনাথ আর অমিতা তাঁর মহিষী। সে অনবদ্য অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা ভোলেননি। একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী অবন ঠাকুর। তিনি 'নটীর পূজা'য় নন্দলাল বসুর মেয়ে গৌরীর অভিনয় দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন তেমনি অভিভূত হয়েছিলেন 'তপতী' দেখে। "অমিতা তপতী সেজে অগ্নিতে প্রবেশ করেছে। সেও এক অদ্ভুত রূপ। প্রাণের ভিতরে গিয়ে নাড়া দেয়।" সেই সঙ্গে স্বীকার করেছেন পরে যত অভিনয়ই হয়ে থাক "অমন আর দেখলুম না—"। 'তপতী' সাজবার পরে কবি অমিতাকে ডাকতেন 'মহিষী' বলে। পাঠাতেন পত্রলিপি :

> "মহিষী
> তোমার দুটি হাতের সেবা
> জানি না মোরে পাঠালো কেবা
>   যখন হোলো বেলার অবসান—
> দিবস যখন আলোক হারা
> তখন এসে সন্ধ্যা তারা
>   দিয়েছে তারে পরশ সম্মান।"
> ৩ বৈশাখ ১৩৪৬   বিক্রম।"

অমিতার হাতের সেবা ছাড়াও আরো একটা দুর্লভ গুণ ছিল। তিনি লিখতে পারতেন। কিন্তু বড়ো সংকোচ। মা বকেন। কতজন এসে কবিকে লেখা দেখায়, ভুল শুধরে নিয়ে যায় আর অমিতা পারবেন না? শেষে বাধ্য হয়েই ভীরু পায়ে গেলেন গুরুদেবের কাছে। কবি বললেন, "তুই লিখিস, না?" পড়ে খুশি হয়ে বললেন, "এত সহজ তোর ভাষা যে আমি আর এতে হাত দিতে চাই নে।"

উৎসাহ পেয়ে অমিতার খাতা ভরে ওঠে। ছাপা হয় 'অঞ্জলি' আর 'জন্মদিন'। আশ্চর্য সহজ সরল প্রাণের কবিতা :

"যবে শুধায় সকলে মোরে, তুমি কি পেয়েছ
কই দেখালে না আজি?
মৌন নতমুখে থাকি, কি দিব উত্তর—
কি পেয়েছি আমি?···
অন্তহীন পাওয়া সে যে ঋতুতে ঋতুতে
বর্ণে গানে বিচিত্রিতা মাঝে,
শূন্য পাত্র পূর্ণ করি রাখে যে সদাই
তাই মোর দুঃখ কিছুই নাই।"

কবিতার মতো অমিতার গদ্য লেখার হাতও ভালো। মনেই হয় না যে প্রবন্ধ পড়ছি। প্রবন্ধ পড়তে পড়তে স্মৃতিকথা, ছবি আঁকা, গল্প বলা—একটার পর একটায় আপনি মন চলে যায়, পড়া শেষ হলে পর মনের কোণে মিশে থাকে মাধুরীর রেশ। দেখা যায়, অমিতা খুব সংক্ষেপে একটা চরিত্রকে চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। অথচ জীবনী-স্মৃতিকথা-প্রবন্ধ কোনটাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। একবারও স্মৃতি এসে হাত চেপে ধরেনি প্রবন্ধের, তত্ত্ব এসে ঘুরিয়ে দেয়নি মাথা। অমিতার প্রবন্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় এবং অভিনয় সংক্রান্ত অনেক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, কবি কণ্ঠস্বরের ওপর জোর দিতেন। নজর রাখতেন শেষের কথাগুলি অস্পষ্ট বা অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে না যায়। কবি ভুলে যেতেন বলে সহ অভিনেতাদের সব সময় কবির ডায়লগ মনে রাখতে হতো, নয়তো তিনি নতুন

কথা বানাতে শুরু করে দিতেন, তাল রাখতে হিমসিম খেতে হতো অন্যদের। অমিতা এখনও বড়ো করে বিশেষ কিছু লেখেননি। ছোট ছোট প্রবন্ধেই অনেক কথা বলতে চেয়েছেন। রেকর্ডেও গেয়েছেন একটিমাত্র গান, সেও 'পঞ্চকন্যা' নামক এল. পি. রেকর্ডে। গানটি হলো "তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে"।

পূর্ণিমার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগ অন্যান্য বৌয়েদের চেয়ে অনেক বেশি। তিনি দ্বিপেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী আবার সুরেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ। মনে হতে পারে, কেমন করে সম্ভব হলো। সাধারণতঃ এত নিকট সম্বন্ধের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ নিষিদ্ধ না হলেও প্রায়ই হয় না; কিন্তু ঠাকুরবাড়ি নিজেদেব মধ্যেই একটা সমাজ গড়ে নিয়েছিল। না হলে পিরালী ও ব্রাহ্ম এই দুই বাধা অতিক্রম করতে অনেক সময়েই খুব কষ্ট হয়েছে। দ্বিপেন্দ্রের মেয়ে নলিনীর বিয়ে হয়েছিল বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারে। অর্থাৎ নলিনী তাঁর দুই পিসী প্রতিভা ও ইন্দিরার ছোট জা হয়েছিলেন। তাঁর দুই মেয়ে পূর্ণিমা ও অপর্ণা। অপর্ণার কথা আগেই বলেছি। তাঁর বিয়ে হয়েছিল গগন ঠাকুরের ছেলের সঙ্গে। পূর্ণিমার সঙ্গে সুবীরেন্দ্রের। ডায়াসেশন থেকে বি এ পাশ করে পূর্ণিমাও যোগ দিয়েছেন পারিবারিক গান ও অভিনয়ের আসবে। তবে খুব বেশি নয়। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'য় লক্ষ্মী, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় বালিকা, 'মায়ার খেলা'য় অমর, 'চিরকুমার সভা'য় পুরবালা এই সব চরিত্রে অভিনয় করতেন। পূর্ণিমা গ্র্যাজুয়েট হবার পর রবীন্দ্রনাথ বললেন নলিনীকে, 'তোর মেয়েকে নিয়ে যাবো। আমার স্কুলে ইংরেজি পড়াবে।' স্কুলে পড়ানো ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের রক্তে আছে। তাই খুব সহজেই পূর্ণিমা এসে শান্তিনিকেতনে একটানা দেড় বছর ইংরেজী পড়ালেন। এসময় তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় লীলা মজুমদারের। আজও তাঁদের মধ্যে নিবিড় সখ্য অটুট রয়েছে।

সুবীরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় গৌড় বিল অনুসারে, রেজিষ্ট্রি করে। সেজন্য পুরোহিত পাওয়া গেল না। পৌরহিত্য করেন ঠাকুরবাড়িরই দুটি মেয়ে—সরলা ও হেমলতা। ঘটনাটি ইন্দিরা তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনী 'শ্রুতি ও স্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন। এর পরেও পূর্ণিমা শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে শিক্ষকতা

করেছেন দীর্ঘদিন। ঘরের কাজ ছাড়াও ছিল 'আলাপিনী সমিতি' ও 'নারীকল্যাণ সমিতি'; সব কাজেই তিনি সবচেয়ে বেশি উৎসাহ পেতেন তাঁর 'নমা' অর্থাৎ ইন্দিরার কাছ থেকে। জন্ম থেকেই দেখছেন সেই মহিয়সী নারীকে। তাই ইন্দিরার মৃত্যুর পরে পূর্ণিমা নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন একটা গুরুতর কাজ। কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি শুরু করলেন ইন্দিরাব প্রামাণ্য জীবনচরিত লিখতে। ইন্দিরা-সংক্রান্ত সমস্ত উপাদান ও স্মৃতিকথা জড়ো করা হলো। সত্যি কথা বলতে কি যে কাজে অনেকদিন আগেই হাত দেওয়া উচিত অথচ আজো মনোযোগ দেওয়া হয়নি ঠিক সেই কাজটাই ধবেছেন পূর্ণিমা। বান্ধবী লীলা মজুমদার উৎসাহ ও প্রেরণা জোগালেন। আপাততঃ লেখা শেষ, শুধু প্রেসে দেওয়া বাকী। তাঁর লেখাটি মন দিয়ে পড়লে লক্ষ্য করা যাবে, অতি প্রিয়জনের জীবনী লিখতে বসেও পূর্ণিমা নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন অনেক দূরে। তিনি ইন্দিরাব খুব কাছের মানুষ, স্বাভাবিক কারণেই বইয়ের মধ্যে একটি চরিত্র হয়ে উঠেছেন। কিন্তু কোথাও বিনা কারণে তাঁকে পাওয়া যাবে না। এই সংযম আছে তাঁর লেখার মধ্যেও। ইন্দিরার জীবনী লিখছেন তিনি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ও চৌধুরীবাড়ির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে তিনি ইন্দিরার জীবনকথা আলোচনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে যাঁরা ইন্দিরাকে দেখেছেন তাঁদেব রচনাংশও উদ্ধৃত করা হয়েছে। এর ফলে ইন্দিরাব জীবনী যতটা প্রামাণ্য গবেষণাধর্মী হয়ে উঠেছে ততখানি সরস হয়তো হয়নি কিন্তু ঘরোয়া ইন্দিরাকে যেন এখানেই সবচেয়ে বেশি আপন করে পাওয়া গেল। পূর্ণিমার লেখার ভাষাটিও সাবলীল। অনাবশ্যক গল্প করে বইকে লঘু ও সরস করে তোলার প্রলোভন যেমন জয় করেছেন তেমনি মানবী ইন্দিরাকেও জীবন্ত করে তুলেছেন। একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বিশ্বভারতীর উপাচার্যা হিসেবে ইন্দিরাকে অনেক কাজ করতে হতো। একবার এক অধ্যাপক বিশ্বভারতীব বিরুদ্ধে মামলা করেন। পুলিশ-এনকোয়ারী ইত্যাদি হলে তিনি খুব সরস করে অন্তরঙ্গদের বলতেন, "দেখ্ জীবনে নানারকম অভিজ্ঞতা হয়েছে দীর্ঘায়ু হবার দরুন—কিন্তু এ এক অভিনব

পরিস্থিতি। শেষ বয়সে জেলে গিয়ে না লপ্সী খেতে হয়।" পূর্ণিমার বই প্রকাশিত হলে ইন্দিরার সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা জানা যাবে। পূর্ণিমা প্রসঙ্গে আরো তিনজনের কথা এখানে বলে নিতে পারি। স্থরেন্দ্রের অপর তিন পুত্র প্রবীরেন্দ্র, মিহিরেন্দ্র ও স্থমন্তেন্দ্র। প্রবীরেন্দ্রের স্ত্রী অণিমা, মিহিরেন্দ্রের স্ত্রী লীলা ও স্থমন্তেন্দ্রের স্ত্রী সতীরাণী। সতীরাণী স্থগায়িকা হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতা। 'চিরকুমার সভা'র একটি অভিনয়ে তিনি সেজেছিলেন নৃপবালা।

হেমেন্দ্র পরিবারে এসেছেন ভিন্ন পরিবারের আরো পাঁচটি মেয়ে। অমিয়া, মেনকা, আরতি, পারুল ও স্মৃতি। শেষের তিনজনের কথাই আগে বলি। কারণ এঁরা ঠাকুরবাড়ির বৌ হলেও আমাদের নির্দিষ্ট কাল সীমার একেবারে শেষ পর্বে তাঁরা এসেছেন। শুভো ঠাকুরের স্ত্রী আরতি স্থলেখিকা। লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার কয়েকটি বইয়ের অনুবাদ ছাড়াও আরতি লিখেছেন দু-তিনটি উপন্যাস। 'ছায়ারঙ্গ' স্বচ্ছন্দ গতিতে লেখা আধুনিক উপন্যাস। তাঁর অনূদিত বেজবড়ুয়ার 'আমার জীবনস্মৃতি' ও 'গাঙচিলের ডানা' অত্যন্ত সুখপাঠ্য সরস অনুবাদ। সিদ্ধীন্দ্রনাথের স্ত্রী পারুল প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে। তাঁর মা প্রেমিকা দেবীও পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ির মেয়ে। পারুল নিজেও 'মণিকা দেবী' নামে প্রথম যুগের কয়েকটা ছবিতে অভিনয় করেন। তাঁকে আমরা কেশব সেনের নাতনী সাধনা বস্থর সমসাময়িক বলতে পারি। বাসবেন্দ্রনাথ ঠাকুরে স্ত্রী স্মৃতি জানেন ভালো ছবি আঁকতে। এঁরা তিনজনেই ছিলেন ঋতেন্দ্রনাথের তিন পুত্রবধূ। এরপব আমবা গান-পাগল ঠাকুরবাড়ির দুটি স্থযোগ্যা বধূর কথায় আসি। অমিয়া ও মেনকা দুজনেই স্থগায়িকা, অসাধারণ স্থকণ্ঠের অধিকারিণী।

হিতেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ অমিয়া ঠাকুর বাড়িতে বৌ হয়ে আসার আগেই স্থগায়িকারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। অমিয়ার বাবা স্থরেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন সঙ্গীতরসিক। তাই খুব ছোটবেলা থেকেই মুসলমান ওস্তাদের কাছে গান শিখতেন অমিয়া। উর্দু গজল, হিন্দুস্থানী গান—প্রথম প্রথম ভালো লাগতো না

কিন্তু গলা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আজো শুনলে প্রাণে বাজে। একবার শুনলে মনে হয় আবার শুনি। অমিয়াকে ঠাকুরবাড়িতে এনেছিলেন হেমেন্দ্রনাথের মেয়ে মনীষা। সরলা তখন 'মায়ার খেলার' অভিনয়ের জন্যে মেয়ে খুঁজছেন। ভারি পছন্দ হবে গেল অমিয়াকে। প্রমদার ভূমিকায় সুন্দর মানাবে। 'যেমন রূপ তেমনি গলা। বেথুনের ছাত্রী অমিয়া। সেখানে স্কুল-কলেজের মেয়েরা মাঝে মাঝে নাটক অভিনয় করতো। সবেতেই অংশ নিতেন অমিয়া—'চন্দ্রগুপ্তে' হেলেন, 'নূরজাহানে' নূরজাহান। বাংলা দেশে তখন দ্বিজেন্দ্রলালের যুগ চলছে। সরলা দুদিনে অমিযাকে প্রমদার সব গান শিখিয়ে দিয়ে নিয়ে গেলেন কবির কাছে। দুরুদুরু বুকে কবির কাছে এসে দাঁড়ালেন অমিয়া। তবে তিনি নিজেকে যতটা অপরিচিতা ভাবছিলেন তা নয়। কবি তাঁর নাম আগেই শুনেছিলেন স্নেহলতা সেনের কাছে। ১৩২৯ সালে প্রশান্ত মহালানবীশকে লেখা চিঠিতেও দেখা যাবে, "বেথুন কলেজে অমিযা রায় বলে একটি মেযে আছে, তার গলা ঝুনুর চেয়েও ভালো।" সুতরাং কোন অসুবিধে হলো না। কবি অনিন্দ্যসুন্দর ভঙ্গীতে নেচে নেচে অমিয়াকে শিখিয়ে দিলেন "দে লো সখি দে" গানটি। এবার অবাক হবার পালা অমিয়ার। কী সুন্দর কোমল রমণীয় ভঙ্গী! দীর্ঘদিন রিহার্সাল চলার পর 'রক্সি' সিনেমা হলে যে সেই 'মায়ার খেলা'র অভিনয় দেখেছে সেই শুধু বলতে পারে কি সুন্দর অভিনয় হয়েছিল। শান্তা সেজেছিলেন রুমা গুহের মা সতী দেবী। কুমার বোধহয় সুধীন্দ্রনাথের মেযে রমা। সবার অভিনয় ছাপিয়ে চোখে পড়েছিল প্রমদাকে। 'মায়ার খেলা'র প্রথম প্রমদা ইন্দিরা তো ভাবি খুশি, 'এমনটি বুঝি আর দেখা যায় না।'

এরপর বৌ হয়ে ঠাকুরবাড়িতে এলেন অমিয়া। নিভৃতে সবার চোখের আড়ালে চলে সঙ্গীত সাধনা। আগে শিখেছিলেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। এবার শিখলেন দিনেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরার কাছে। কবি যখন শান্তিনিকেতন থেকে আসতেন ডেকে পাঠাতেন অমিয়াকে। গান শুনতেন, শেখাতেন—এভাবেই অনেক কিছু শেখা হয়ে গেল। কবির সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রথম প্রকাশ্যে গান করলেন অমিয়া। এ ব্যাপারে তাঁর

স্বামী ও শ্বশুর বিশেষ আগ্রহ দেখাননি বলে অমিয়া আড়ালে থাকতেই ভালোবাসতেন। অবশ্য গান শেখায় তাঁরা বাধা দেননি বরং উৎসাহই দিয়েছেন। য়ুনিভারসিটি ইন্‌স্‌টিটিউট হলে অমিয়া প্রথমদিন গাইলেন 'মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে'। সঙ্গে এস্রাজ বাজালেন দিনেন্দ্রনাথ। সবাই চিত্রার্পিত। এমন মধুর সাবলীল কণ্ঠ! যেন পাখির মতো! সুধীন্দ্রনাথের মেজো মেয়ে এণা কথা প্রসঙ্গে জানান যে, সেকালে তিনি অন্যদের মুখে শুনেছিলেন অমিয়ার গলা অভিজ্ঞার কণ্ঠের মতো সুন্দর কিন্তু তিনি নিজে তো আর অভিজ্ঞার গান শোনেননি তাই তুলনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথেব খুব ভালো লেগেছিল অমিয়ার গান, তাই পরদিন আবার শুনতে চাইলেন। দ্বিতীয় দিন অমিয়া গাইলেন 'কাঙ্গাল আমারে কাঙ্গাল করেছ'।

একটা রেকর্ডও করেছিলেন অমিয়া। শৈলজারঞ্জন মজুমদার খুব যত্নে শিখিয়ে-ছিলেন 'হে নূতন দেখা দিক' ও 'সমুখে শান্তির পারাবার'। এরপব স্বামীর অকালমৃত্যু হবার পর ছেলেমেয়েদেব মানুষ করা, উড়িষ্যায় নিজেদের জমিদারী দেখাশোনা কবার কাজেই ব্যস্ত ছিলেন অমিয়া। তারই মাঝে মাঝে গান শিখতে বা বুঝে নিতে এসেছে কেউ কেউ—শিখিযে দিয়েছেন তাদের। গানের ক্লাস নিয়ে নয়, গান শুনিয়ে। স্বরলিপি দেখে নয়, অমিয়া গান শিখতেন শুনে। কটকেও বোধহয় 'বর্ষামঙ্গল' বা এইরকম আবো কয়েকটা অনুষ্ঠানে তিনি মেয়েদের গান শিখিয়েছিলেন।

ইদানীং আবার সকলের অনুরোধে গান গাইছেন অমিয়া। গান গাইতে তাঁর ভালোই লাগে। এণার মেয়ে কৃষ্ণা থাকেন প্যারিসে। সেবার এসে অমিয়ার কয়েকটা গান নিয়ে গেলেন টেপ করে। বললেন, "নিয়ে যাবো। ওখানে শোনাবো।" খালি গলায় গাওয়া, তায় বয়স হয়েছে। কি জানি ওদের কেমন লাগবে। সংকোচ যায় না যেন। কৃষ্ণা শুনলেন না। তারপর ফ্রান্স থেকে এলো প্রশংসামুখর চিঠি। ভাষা বোঝে না। তবু অমিয়ার গানের দরদ নাড়া দিল বিদেশীর মনকে। এরপর এলেন সত্যজিৎ রায়। তাঁর 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির জন্যে একটা গান গাইতে হবে। একেবারে খালি গলায়। কারণ সিনেমায় ম্যালেব

এক নির্জন বেঞ্চে বসে গানটিতে ঠোঁট মেলাবেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার রেকর্ডিং করতে হবে? একেবারে ভালো লাগে না অমিয়ার। 'একবার বলে এটা হয়নি, আবার বলে ওটা হয়নি।' ওসব ঝামেলা তাঁর ভালো লাগে না। তাঁর মাসতুতো বোনেরা তো এককালের নামী-দামী অভিনেত্রী লীলা দেশাই ও মণিকা দেশাই। তাঁরা বলতেন, "তুমি যদি ফিল্মে গান করো অনেক নাম হবে। অনেক টাকা হবে।" তাতেই অমিয়া কান দেননি। আর এখন! তবু সবার অনুরোধে গাইতে হলো। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র 'এ পরবাসে রবে কে' গান রেকর্ডিং হবার পর দেখা গেল ভালোই হয়েছে।

এই সেদিনও ১৯৭৬ সালেও গানের জন্যে তিনি মেডেল পেয়েছেন 'কালিদাস নাগ মেমোরিয়াল কমিটি' থেকে। মাঝে মাঝে বেশ ভালো অনুষ্ঠানে তাঁর গান শোনা যায়। সম্প্রতি নতুন এল. পি. রেকর্ডে বেরিয়েছে 'পঞ্চকন্যা'-র গান, তাতে অমিয়া গেয়েছেন দুটি গান 'বড়ো বিস্ময় লাগে' ও 'তবু মনে রেখো'। এখনো অমিয়ার গান যারা একবার শোনে তারা আবার শুনতে চায়। অমিয়া এসব বিশ্বাস করতে চান না। তাঁর মতে, আজ যারা তাঁর গান শুনতে চায় তারা শুনতে চায় সেযুগের গায়কী বৈশিষ্ট্য, কবির নিজের শেখানো গান। "নয়তো এখন কি আর আমার গানে সেই মায়ার খেলার প্রমদাকে খুঁজে পাওয়া যায়?" অমিয়ার সঙ্গে হয়তো কেউ-ই একমত হবেন না। এখনো তাঁর গলায় মধু ঝরে, সাতটি সুরের পোষা পাখি তান-লয়-মীড়ের সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখায়। একটি সাক্ষী উপস্থিত করি। দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত'-এ লিখেছেন, "অমিয়া ঠাকুর বোধহয় তাঁর ৭০ বৎসর পার করে ফেলেছেন। তিনি এখনও গান করেন। এখনও তাঁর গলায় যা স্বাভাবিক কাজ বেরোয় তা স্বরলিপি করা তো দূরের কথা, বর্তমান কালের অথরিটিরা কেউ তা নিজের গলায় গেয়ে দেখাতে পারবেন না।"

মেনকা অবন ঠাকুরের নাতনী, উমারাণীর একমাত্র মেয়ে। তাঁর বাবা নির্মল চন্দ্রও ছিলেন সঙ্গীতরসিক। ফলে মেয়ে ছোটবেলা থেকেই গানের তালিম নিতে শুরু করেন। এখনকার দিনে এমন উদাত্ত কণ্ঠ বড়ো বেশি পাওয়া যায় না।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও ওস্তাদ বচ্চন মিশ্রের কাছে গান শেখার পরে বেনারসে একদিন মেনকার গান শোনেন দিনেন্দ্রনাথ। শুনে মুগ্ধ হয়ে মেনকার বাবাকে বলেন, "ওকে আমার কাছে দাও—দেখবে এ রত্নকে পালিশ করে কেমন ঝকঝকে করে তুলি।" তুলেওছিলেন। শেখাবার মতো গলা পেয়ে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য। মেনকাও শিখেছিলেন প্রাণভরে। গলা তৈরি হবার পর রেকর্ড বেরোলো 'এসো এসো আমার ঘরে' আর 'শেষ বেলাকায় শেষের গানে'। দিনেন্দ্রনাথ সঙ্গে বাজালেন এস্রাজ। আর একটা রেকর্ডও হলো 'তোমার বীণা আমার মনোমাঝে' ও 'তোমার সুরের ধারা'—কিন্তু আর নয়। কারণ এ সময়ে মেনকার বিয়ে হয়ে গেল ক্ষিতীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র ক্ষেমেন্দ্রের সঙ্গে। ১১ই মাঘের উৎসবে মেনকার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন ক্ষেমেন্দ্র। তাই গান শেখা বন্ধ হলো না। অতি সম্প্রতি 'পঞ্চকন্যা'র গানে মেনকা আবার গেয়েছেন সেই পুরনো গানটি "এসো এসো আমার ঘরে"।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। তাঁর কাছে গান শিখতে না পাওয়ার দুঃখ ঘুচিয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ। তাই তো দিনেন্দ্রের অভাবটা বড়ো বেশি বাজে মেনকার মনে। তাঁর নাম যেন লোকে ভুলেই গেছে। অথচ কবির সকল গানের ভাণ্ডারী ছিলেন তিনি। তাঁকে নিয়ে কেন কিছু হয় না? নিজের গানের স্কুলের নাম 'দিনেন্দ্র শিক্ষায়তন' দিয়ে তিনি সেই ক্ষোভ খানিকটা মেটাতে চেয়েছেন। মেনকার গানের স্কুল করাও বেশ মজার ঘটনা। জোড়াসাঁকোয় তাঁরা যেদিকটায় থাকতেন সেখানেই ঠাকুরবাড়ির শেষ সীমানা। ওপাশের বাড়ির একটি মেয়ে সকাল-সন্ধ্যে বেসুরো গলায় রবীন্দ্র সঙ্গীত সাধে। বিরক্ত হয়ে উঠলেন ক্ষেমেন্দ্র। দিনের পর দিন এ নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে স্ত্রীকে অনুরোধ করলেন মেয়েটিকে গান শেখাতে। অর্থাৎ নিজেদের কানের দুঃখমোচনের জন্যেই মেনকাকে গানের ক্লাস খুলতে হলো।

তারপর দিনে দিনে বড়ো হয়েছে তাঁর প্রতিষ্ঠান। তিনিও যুক্ত হয়েছেন 'বৈতানিক' ও 'পারাণি' গানের স্কুলের সঙ্গে। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেখে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত ছাড়াও ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য গীতিকারের গান শেখাতে শুরু

করলেন। সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিনেন্দ্রনাথ, সৌম্যেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, ইন্দিরা, প্রতিভা—আরো অনেকেই তো গান লিখেছেন। চর্চা না রাখলে হারিয়ে যাবে যে। জীবনে অনেক সম্মান পেয়েছেন মেনকা। এখন শুধু চান ঠাকুরবাড়ির গানকে অন্যদের গলায় তুলে দিতে। একালে অবশ্য আরো কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান ঠাকুরবাড়ির গান প্রচারে উৎসাহী।

'কিছু না কিছু না করেও মেনকা কিন্তু আরেকটা কাজ করেছেন। সেটা হলো উড়িষ্যায় তাঁর 'টেগোর ভবনে' বহু ছাত্রছাত্রীকে রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখাবার চেষ্টা। কটক-ভুবনেশ্বরে ঠাকুরবাড়ির সম্পত্তি আছে। সেখানে কিছুদিন থাকার সময় তাঁর আগ্রহে ও উৎসাহে বেশ কিছু ওড়িয়া ও প্রবাসী বাঙ্গালী ছেলেমেয়ে এসেছিল গান শিখতে। দশ বছরে প্রায় চল্লিশ জনকে গান শিখিয়েছিলেন মেনকা। তারপর তারা আবার কত শিখিয়েছে কে জানে। এখনও দেখা যাবে ওড়িয়াদের রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখার আগ্রহ খুব বেশি। অন্য কোন প্রদেশবাসী রবীন্দ্রনাথের গান অত উৎসাহ নিয়ে কমই শেখে। মেনকা কলকাতাতেও অনেককে শিখিয়েছেন দিনেন্দ্রনাথের গান। এখনও গান করেন, তবে খুব ছোটাছুটি করতে আর ভালো লাগে না বরং ভালো লাগে গানের মধ্যে হারিয়ে যেতে।

অন্দরমহলের গল্প শেষ। আর ঠাকুরবাড়ির কথা? তার 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে'। পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ পেরিয়ে এই বিশাল পরিবারের উত্তরাধিকারীরা এসে পৌঁছেচেন বর্তমান যুগে। কিন্তু এখন রবীন্দ্র ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তো ঠাকুর পরিবারে সীমাবদ্ধ নেই। ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র। তাঁর হাতে গড়া শান্তিনিকেতনে, শিষ্য-প্রশিষ্য অনুরাগীদের মধ্যে। সেই পরিবারও বড়ো হতে হতে ভেঙ্গে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ঠাকুরবাড়িতে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্র ভারতী—পুরনো ঘর বাড়ি ভেঙ্গে তৈরি হচ্ছে নতুন বাড়ি। তবু এক একটা বিশেষ বাড়ি কৌটোর মতো জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময়কে চার দেওয়ালের মধ্যে ধরে রাখে। এই পুরোনো দেওয়ালগুলো কত ঘটনার নীরব সাক্ষী। কত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জল্পনা-কল্পনা, উত্তেজনা-শিহরণ ঘরের কোণে কোণে জমে

উঠেছিল তার হিসেব কে রাখে? আজ তো সে শুধু স্বপ্ন! যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে থাকে শুধু ইতিহাস। সে ইতিহাস তো আছেই, চিরকাল তার টানাপোড়েনে বোনা হয়ে থাকবে ঠাকুরবাড়ি থেকে কি পেয়েছি আর কি পাইনি তার হিসেবের নক্সা। অবন ঠাকুর বলতেন, 'মানুষ হিসেব চায় না, চায় গল্প।' স্মৃতির ছায়াবীথি বেয়ে আমরা সেই গল্পের জগতেই ফিরে যেতে চেয়েছি যেখানে নানা রঙের সুতোয় বোনা বালুচরী আঁচলার মতোই ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের জীবনের সঙ্গে বোনা হয়ে গেছে বাঙালী নারী জাগরণের আলোছায়ার নক্সা।

—

পরিশিষ্ট

১. সেই কবে পুরুষোত্তমের বংশধর · ···শুরু করলেন।

(পৃষ্ঠা ৮ / পংক্তি ৫-৭)

"জগন্নাথের দ্বিতীয় পুত্র পুরুষোত্তম হইতে ঠাকুরবংশের ধারা চলিয়াছে ;··· পুরুষোত্তমের প্রপৌত্র রামানন্দের দুই পুত্র মহেশ্বর ও শুকদেব হইতে ঠাকুরগোষ্ঠীর কলিকাতা-বাস আরম্ভ।

কথিত আছে, জ্ঞাতি কলহে বিরক্ত হইয়া মহেশ্বর ও শুকদেব নিজ গ্রাম বারোপাড়া হইতে কলিকাতা গ্রামের দক্ষিণে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। সে সময়ে কলিকাতা ও সুতামুটিতে শেঠ বসাকরা বিখ্যাত বণিক। এই সময়ে ইংরেজদের বাণিজ্যতরণী গোবিন্দপুরের গঙ্গায় আসিয়া দাঁড়াইত। পঞ্চানন কুশারী ইংরেজ কাপ্তেনদের এইসব জাহাজে মালপত্র উঠানো নামানো ও খাদ্য পানীয় সংগ্রহাদি কর্মে প্রবৃত্ত হন। এই সকল শ্রমসাধ্য কর্মে স্থানীয় হিন্দু-সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাঁহার সহায় ছিল। সেই সকল লোক ভদ্রলোক ব্রাহ্মণকে তো নাম ধরিয়া ডাকিতে পারে না : তাই তাহারা পঞ্চাননকে 'ঠাকুরমশায়' বলিয়া সম্বোধন করিত। কালে জাহাজের কাপ্তেনদের কাছে ইনি পঞ্চানন 'ঠাকুর' নামেই চলিত্ হইলেন ; তাহাদের কাগজপত্রে তাহারা Tagore, Tagoure লিখিতে আরম্ভ করিল। এইভাবে কুশারী পদবীর পরিবর্তে 'ঠাকুর' পদবী প্রচলিত হইল।"

—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড / পৃষ্ঠা ৩)

২. সে যুগে ঠাকুরবাড়ির মতো ধনী······লাভ করেছিলেন।

(পৃষ্ঠা ৮ / পংক্তি ২০-২৩)

আমরা উনিশ শতকে অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্ধান পাই। এই

নব্য ধনী সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন দেওয়ান, বেনিয়ান কিংবা ব্যবসায়ী। এঁদের অনেকেই ধনী এবং দাতা হিসেবে সর্বজনপরিচিত ছিলেন। কিছু কিছু সমাজ সংস্কার ও অন্যান্য সৎকর্মেও এঁরা মুক্ত হস্তে দান করেন। যেমন, শোভাবাজারের দেব পরিবার (প্রতিষ্ঠাতা : দেওয়ান নবকৃষ্ণ দেব), খিদিরপুরের ঘোষাল পরিবার (প্রতিষ্ঠাতা : দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল), আন্দুলের রায় বংশ (প্রতিষ্ঠাতা : দেওয়ান রামচরণ রায়), জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার (প্রতিষ্ঠাতা : দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ), কুমোরটুলীর মিত্র পরিবার (প্রতিষ্ঠাতা : দেওয়ান গোবিন্দরাম মিত্র), পাথুরেঘাটার ঠাকুর পরিবার (প্রতিষ্ঠাতা : দেওয়ান দর্পনারায়ণ ঠাকুর), বাগবাজারের মুখুজ্যে পরিবার (প্রতিষ্ঠাতা : দেওয়ান দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়), কুমোরটুলীর সরকার পরিবার (প্রতিষ্ঠাতা : দেওয়ান বনমালী সরকার), শ্যামবাজারের বসু পরিবার (প্রতিষ্ঠাতা : দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু), রামবাগানের দত্ত পরিবার (প্রতিষ্ঠাতা : বিত্তবান ও বিদ্বান সমাজে প্রতিষ্ঠিত রসময় দত্ত), সিমলের দেব পরিবার (প্রতিষ্ঠাতা : ধনকুবের রামদুলাল দে), নিমতলার মিত্র পরিবার (প্রতিষ্ঠাতা : ব্যবসায়ী গঙ্গাধর মিত্র), কলুটোলার শীল পরিবার (প্রতিষ্ঠাতা : বেনিয়ান ও ব্যবসায়ী মতিলাল শীল), বহুবাজারের মতিলাল পরিবার (প্রতিষ্ঠাতা : ব্যবসায়ী বিশ্বনাথ মতিলাল), ঠনঠনিয়ার ঘোষ পরিবার (প্রতিষ্ঠাতা : ব্যবসায়ী রামগোপাল ঘোষ) ইত্যাদি। আরো কয়েকটি পরিবারও ধনী হিসেবে পরিচিত ছিলেন যেমন, মল্লিক পরিবার, শেঠ পরিবার, বসাক পরিবার, পালচৌধুরী পরিবার, লাহা পরিবার, দেওয়ান সুখময় রায়ের পরিবার, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পরিবার, দেওয়ান রামহরি বিশ্বাসের পরিবার, গঙ্গানারায়ণ সরকারের পরিবার, দেওয়ান কাশীনাথের পরিবার, ব্যবসায়ী মদন দত্তের পরিবার, বেনিয়ান রামচন্দ্র মিত্রের পরিবার প্রভৃতি। কাশীমবাজার রাজপরিবার, জোড়াসাঁকো রাজপরিবার ও পাইকপাড়া রাজপরিবারের নামও এ প্রসঙ্গে করা যায়।

৩. তাঁর নতুন 'গৃহসঞ্চার'-এর কথা......সেদিনকার কাগজে।

(পৃষ্ঠা ১১ / পংক্তি ৭-৮)

(সমাচার দর্পণ : ২০ ডিসেম্বর ১৮২৩ / ৬ পৌষ ১২৩০)

"নূতন গৃহসঞ্চার ॥—মোং কলিকাতা ১১ দিসেম্বর ২৭ আগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীনবাটীতে অনেক ২ ভাগ্যবান্ সাহেব ও বিবিরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংগ্রণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে একজন গো বেশ ধারণ-পূর্বক ঘাস চর্বণাদি করিল।"

(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৩৮-১৩৯)

৪. মহর্ষি পরিবারে······গৃহের রক্ষয়িত্রী। (পৃষ্ঠা ১৭ / পংক্তি ২৩-২৪)

"আমার শ্বশুর আমার বড়ো ননদকে বড়ো ভালোবাসিতেন। তাঁহার এই সকল সংকার্যে খুশি হইয়া তাঁহাকে তিনি 'গৃহরক্ষিতা সৌদামিনী' নামকরণ করিয়াছিলেন।"

(প্রফুল্লময়ী দেবী : 'আমাদের কথা', স্মৃতিকথা পৃষ্ঠা ৩২)

৫. দেবেন্দ্রনাথ সুকুমারীর বিয়ে······ব্রাহ্মবিবাহ।

(পৃষ্ঠা ১৯ / পংক্তি ২৩-২৫)

"ব্রাহ্ম ধর্মমতে দেবেন্দ্রনাথের ইহাই প্রথম অপৌত্তলিক বিবাহ-অনুষ্ঠান। ···পৌত্তলিকতা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তুলসীপত্র বিল্বপত্র কুশ শালগ্রামশিলা গঙ্গাজল ও হোমাগ্নি বর্জন করিয়া এক নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি সংকলন করিলেন ও তদনুযায়ী কন্যার বিবাহ দিলেন।"

(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড। পৃষ্ঠা ১১)

৬. উন্নতমনা মহর্ষিও··· ··শোনা যায়নি। (পৃষ্ঠা ৬২ / পংক্তি ৭-১১)

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে একমাত্র প্রফুল্লময়ী দেবীর লেখা 'আমাদের কথা'র ওপরে। সেখানে দেখি, বলেন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রফুল্লময়ীর মনে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ

স্বজনে বিদ্যারত্ন মহাশয়কে নিযুক্ত করেছিলেন গীতা ও উপনিষদ পড়ে শোনাবার জন্যে। বিদ্যারত্ন মহাশয় এক বছর প্রতিদিন প্রফুল্লময়ীকে ধর্মপুস্তক পড়ে শোনাতেন। এছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ হেমলতা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী। তিনিও বহু সদুপদেশ দান ও আহুতি অনুষ্ঠান করে প্রফুল্লময়ী দেবীর মনে শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁকে একদিন সময়োপযোগী সুন্দর গীতা শ্লোক শোনান। কিন্তু মহর্ষি তাঁকে নিজে কোন উপদেশ দান করেছিলেন কিনা জানা যায়নি।

৭. "তাই কৌতুক করে……মামলা হতো!"

(পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬ / পংক্তি ২৬-২ পর পৃষ্ঠা)

কবির এই কৌতুককর অনবদ্য উক্তিটি আমাদের উপহার দিয়েছেন মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১০)।

৮. "প্রজ্ঞা বিবাহসূত্রে অসমিয়া……কেন কে জানে!"

(পৃষ্ঠা ১১১ / পংক্তি ৩-৫)

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর যোগাযোগ সত্যই ছিন্ন হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়াব 'আমার জীবনস্মৃতি' পড়ে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লক্ষ্মীনাথের ভাষা সম্পর্কে নানারকম তর্কবিতর্ক হয় এবং কবি পরে অপ্রীতিকর তর্কে যোগ দেওয়া থেকে বিরত হন। লক্ষ্মীনাথের ভাষায়, "রোজ রোজ ভাষা সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে এই তর্ক বিতর্ক বেড়েই চলতে লাগলো আর এই যুবকদের নেতা 'রবিকাকা' অবস্থা বিষম দেখে মৌনাবলম্বন করলেন। তখন থেকে আজ এই বুড়োবয়স অবধি ঠাকুরমশাই তাঁদের এই পোষ না মানা জামাইয়ের সঙ্গে তর্ক করা ছেড়ে দিলেন।"

আবার অন্যত্র,

"…আমার সঙ্গে যখন আমার সাহিত্যিক শ্যালকদের তর্কাতর্কি হতে শুরু হলো এবং পরে 'রবিকাকা'র কাছে গিয়ে পৌছালো, তখন শ্বশুর জামাইয়ের মধ্যেও একটি ছোটখাটো তর্কযুদ্ধ বাধলো। তারপরে মুখের তর্ক বন্ধ হলে রবিকাকা 'ভারতী' পত্রিকায় অসমিয়া ভাষার উপর মন্তব্য প্রকাশ করে লিখলেন

এক প্রবন্ধ। আমি তার প্রতিবাদ লিখে 'ভারতী'তে ছাপাবার জন্যে পাঠিয়ে দিলাম। 'প্রতিবাদ'টা ভারতীতে ছাপা হয়। ওদিকে 'পুণ্য' পত্রিকাতেও আমার প্রতিবাদ বেরুল। এরকম ভাবে তর্কযুদ্ধের শেষ হল।" (পৃষ্ঠা ১৩০)

হয়ত এসব কারণেই প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' প্রসঙ্গে কবির কোন মতামত জানা যায়নি।

৯. "তবে এই প্রতাপাদিত্য উৎসব······শুরু হয়।"

(পৃষ্ঠা ১৫৭ / পংক্তি ১৬-১৭)

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সরলা দেবীর মতবিরোধ সুবিদিত ঘটনা। এ প্রসঙ্গে নিত্যপ্রিয় ঘোষ "রবীন্দ্রনাথ বনাম সরলা দেবী" (অমৃত / ১৮ বর্ষ ২৫ সংখ্যা / ২৩ কার্তিক ১৩৮৫) প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমরা সেই দীর্ঘ প্রসঙ্গে প্রবেশ করিনি, তবে মনে হয় এই মতান্তরেব সূচনা হয় প্রতাপাদিত্য উৎসব নিয়েই। কবির কোন লিখিত মন্তব্য এ সময় হয়তো প্রকাশিত হয়নি কিন্তু সরলা দেবী 'জীবনের ঝরাপাতা'য় লিখেছেন,

"···তীর এসে বিঁধলো আমার বুকে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে—সাক্ষাতে নয়, দীনেশ সেনের মারফতে। দীনেশ সেন একদিন তাঁর দূত হয়ে এসে আমায় বললেন,—"আপনার মামা ভীষণ চটে গেছেন আপনার উপর।"

"কেন ?"

"আপনি তাঁর 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' চিত্রিত প্রতাপাদিত্যের ঘৃণ্যতা অপলাপ করে আর এক প্রতাপাদিত্যকে দেশের মনে আধিপত্য করাচ্ছেন। তাঁর মতে, প্রতাপাদিত্য কখনো কোন জাতির hero-worship-এর যোগ্য হতে পারে না।" (পৃষ্ঠা ১২৯)

১০. কবির ইচ্ছে ছিল······দিলেন "নাতনীকে।" (পৃষ্ঠা ২২৪/পংক্তি ২৩-২৪)

"সুরঙ্গমার part তত শক্ত নয়, সেটা তোকে শিখিয়ে নিতে পারব।··· কতবার ভেবেছি আমি নিজেই সাজব সুরঙ্গমা—এ প্রস্তাবে অন্যেরা রাজি হচ্চে না—সবাই বলচে আমার শরীর ভালো নয় অতটা বাড়াবাড়ি সইবে না, নতুবা খুবই ভালো হোত।" —(চিঠিপত্র, ৪র্থ খণ্ড। পৃষ্ঠা ২০২)

গ্রন্থঋণ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘরোয়া, জোড়াসাঁকোর ধারে, আপনকথা
অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় : মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য
দুই নারী ও তিন নায়িকা
আবদুল আজীজ : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ
ইন্দিরা ঠাকুর : আমার খাতা
ইন্দিরা সঙ্গীত শিক্ষায়তন : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
কমলা দাসগুপ্ত : স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী
খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : রবীন্দ্রকথা
গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ চৌধুরী (সম্পাদিত) : সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
জগদীশ ভট্টাচার্য : কবিমানসী
জসীম উদ্দীন : ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : জ্যোতিরিন্দ্র রচনাবলী, আমার জীবনস্মৃতি
(বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত)
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ : হেমলতা ঠাকুর
দীনেশচন্দ্র সেন : ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য
দেবব্রত বিশ্বাস : ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত
দ্বারিকানাথ চট্টোপাধ্যায় : ঘরের মানুষ গগনেন্দ্রনাথ
নির্মলকুমারী মহলানবিশ : বাইশে শ্রাবণ

পশুপতি শাসমল : স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য
পার্থ চট্টোপাধ্যায় : বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ
পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : মাধুরীলতার চিঠি
পূর্ণেন্দু পত্রী : গত শতকের প্রেম
প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় : বাংলার নারী জাগরণ
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র জীবনী (১ম-৪র্থ খণ্ড), গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী (১ম-২য় খণ্ড), রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী, ফিরে ফিরে চাই (১ম খণ্ড)
প্রমথ চৌধুরী : আত্মকথা
প্রসন্নময়ী দেবী : পূর্বকথা
বিনয় ঘোষ : সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম-৫ম খণ্ড), কলকাতা কালচার
বিপিনচন্দ্র পাল : সত্তর বছর
বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ
বিশ্বভারতী প্রকাশিত : মৃণালিনী দেবী
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম-২য় খণ্ড), বঙ্গসাহিত্যে নারী, সাময়িক পত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী, জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী, বঙ্গীয় নাট্যশালা
ভবতোষ দত্ত : বাঙালীর সাহিত্য
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় : দক্ষিণের বারান্দা
মৈত্রেয়ী দেবী : রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ
যোগেশচন্দ্র বাগল : বাংলার স্ত্রী শিক্ষা, বেথুন সোসাইটি
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পিতৃস্মৃতি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, চিঠিপত্র, ছিন্নপত্রাবলী
রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত
রাণী চন্দ : আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ

রাসসুন্দরী দেবী : আমার জীবন
লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া : আমার জীবনস্মৃতি (আরতি ঠাকুর অনূদিত)
শান্তিদেব ঘোষ : রবীন্দ্র সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত বিচিত্রা
শিবনাথ শাস্ত্রী : আত্মচরিত, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ
শেফালিকা শেঠ : বাংলার স্ত্রীশিক্ষা
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমার বাল্যকথা
সন্তোষকুমার দে ও কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) : কবিকণ্ঠ
সাধনা বসু : শিল্পীর আত্মকথা (কল্যাণাক্ষ বন্দোপাধ্যায় অনূদিত)
সাহানা দেবী : স্মৃতির খেয়া
সীতা দেবী : পুণ্যস্মৃতি
সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)
সুব্রত রুদ্র : কাদম্বরী দেবী
সুষমা মৈত্র : মার্কিন বিদুষী মহিলা
সুধীরচন্দ্র কর ও সাধনা কর : শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ
সোমেন্দ্রনাথ বসু : তবে তাই হোক
ঐ (সম্পাদিত) : স্মৃতিকথা
সুনীল দাস : ভারতী পত্রিকার সূচী (পাণ্ডুলিপি)
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : যাত্রী
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : ঠাকুরবাড়ির কথা
হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমার বিবাহ
Lotika Ghosh : Social & Educational Movement
Sankar Sengupta : A Study of Women of Bengal
Usha Chakraborty : Condition of Bengali Women

পত্র পত্রিকা :

অমৃত, কিছুক্ষণ, গীতবিতান পত্রিকা, ঘরোয়া, চতুরঙ্গ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, দেশ, পরিচয়, পুণ্য, প্রবাসী, বঙ্গলক্ষ্মী, বালক, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ভারতী,

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, রবীন্দ্র চর্চা, রবীন্দ্র ভাবনা, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, শ্রেয়সী, সবুজপত্র, সমকালীন, সমাজতান্ত্রিক জি. ডি. আর, সাধনা ও Visva Bharati News.

ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের রচনা

পাণ্ডুলিপি :

ইন্দিরা দেবীর 'শ্রুতি ও স্মৃতি' (টাইপ করা কপি) : বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভবন
উমা দেবীর 'আত্মকথা' : মেনকা ঠাকুর
কমলা দেবীর 'কবিতা' : মুকুলা রায়
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মহর্ষি পরিবার' : অমৃতময় মুখোপাধ্যায়
পূর্ণিমা ঠাকুরের 'ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী' : পূর্ণিমা দেবী
পূর্ণিমা দেবীর 'চাঁদের বুড়ি' : পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়
বিনয়িনী দেবীর 'কাহিনী' : সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়
রমা দেবীর অপ্রকাশিত রচনা : এণা দেবী
সুনয়নী দেবীর কবিতা : মণিমালা দেবী
স্বরূপা দেবীর কবিতা ও প্রবন্ধ : স্বরূপা দেবী
সুষমা দেবীর অপ্রকাশিত রচনা : জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থ :

অমিতা ঠাকুর : অঞ্জলি, জন্মদিনে
আরতি ঠাকুর : ছায়ারঙ্গ, গাঙ চিলের ডানা (অনু), আমার জীবনস্মৃতি (অনু)
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী : রবীন্দ্রস্মৃতি, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ত্রিবেণী সঙ্গম, নারীর উক্তি, হিন্দু সঙ্গীত (প্রমথ চৌধুরী সহযোগে), Tales of Four Friends (অনু), The Autobiography of Maharshi Devendranath Tagore (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে), পুরাতনী (সম্পা), গীত পঞ্চাশতী (সম্পা), বাংলার স্ত্রী আচার (সম্পা)

উমা দেবী : বাবার কথা

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী : সাত ভাই চম্পা, টাকডুমাডুম

পূর্ণিমা দেবী : ঠাকুর বাড়ির গগন ঠাকুর

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী : আমিষ ও নিরামিষ আহার

প্রতিভা দেবী : আলোক

প্রতিমা দেবী : নৃত্য, চিত্রলেখা, স্মৃতিচিত্র, নির্বাণ

বাণী দেবী : The Vedic Song and the Tagore, Applied Music, Cultural Contact and Music, Music and Tagore, Music and Diersonal Therapy, Indian Music and Simultaneous Harmony, Western Music and Ragraginies, The West and the East in Music they meet

মীরা দেবী : স্মৃতিকথা

রমা দেবী : Lord Buddha and his message (edited)

শোভনা দেবী : To Whom (অনু), The Orient Pearls, Indian Fables and Folklore, Indian Nature Myths, Tales of the Gods of India

সরলা দেবী : বাঙালীর পিতৃধন, ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল, নববর্ষের স্বপ্ন, কালীপূজার বলিদান ও বর্তমানে তাহার উপযোগিতা, জীবনের ঝরাপাতা, শ্রীগুরু বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মানুষ্ঠিত শিবরাত্রি পূজা, বেদবাণী, শতগান (স্বর)

স্বর্ণকুমারী দেবী : দীপনির্বাণ, মিবাররাজ, বিদ্রোহ, হুগলীর ইমামবাড়া, ফুলের মালা, ছিন্নমুকুল, কাহাকে, স্নেহলতা বা পালিতা, বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী, মিলনরাত্রি, নবকাহিনী, মালতী ও গল্পগুচ্ছ, পাকচক্র, গাথা, পৃথিবী, বসন্ত উৎসব, সখিসমিতি, বিবাহ উৎসব, কনেবদল, দেবকৌতুক, কৌতুকনাট্য ও বিবিধকথা, দিব্যকমল, যুগান্ত কাব্যনাট্য, নিবেদিতা,

রাজকন্যা, জাতীয় সঙ্গীত, সঙ্গীত শতক, ধর্মসঙ্গীত, প্রেম পারিজাত: কবিতা ও গান, গীতিগুচ্ছ (১ম ও ২য়), প্রভাতসঙ্গীত, মধ্যাহ্নসঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত, নিশীথসঙ্গীত, An Unfinished Song, Short Stories, সেকেলে কথা, (ছোটদের বই) গল্পসল্প, সচিত্র বর্ণবোধ (১ম-২য়), বাল্যবিনোদ, আদর্শনীতি, প্রথম পাঠ্য ব্যাকরণ, বাংলাবোধ ব্যাকরণ, কোরকে কীট, কীর্তিকলাপ, সাহিত্য স্রোত।

হেমলতা দেবী : অকল্পিতা, জ্যোতিঃ, আলোর পাখি, দুনিয়ার দেনা, মেয়েদের কথা, দেহলি, জল্পনা, দুপাতা, শ্রীনিবাসের ভিটা।

অন্যান্য রচনা :

অমিতা দেবী : প্রতিমা দেবী, মীরা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবির কথা, শ্রীমতী দেবী, রবীন্দ্রনাথের অভিনয় প্রসঙ্গে

ইন্দিরা দেবী : সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা, রবীন্দ্রসঙ্গীতে তানের স্থান, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত প্রভাত, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য, স্বরলিপি পদ্ধতি, হারমণি বা স্বরসংযোগ, আমাদের গান, স্বরলিপি, বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত, শান্তিনিকেতনে শিশুদের সঙ্গীতশিক্ষা, রবীন্দ্রনাথের গান, বির্জিতলাও, আঁদ্রেজীদ-র ফরাসী গীতাঞ্জলির ভূমিকা (অনু), মাদাম লেভির ভারতবর্ষ (অনু), রেনে গ্রুসের ভারতবর্ষ (অনু), পিয়ের লোতির কমলকুমারিকাশ্রম (অনু), দশদিনের ছুটি, বালিকার রচনা, The Music of Rabindranath Tagore, ৪৯ নং পার্ক স্ট্রীট

কমলা দেবী : গান

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী : ভাউ সাহেবের খবর, ইংরাজনিন্দা ও দেশানুরাগ, স্ত্রীশিক্ষা, কিণ্টারগার্ডেন, আশ্চর্য পলায়ন

নন্দিতা দেবী : ব্রেজিলে এক বৎসর, সোনার দেশ

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী : গোপালন

প্রতিভা দেবী : সহজ গান শিক্ষা, সাংখ্যস্বরলিপি, তানসেন, সা সদারঙ্গ, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বৈজুবাওয়া নায়ক, আত্মকথা

প্রতিমা দেবী : গুরুদেবের ছবি, মহাত্মাজী

প্রফুল্লময়ী দেবী : আমাদের কথা

মনীষা দেবী : পুঁতির পর্দা

মাধবী দেবী : বাংলার স্ত্রী আচার : পশ্চিমবঙ্গ (ঠাকুরবাড়ি)

মাধুরীলতা দেবী : স্বয়ো, মাতাশত্রু, সৎপাত্র, মামা-ভাগ্নী, দ্বীপ নিবাস, অনাদৃতা, চোর, চামরুর গল্প

মীরা দেবী : ভারতের ভাগবত ধর্ম, হিন্দুধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি, হিন্দু মুসলমান সমস্যা, প্রাচীন ভারতে বিদেশী, মৌর্য সাম্রাজ্যের লোপ, ধর্ম ও বিজ্ঞান, ডাউলিঙ, দরিদ্র ঘটনা, জাতির স্বাতন্ত্র্য, রণক্ষেত্রের কুকুর, পাঞ্জাবের বিবাহপ্রথা, শীলশিক্ষা, হাতির দন্তচিকিৎসা, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, [প্রবাসীর জন্যে সংকলিত। ইংরেজি প্রবন্ধের সারমর্ম ও অনুবাদরূপে এগুলি প্রকাশিত হয়]

শ্রীমতী দেবী : এখনকার নৃত্যকলা, ভরতনাট্যম্, মণিপুরী নৃত্য

শোভনা দেবী : কহাবৎ বা জয়পুরী প্রবচন, লক্ষ টাকার এককথা, আনার রাণী বা ডালিমকুমারী, গঙ্গাদেব, ফুলচাঁদ, লুব্ধবণিক তেজারাম, ছেঁড়া কাগজের ডোমলা

সরলা দেবী : দুর্ভিক্ষ, বাবলা গাছের কথা, পিতামাতার প্রতি কি ব্যবহার করা কর্তব্য, বকুলের গল্প, কুড়ান, প্রেমিকসভা, প্রবাসীর দু চার কথা, মালবিকা-অগ্নিমিত্র, রতিবিলাপ, স্বরলিপি আলোচনা, সংস্কৃত গান, জাপানী উপাখ্যান, মালতীমাধব, জাপানী প্রহসন, পিয়ের লোতি, বাঙালী ও মারহাট্টি, ব্রাউনিংয়ের একটি কবিতা, নতুন ধরণের উপন্যাস, ভালোবাসা না চক্ষুলজ্জা, বাংলা রঙ্গভূমি, বাংলা এ্যাকাডেমি, বঙ্কিমবাবু, অশ্বপৃষ্ঠে, লানৃকরাণের উজীর (অনু), মুদ্রারাক্ষস, একা, বাংলায় হাসির গান ও তাহার কবি, নারীর প্রতিদান, নৈনিতালের অপরাধ, লালন

ফকির ও গগন, চিত্রদর্শনে, একালে সেকাল, স্বামী বিবেকানন্দ, গীর্ব্বাণী, প্রত্যাহার, জাতীয় মহাসভা ও জাতীয় সজ্জা, শুনঃসেপের বিলাপ, মৃত্যুচর্চা, সাতপুরুষের কমে হিন্দুবিবাহ, বোম্বাই সিগনলারের ধর্মঘট, শক্তিচর্চা, পারশ্য পুলক, আহিতাগ্নিকা, হৃদয়বাণ, ওমর খৈয়াম, ভারত-নারীর সম্রাজ্ঞী, মহারাণীর অন্ত্যেষ্টি সমারোহ, বিলাতে ও ভারতে রুবায়াৎ, ভাষাতত্ত্ব, বাঙালী পাড়ায়, স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বাঙালীর পিতৃধন, বিলাতী ঘুসি বনাম দেশী কিল, পাষাণের আবেদন, কুমার উদয়াদিত্য, ভারতের হিন্দু মুসলমান, বাংলার ইতিহাসের উপকরণ, আমাদের উচ্চশিক্ষা, আমার বাল্য-জীবনী, কংগ্রেস ও স্বায়ত্তশাসন, খেয়ালের চৌহদ্দি, হিমালয়ে, ব্যাপ্তি, বারমাসা, অভয়মন্ত্র, যোগাযোগ, দিল্লীর দরবার, রূপকথার রূপান্তর, কবি সম্বর্দ্ধনা, কাজের বোঝা, আমাব শ্রোতা, হিন্দোলা, জাতীয়কাল বৈশাখ, বরফগলা, বিজয়াদশমী, গোড়ায় গাফিলি, জন্মস্মর, চিত্রাবলী, আহ্বান, পলায়নপর ও পলায়নের পর, উদ্বোধন, বঙ্গীয় সেনরাজগণের উত্তরচরিত, রামপ্রসাদের পদাবলী, অগ্নিপরীক্ষা, স্বাধীন ত্রিপুরার ঠাকুরগণ, লাইব্রেরী, সত্যাগ্রহ, সেনাপত্য, কালের প্রবাহ, ভূতশুদ্ধি, তারকেশ্বরে পূজা দেওয়া, নাচঘর, অকালে বাসন্তী পূজা, নানা কথা : ঢাল-খাদিপ্রতিষ্ঠান-খদ্দর, বর্ষামঙ্গল ও শেষবর্ষণ, মহর্ষি, বসন্ত পঞ্চমী : খেলায় পূজা : তারুণ্যের অভিষেক, বড়মামা, শ্রমিক, হিরণ্ময়ী দেবী, রাজায় প্রজায়, বাঙালী ও বঙ্গভাষা, ভাষার ডোর, অপরাজিতা, লীলাধারা, অরূপ, শ্রাবণ, সাহিত্যিকের প্রতি, ননকোঅপারেশনের আদিকর্তা কে ? ইংরেজ না ভারতবাসী, ভারতীয় মহাজাতি সংঘ, দুর্গাও চণ্ডী, চিরাগের মেলার পথে, আত্মতৃপ্ত, বিরাগের মেলার পথে, মাঙ্গলিক, অহংকার, বরফগলা, কাজের বোঝা, আমার শ্রোতা, বীরাষ্টমীর গান, A Problem of an Indian Girls School, হালী বিলাতী নাট্য, হিন্দু ও নিগর, হিন্দোলা, হিমালয়।

সংজ্ঞা দেবী : ইউরিশিমা, মৎস্যমোর আয়না, ওঁকে যেমন দেখেছি (জয়শ্রী অনুলিখিত)

সুজাতা দেবী : গগনেন্দ্রনাথ

সুনৃতা দেবী : ব্রহ্মে শূলীনাথ

সুরূপা দেবী : সোমেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ

সুষমা দেবী : হ্যারিয়েট বিচার স্টো, লিগু, মাদাম দ্য স্টেল, হ্যারিয়েট মার্টিনো, আমেরিকায় হিন্দুধর্মের প্রভাব, আমেরিকায় বেদান্ত ধর্মের প্রভাব ও সমাদর, শ্রীনগর, শ্রীনগরের পথে, শ্রীনগরের প্রকৃতিক দৃশ্য ও বন্য অধিবাসী, রামপুরের পথে, রাউলপিণ্ডির পথে, আধুনিক ছাত্রজীবন

সুদক্ষিণা দেবী : রান্না : লক্ষ্ণৌ প্রণালী

সৌদামিনী দেবী : পিতৃস্মৃতি, গান

স্বর্ণকুমারী দেবী : ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র, বিজ্ঞানশিক্ষা, সৌর পরিবারবর্তী পৃথিবী, প্রলয়, অন্যান্য গ্রহগণ নিবাস কিনা, তারকা-জ্যোতি, পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বা কিরন্ত পদার্থ, সৌর জগতে কত চাঁদ, তারকারাশি, যমক ও বহুসঙ্গিক তারকা, পরিবর্তনশীল তারকা, তারকাবর্ণ ও তারকার নির্মাণ-উপাদান, তারকাগুচ্ছ, নীহারিকা, স্থূর্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা মনের কথা জানা, সমুদ্রে, হেঁয়ালি খেলা, ঝুসি, নীলগিরির টোডাজাতি, কবি নাস্তিকতা ও শেলি, আমাদের কর্তব্য, মেসমেরিজম বা শক্তিচালনা, আমাদের কর্তব্য কোন পথে, নব্যবঙ্গের আন্দোলন, লর্ড কার্জন ও বর্তমান অরাজকতা, অপ্রকাশিত সঙ্গীত ও কবিতা

হিরণ্ময়ী দেবী : ডীন জোনাথান সুইফট্, দৈবঘটনা, নবযুগ, নবীন, নীলাম, নিউহ্যাম কলেজ, পাষ্টের আবিষ্কৃত চিকিৎসা, পিথাগোরস, বর্ষ, বর্ষবরণ, বান্দেলের গির্জা, চন্দ্রালোক (অনু. : গী. দ্য. মোপাসাঁ), জাতীয়কাল বৈশাখ, মহিলা শিল্প সমিতি, মনের মানুষ, মাতৃপূজা, বিলাতের পত্র, রমণীর স্বদেশব্রত, রুশিয়া, রুশিয়ার কারাগার, রুশিয়ার শাসন-

প্রণালী, রুশিয়ার বাণিজ্য, রুশীয় ভাষা ও সাহিত্য, সমারভিল হল, সসীম ও অসীম, সূতিকাগৃহে বানরত্ব, হেঁয়ালি নাট্য, মনে মনে বার্তাবহন, কবিতা: সরসী ও তটিনী, স্বরূপা ও কুরূপার খেদ, হরপার্বতীর তপস্যা, শারদপ্রীতি, শ্রীপঞ্চমী, সংসার, মিনতি, মানী, মালঞ্চ, কবি, বিশ্ব, বিশ্বাস, ভাইফোঁটা, মরণ, প্রেমফোঁটা, বউ কথা কও, বর্ষের বিদায় গান, ঝুমঝুম, ছবি, ঘুঘু, নববর্ষের অকিঞ্চন, খুলি নাই বা খুলি, গতবর্ষ ও নববর্ষ

হেমলতা দেবী: সংসারী রবীন্দ্রনাথ, মনের ছবি, শ্বশুর মহাশয়, রবীন্দ্রনাথের বিবাহবাসর, বৈশাখের রবীন্দ্রনাথ, আশ্চর্য মানুষ রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখীন সাধনার ধারা, ব্যবহার ক্ষেত্র, যোগস্থিতি, পুষ্পাঞ্জলি: বাবামহাশয়, প্রাণের কথা, মোক্ষের আভাস, মঙ্গল, নতুনতর মানুষ দ্বিজেন্দ্রনাথ।

ব্যক্তিঋণ:

অজিত পোদ্দার, অমিতা ঠাকুর, অমিয়া ঠাকুর, অমৃতময় মুখোপাধ্যায়, অরুণ বসু, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা দেবী, এণা রায়, কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌর সাহা, গৌরী চৌধুরী, গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, চিত্রা ঠাকুর, জয়ন্তমোহন চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বারিকানাথ চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পারুল ঠাকুর, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণিমা দেবী, পূর্ণিমা ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রসূন মুখোপাধ্যায়, বন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী চট্টোপাধ্যায়, বেলা চৌধুরী, ভবতোষ দত্ত, ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, মণিমালা দেবী, মুকুলা রায়, মেনকা ঠাকুর, শুভা রায়, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী ঠাকুর, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, সনৎ বাগচী, সমর ভৌমিক, সমরেশ্বর বাগচী, সুজাতা ভট্টাচার্য, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়, সুনন্দ সেন, সুনীল দাস, সুপ্রিয় ঠাকুর, সুভাষ চৌধুরী, সুরমা ঠাকুর ও স্বরূপা দেবী।

চিত্রঋণ :

বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভবন : অমিয়া দেবী, নন্দিতা দেবী, প্রতিমা দেবী, মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, সর্বসুন্দরী দেবী, সাহানা দেবী, সুজাতা দেবী, সুপ্রভা দেবী, সুশীলা দেবী, সৌদামিনী দেবী (গঙ্গো)।

বিশ্বভারতী, গ্রন্থনবিভাগ : জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, মৃণালিনী দেবী, রেণুকা দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী।

রবীন্দ্রভারতী, সংগ্রহশালা : বিনয়িনী দেবী, সুনয়নী দেবী, সুশীলা দেবী, হেমলতা দেবী।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থ :

আনন্দবাজার পত্রিকা : কাদম্বরী দেবী। ইন্দিরা সঙ্গীত শিক্ষায়তন : প্রতিভা দেবী। 'ঘরের মানুষ গগনেন্দ্রনাথ' গ্রন্থ থেকে : সৌদামিনী দেবী। রবীন্দ্র রচনাবলী (১০ম খণ্ড) (প. বঙ্গ সরকার প্রকাশিত) থেকে : সারদা দেবী। 'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থ থেকে : সংজ্ঞা দেবী। 'To Whom' গ্রন্থ থেকে : শোভনা দেবী।

ব্যক্তিগত সংগ্রহ :

অমিতা ঠাকুর : অমিতা দেবী। গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় : মঞ্জুশ্রী দেবী (সুভাষ চৌধুরীর সৌজন্যে)। চিত্রা ঠাকুর : চিত্রা দেবী। জয়ন্তমোহন চট্টোপাধ্যায় : উষাবতী দেবী। দ্বারিকানাথ চট্টোপাধ্যায় : অনুভা দেবী, কমলা দেবী, সুনন্দিনী দেবী। পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় : অপর্ণা দেবী, পারুল দেবী, পূর্ণিমা দেবী, সুরমা দেবী। প্রসূন মুখোপাধ্যায় : রমা দেবী। বাণী চট্টোপাধ্যায় : ইন্দিরা দেবী, নীপময়ী দেবী, প্রফুল্লময়ী দেবী, বাণী দেবী, সরলা দেবী, সুদক্ষিণা দেবী। ভাস্কর মুখোপাধ্যায় : অভিজ্ঞা দেবী, মনীষা দেবী, সুনৃতা দেবী, সুষমা দেবী। মেনকা ঠাকুর : উমা দেবী, মেনকা দেবী। শুভা রায় : মাধবিকা দেবী। শ্রীমতী ঠাকুর : শ্রীমতী দেবী। সুজাতা ভট্টাচার্য : সরোজাসুন্দরী দেবী। সুনন্দ সেন : জয়শ্রী দেবী (সুভাষ চৌধুরীর সৌজন্যে)। সুভাষ চৌধুরী : পূর্ণিমা দেবী। সুরূপা দেবী : সুরূপা দেবী।

রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহশালা : ম্যাক্সমূলারের পত্র প্রতিলিপি।

নির্দেশিকা

প

ফ

ব